স্মৃতিচিত্রণ

স্মৃতিচিত্রণ

রচনাকাল ১৯৫৬—১৯৫৮

পরিমল গোস্বামী

গ্রন্থম
কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
২০ শে ভাদ্র ১৩৬৭

প্রকাশক
প্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম
২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

একমাত্র পরিবেশক
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
১২।১, লিণ্ডসে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১৬

মুদ্রক
সুনীলকুমার রুদ্র
রুদ্র অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
(মুদ্রণ বিভাগ)
৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
বিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক ও মুদ্রণ
রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট
৭।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য : সাত টাকা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

স্মৃতিচিত্রণ লেখার অনুরোধ আসে মাসিক বসুমতী সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের কাছ থেকে—১৩৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৯৫৬)। আমি তখন থেকেই মাসে মাসে এক এক কিস্তি ক'রে লেখা তৈরি করেছি। বসুমতীতে ছাপা আরম্ভ হয়েছে ১৩৬৩ সালের পৌষ মাস থেকে এবং মোট ১৮ কিস্তিতে শেষ হয়েছে। অর্থাৎ মোট লেখাটি ১৮ মাসে শেষ হয়েছে।

এ বই ছাপা আরম্ভ হ'তে কাগজের দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজ্ঞা প্রকাশনীর প্রাজ্ঞ পরিচালক স্বকমলকান্তি ঘোষ এর বৃহৎ আকারে ভীত হননি, এবং মুদ্রণ ব্যবস্থায় তাঁর সহকর্মী, লেখক অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে যত্ন নিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা — পরিমল গোস্বামী

১৯-৭-৫৮

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

স্মৃতিচিত্রণ সকল শ্রেণীর পাঠকের ভাল লেগেছে তার প্রমাণ পেয়েছি অনেক অপরিচিত পাঠকদের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রথম মুদ্রণ ফুরিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা অবধি অনেক নতুন কথা আর অনেক পুরনো বন্ধুর মুখ মনে পড়েছে, কিন্তু তবু সবখানি সংযোজন এতে দেওয়া সম্ভব হয়নি পৃষ্ঠাসংখ্যার সমতা রক্ষার জন্য। তবু আগের চেয়ে কিছু ছোট অক্ষরে মুদ্রণ হেতু সামান্য কিছু পরিবর্ধনের সুযোগ পাওয়া গেছে। তা ভিন্ন এবারে অতিরিক্ত যোগ করা হ'ল কয়েকখানি ফোটোগ্রাফ। এখনকার পাঠকদের কাছে হয়তো প্রয়োজনীয় মনে হ'তে পারে সেগুলো।

প্রথম সংস্করণের ২৮ পৃষ্ঠায় পিতৃদেবের প্রথম কর্মভার গ্রহণের তারিখ উল্লেখে ভুল ছিল। এবারে সেটি সংশোধন ক'রে ১৮৯৮ করা হল।

বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু প্রথম মুদ্রণের ছাপা ফর্মা প'ড়ে অনেক ছাপার ভুল চিহ্নিত ক'রে ফেরৎ দিয়েছিলেন, সেগুলো আমার খুব কাজে লেগেছে। এবারে যদি কিছু থাকে, তার জন্য অন্য কোনো সুহৃদের অপেক্ষায় রইলাম।

কলিকাতা — পরিমল গোস্বামী

১৯-৭-৬০

গ্রন্থকারের অন্যান্য কয়েকখানি বই

মায়কে লেঙ্গে
ঘুঘু
ট্রামের সেই লোকটি
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প
পথে পথে
ম্যাজিক লণ্ঠন
সপ্তপঞ্চ
স্কুলের মেয়েরা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

প্রীতিভাজনেষু

প্রথম পর্ব

প্রথম চিত্র

আমাদের বাড়ি ছিল পাবনা জেলার সাতবেড়ে নামক গ্রামে। এই গ্রামটি একটি বন্দর, পদ্মানদীর উপর অবস্থিত। পাবনা জেলার মানচিত্রে পাবনা থেকে পদ্মা নদীকে অনুসরণ ক'রে পূব দিকে আসতে নদী যেখানে প্রথম বেঁকেছে সেই বাঁকের উপর সেই গ্রামখানি ; গ্রামের পশ্চিম এবং দক্ষিণে পদ্মা। পশ্চিম দিকে স্টীমার গোয়ালন্দ ঘাট থেকে পাটনা যায় এই পথে।

শুনেছি এখন আমার পরিচিত সে গ্রাম আর নেই, পদ্মার ভাঙনে গ্রাম স'রে গেছে দূরে।

খুব ছেলেবেলার স্মৃতি কিছু মনে পড়ে। ১৯০০ কিংবা ১৯০১ সাল হবে, প্রথম ফুটবল খেলার উত্তেজনা। সবাই দলে দলে এই খেলা কেমন, দেখতে যাচ্ছে, আমিও কার যেন কোলে উঠে খেলা দেখছি। শৈশবের এমনি সব টুকরো এক একটা ছবি অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। তখন আমার বয়স দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে।

আমাদের বাড়িতে একটি পাঠশালা বসত, খুব ছোটরা আসত সেখানে। আমার জ্যাঠামশাই ছিলেন গ্রাম্য পোস্টমাস্টার, তিনিই সকালে ডাকঘরের কাজ শেষ ক'রে এসে এই স্কুল চালাতেন। সব সুর ক'রে পড়ানো হ'ত। সব পাঠই চিৎকার ক'রে পড়ত সবাই। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করত। আপন দেহের পরিচয়ের বেলা নাকে হাত দিয়ে নোজ নাক, বগলে হাত দিয়ে আর্মপিট বগল, ইত্যাদি সুর ক'রে বলত। দূর থেকে শুনেই আমার সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার বয়স চার থেকে পাঁচ।

এখানে চার পাঁচ বছরের ছেলেরা পড়ত। শৌখিন পাঠশালা, বেতন দিতে হত না। আরও একটু দূরে চার আনা বেতনের একটি পাঠশালা ছিল, সেখানে মাসখানেক আমি পড়েছি। আর এক ছিল মাইনর স্কুল, পরে সেখানেই ভর্তি হয়েছিলাম। স্থানীয় এক জমিদারের বাড়িতে ছিল সে স্কুল।

আমাদের দেশে কলাপাতায় আঁচড় কেটে তার উপর কলম বুলিয়ে প্রথম লেখার সূত্রপাত হ'ত, কিন্তু আমি কখনো কলাপাতায় নিজে লিখিনি, অন্যের জন্য আঁচড় কেটে দিয়েছি।

আমার পিতা বিহারীলাল গোস্বামী সিরাজগঞ্জ মহকুমার পোতাজিয়া হাই স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। জায়গাটি সাহাজাদপুর থানার অন্তর্গত। পিতার হাতেই প্রথম শিক্ষা আমার। তাঁর শেখাবার ধরন ছিল স্বতন্ত্র। তিনি অক্ষর পরিচয়ের আগে গল্প পড়াতে শেখাতেন এবং প্রথমেই কাগজে লিখতে দিতেন। গল্প পড়তে পড়তেই অক্ষর পরিচয় হয়ে যেত, আকার ইকার ইত্যাদি সমেত। এতে পড়া শেখা যেত খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ইংরেজী বাংলা দুইই এইভাবে শেখা। জ্যাঠামশাইয়ের হাতের লেখা ছিল ইংরেজী কপি বুকের মতন। বাবার লেখা আরও সুন্দর ছিল। সুতরাং ছাপার মতন লেখা, ইংরেজী ও বাংলা দুইই, খুব অল্প বয়সে আয়ত্ত হয়েছিল। বাবা ভাল ড্রয়িং জানতেন, অতএব সে দিকেও ঝোঁক পড়েছিল আমার।

আমার শিশুকাল থেকেই বাড়িতে সেকালের যাবতায় সাময়িক পত্র আমি কত যে দেখেছি। সবারই গ্রাহক ছিলেন বাবা—জন্মভূমি, সখী, সখা ও সাথী, বঙ্গদর্শন, বঙ্গভাষা, সমালোচনী, সাধনা, প্রদীপ, ভারতী প্রভৃতি, উপরন্তু মিশনারি কাগজ মহিলাবান্ধব আসত নিয়মিত। বেশ মনে পড়ে এক মিশনারি মেম মাসে মাসে আসতেন আমাদের বাড়িতে এবং গান গেয়ে শোনাতেন। তাঁর নাম ছিল মিস এ. কিং। একটি গানের দুটি ছত্র আমার এখনও মনে আছে—"প্রভু তোমায় ছাড়ি আমি কোথায় যাব, হেন গুণনিধি আমি কোথায় পাব।"

মাসিকপত্রগুলির চেহারা এখনও মনে পড়ে। অজস্র বইয়ের পরিবেশে আমার প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ। বই আর ছবি। আর মনে পড়ে মোটা চোঙার প্যাকেটে বিলেত থেকে একদিন এলো রঙীন ছবির প্রতিলিপি, ল্যাণ্ডসিয়ারের আঁকা; বম্বাই থেকে একবার এলো রবি বর্মার কয়েকখানি বড় রঙীন ছবি। এই সব ছবি আর ছোটদের ইংরেজী বই অথবা এনসাই-ক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার নমুনা পৃষ্ঠা সম্বলিত ফোল্ডারের কয়েকটি রঙীন ছবি আমাকে একেবারে উন্মাদ ক'রে তুলল। হঠাৎ রঙীন ছবির উপর এক দুর্দমনীয় আকর্ষণ জেগে উঠল, যার হাত থেকে আমি সহজে মুক্তি পেলাম

না। ঝোপের মধ্যে বাসায়-বসা পাখী ও তার ডিমের রঙীন ছবি ছিল একখানা ইংরেজী বইতে। কতদিন সেইটে দেখে দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। বাজারে কাপড়ের দোকান থেকে বিলেতি কাপড়ে আঁটা রঙীন ছবি নিয়েছি কত। সেই নতুন বিলিতি কাপড়ের গন্ধ, ছবি, মনে মোহ বিস্তার করত। ছাতা পাওয়া যেত নানা রকমের, বিখ্যাত ছিল র‍্যালি ব্রাদার্সের ছাতা। মনে পড়ে আমার একটা স্প্রিঙের ছাতা ছিল, ঘোড়া টিপলে শব্দ ক'রে খুলে যেত আপনা থেকেই। তারপর যে দিন বাজারের একটি দোকানে জলছবি নামক এক অতি আশ্চর্য রঙীন ছবি ও তার ব্যবহারবিধি আবিষ্কার করলাম সেদিন যেন আমার চোখে তাই এক নতুন রঙের জগৎ আবিষ্কৃত হল।

জলছবির দাম জানতাম না, তাতেও ঠকতাম পরে বুঝতে পেরেছিলাম। একটি ডালে ছোট দুটি পাখী, তার প্রত্যেকটা এক পয়সা। মাঝখানে কেটে আলাদা বিক্রি হত। যে দাম চাইত তাই দিতাম, এবং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে পয়সার দিক দিয়ে ঠকলেও আনন্দের দিক থেকে আদৌ ঠকিনি।

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে সকালে ও সন্ধ্যায় ডাকঘরে যাওয়া ছিল আমার একটা নেশা। সন্ধ্যার দিকে ডাক আসত, সকালে ডাক রওনা হ'ত। ডাক হরকরা অনেকগুলো ঘুঙুর-বাঁধা একটি বল্লম হাতে নিয়ে ঝমঝম ঝমর ঝমর করতে করতে ছুটে আসত মেল-ব্যাগ পিঠে নিয়ে। আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে শশিভূষণ বাবুর বাড়িতে ছিল ডাকঘর। সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত যেতাম, বিশেষ ক'রে শীতকালে। ডাক নিয়মিত সময়ে আসত না। পাঁচটায় আসবার কথা, কখনো নটা দশটায় আসত। চার মাইল দূরে সুজানগর সাব্ পোস্ট অফিস থেকে আসতে এক ঘণ্টার বেশি লাগা উচিত নয়। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, লোকটি পথে কোনো আড্ডায় ব'সে নেশা-টেশা ক'রে খেয়াল মতো আসত, এবং ডাকঘরের কাছাকাছি এসে খুব জোর ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটত।

আমার কাজ ছিল চিঠিতে ছাপমারা এবং পরদিন সকালে সীলমোহরের তারিখ বদলানো ও ব্যাগে পোরার আগে ডাকবাক্স খুলে সব চিঠির ঠিকানা লাল কালীতে ইংরেজী করা ও ছাপমারা। ইংরেজীতে নাম ধাম লেখা খুব ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস ছিল, আমার এই কাজ খুব নিখুঁত হ'ত, এবং পোস্টমাস্টার ও পোস্টম্যান উভয়েই এ বিষয়ে আমার উপর সদয় ছিলেন।

হঠাৎ একদিন পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে আবিষ্কার করলাম অনেক স্থানেই জলছবি বিক্রি হয়। এবং বারো শীট মাত্র ছ আনা! তখুনি অর্ডার দিলাম, যথাসময়ে ভি. পি. এলো। পেনি-ফার্দিং নামক সেকেলে সাইকেল, ব্রিটিশ সৈন্য। ছবির কত যে বিষয়-বৈচিত্র্য! কত যে আনিয়েছিলাম পর পর! এক একটি শীটে চল্লিশ-পঞ্চাশখানা ছবি থেকে চারখানা পর্যন্ত। ভারতীয় দেবদেবীর ছবিও ছিল, তার প্রত্যেকটির নিচে নাম লেখা—কালী, তারা, মহাবিদ্যা ইত্যাদি। জলছবির গন্ধ কি ভাল যে লাগত!

ডাকে আরও নানা জিনিস আনাতাম। নিজের নামে এত জিনিস আসছে এর মধ্যে একটা গর্ব ছিল, রোমাঞ্চ ছিল। শীতকালে সন্ধ্যায় ডাকঘর আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। এই একমাত্র উপলক্ষ ভিন্ন এত রাত্রে গ্রামের পথে চলার অভিজ্ঞতা ছিল না। রাত্রে হাজার হাজার জোনাকি, অন্ধকার নিস্তব্ধ গ্রামের কালো আকাশের বুকে সহস্র নক্ষত্র। দপ্ দপ্ করছে। তারই মধ্য দিয়ে গ্রামে-তৈরি তিনদিকে কাচ ঘেরা টিনের লণ্ঠনের মৃদু আলোতে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাড়িতে ফিরছি, আমার নামে আসা প্যাকেট চিঠিপত্র হাতে নিয়ে। এর মধ্যকার রহস্যপূর্ণ রোমাঞ্চকর আনন্দটুকু প্রকাশ করি এমন ভাষা আমার জানা নেই।

একবার কলকাতা থেকে ভি. পি. ডাকে জলছবি এলো—খুব ছোট ছোট সিকি দুআনি আধুলি আকারের ছবিতে ভরা। এই ছবিগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের নদী কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে বইয়ের মার্জিনে অনেক ছবি লাগিয়ে দিলাম। জার্মানির কোন্ শহরে তৈরি সেই জলছবি, তার সঙ্গে আমাদের দৃশ্যপট, পাখী ইত্যাদি সব মিলবে কেন, কিন্তু যতটুকু মিলল—কচ্ছপ, ঘাটের সিঁড়ি, উচ্চ সৌধ ইত্যাদি—বেশ দেখতে হয়েছিল। নদী বই-আকারে বেরোয় প্রথম। রবীন্দ্রনাথ এই বই খান-বারো একটি প্যাকেটে বাবার নামে পাঠিয়েছিলেন। বাবা আমাদের দুই ভাইকে (আমাকে ও সুবিমলকে) সবটাই মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন নিজে প'ড়ে প'ড়ে। দু রকম ছন্দে পড়া যায়—দু রকমই শিখেছিলাম। এই কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগত। হিমগুহা থেকে বেরিয়ে নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে। পদ্মানদীর উপরে আমাদের বাড়ি—আমার বালকমনে নদী কবিতা কত যে কল্পনা জাগিয়ে তুলত। আমি নিজেই যেন সেই নদীর সঙ্গে পর্বত থেকে বেরিয়ে দুধারের সমস্ত দৃশ্য

দেখতে দেখতে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছি। নদীর চলা আমার সমস্ত সত্তার সঙ্গে মিশে আমার মনকে আজও চলার মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে রেখেছে।

আমাদের বাড়ির কাছেই কলুদের বাড়ি। ঘানিতে সরষে থেকে কি ভাবে তেল বেরোয় তা দেখতে খুব ভাল লাগত। একটা বলদ ঘানি ঘোরাত, ঘানির যে অংশটি গোরুর কাঁধে, তার উপর চাপ রাখার দরকার হয় সরষের চাপ পড়ার জন্য। কলুদের সেই ঘানিতে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আমাকেও কতবার বসতে হয়েছে আরও কিছু চাপ বৃদ্ধির জন্য, যদিও সে চাপ সরষে থেকে তেল নিষ্কাষণ করবার পক্ষে কতখানি কার্যকর ছিল তা আমার জানা নেই। মোট কথা অনেক দিন ঘানিতে পাক খেয়েছি। পুষ্ট সরষের টাটকা তেলের গন্ধে ঘর আমোদিত হয়ে থাকত, সে গন্ধ আজও টাটকা আছে আমার মনের নাকে।

কলুরা উঠে গেল কিছুদিন পরে, এলো সেখানে এক কুমোরের পরিবার। তাদের বৃহৎ গোষ্ঠী। তারা নতুন সব ঘর তুলে বেশ জাঁকিয়ে বসল সেখানে। হাঁড়ি, কলসী, মালসা, সরা প্রভৃতি দিনরাত তৈরি হচ্ছে, রোদে শুকোচ্ছে, রুটির মতন অংশ দিয়ে হাঁড়ির তলা কাঠের হাতায় পিটে জোড়া হচ্ছে, হাতুড়ির মতো যন্ত্রের ছাঁচ পিটিয়ে পিটিয়ে কাঁচা হাঁড়ি বা কলসীর গায়ে নক্সার ছাপ আঁকা হচ্ছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তার পর রোদে-শুকানো হাঁড়ি-কলসী পোড়াবার পালা। প্রত্যেকটি ধাপ দিনের পর দিন বসে দেখেছি। সব মুখস্থ হয়ে আছে।

আর মনে পড়ে কলের গানের কথা। পয়সা নিয়ে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীরা কলের গান শুনিয়ে বেড়াত। গানের লাইনও অনেকগুলোর মুখস্থ আছে। "তোরা মিশি নিবি মিশি নিবি ও বৌয়েরা" বা "পায়ে আলতা পথে কাদা" বা "সৈ লো তোর খবর চমৎকার"—ইত্যাদি। রেকর্ডের গায়ে প্যাথিফোন, জেনোফোন, বেকা, ওডিওন, হিজ মাস্টার্স ভয়েস প্রভৃতি কম্পানির লেবেল আঁটা।

একদিন আমার দাদা (জ্যাঠতুত ভাই) নলিনীরঞ্জন, বয়সে আমার চেয়ে বছর তিনেক বড়—ছুটে এসে আমাকে বললেন টীকেদার আসছে। তাঁর মুখে আতঙ্ক। বললেন শীগগির পালাবি তো চল।—দুজনে ছুটে পালিয়ে গিয়ে এক ঝোপের মধ্যে এক বেলা কাটালাম। টীকেদার যে কেন

ভয়ের তখন জানতাম না। তারপর একদিন টীকে নিতে হ'ল, অবশ্য দাদাই আগে নিলেন, আমি একা পালিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। আমাকে ধ'রে আনা হল গুপ্ত স্থান থেকে। টীকে উঠেছে কিনা তখন দেখতে আসত টীকেদার। টীকে উঠলে কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটত।

মাইনর স্কুলে ক্লাস টু-তে ভর্তি হয়েছিলাম। মথুরানাথ সাহাচৌধুরী নামক এক ধনী ব্যক্তির দেউড়ি পার হয়ে প্রকাণ্ড আঙিনা জুড়ে আটচালা খড়ের ঘর, তাইতে স্কুল বসত। ... ঘরটি সম্পূর্ণ খোলা, ভিতরেও ক্লাসে ক্লাসে কোনো ভেদ চিহ্ন নেই, শুধু তিন দিকে বেঞ্চি ও একদিকে শিক্ষকের চেয়ার টেবিল। এইভাবে এক একটি ক্লাস সাজানো। প্রথম বই যা একটু একটু মনে আছে সে হচ্ছে ফ্রান্সিস ড্রেকের গল্প, কাক ও কোকিল কবিতা, কর্মসঙ্গীত। ক্লাস টু থেকে থ্রীতে প্রমোশন পেয়েছিলাম তৃতীয় হয়ে। পুরস্কার পেয়েছিলাম চরিত্রগঠন ও একখানি বাংলা অভিধান। ক্লাসে প্রতিদিন ইংরেজী ও বাংলা হাতের লেখা লিখতে হ'ত। তার জন্য কাগজ যা কেনা হ'ত তা খুব শস্তা ছিল মনে আছে। এক দিস্তে চার পয়সা কিংবা কম। বালী কাগজ নামে কিঞ্চিৎ লালচে আভাযুক্ত কাগজ খুব চলতি ছিল। জেবিডি বড়ি বা গুঁড়ো কালি, অথবা দু পয়সা দামের দোয়াতসুদ্ধ তৈরি কালি কিনতাম। এ কালির গন্ধ, কাগজের গন্ধ, আজ আমার স্মৃতিতে অম্লান।

কালি অনেক সময় বাড়িতেও তৈরি ক'রে নিতাম। অনেকেই বাড়িতে তৈরি করত। মিশকালো উজ্জ্বল কালি। দু'চার পয়সা খরচে এক বোতল। কলম ময়ূরের পালকের। এক পয়সা একটি। খাগের কলমেও বেশ লেখা যেত। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ সেটি, তার ফলে গ্রামের উৎসাহী এক কুমোর ছাত্র কাঁচের দোয়াতের অনুকরণে মাটির দোয়াত তৈরি করেছিল। যে দোয়াত ও'ল্টালে কালি পড়ে না, সেই রকম। কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরের কালি দেখা যেত না, সেজন্য তা খুব জনপ্রিয় হয় নি।

স্কুলের পড়ায় আমার মন ছিল না। হাতের লেখা খাতায় এক পৃষ্ঠা বাংলা ও এক পৃষ্ঠা ইংরেজী তাও প্রতিদিন লিখতাম না। ওটি বাধ্যতা-মূলক বলেই ভাল লাগত না। সেজন্য ক্লাসে বেত পড়ত হাতে। শশিভূষণ দাস ছিলেন হেড পণ্ডিত। তিনি একটু হিংস্র ছিলেন, তাঁর ক্লাসে বেতের ব্যবহার একটু বেশি হত।

আর একজনের নাম মনে পড়ে—যোগেন্দ্রকুমার কাঞ্জিলাল। তিনি ড্রিল শেখাতেন। সবার নাম মনে নেই, কিন্তু চেহারা স্পষ্ট মনে আছে। সহ-পাঠীদের সবার নাম ও চেহারা আজও স্পষ্ট মনে আছে। প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানেও তাদের স্মৃতি আজও অম্লান। দুর্গাচরণ, অবনী, সুরেশ, রমেশ, শ্রীশ, শুকলাল, নবদ্বীপ, গোপাল প্রভৃতি।

সমস্ত দিন স্কুলে থাকা আদৌ ভাল লাগত না। ক্লাসের পড়া কানে যেত কদাচিৎ। যান্ত্রিক নিয়মে তখনকার দিনের এই পাঠ ব্যবস্থা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল আমার কাছে। হয় তো বা সবার কাছেই তাই ছিল। তাই স্কুলের পরিবেশ অন্যভাবে উপভোগ করার জন্য আমরা কয়েকজন বালক অনেক আগে যেতাম স্কুলে। নানা রকম খেলা আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, একখানা ইতিহাসের বইতে বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যা আসাম মিলিয়ে একখানা ম্যাপ ছিল, তা থেকে জায়গার নাম খুঁজে বার করা। এটা ছিল পরস্পর ঠকানোর ব্যাপার। আমি একটি জায়গার নাম বার করতে বলতাম একজনকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা বার করতে না পারলে তার হার হত। সে আবার আমাকে ঐ ভাবে ঠকাবার চেষ্টা করত। ছোট ছোট অক্ষরে শত শত নাম তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করা শক্ত। কিন্তু কিছুদিন পরে সব আমাদের এমন জানা হয়ে গেল যে, কোনো জায়গার নাম বার করতে এক সেকেণ্ডের বেশি দেরি হত না।

একদিন সবার আগে গিয়েছি স্কুলে। আমাদের ক্লাসটি ছিল পশ্চিম দক্ষিণ কোণে। বর্ষাকাল। বেঞ্চিতে একা বসে মাটির দিকে চেয়ে দেখি দীর্ঘ এক সারি পিঁপড়ে চলেছে অবিরাম গতিতে ছুটে। তারপর হঠাৎ দেখি তাদের পাশে বসে রয়েছে একটি মেটে রঙের মোটা ব্যাঙ। মাটির সঙ্গে এমন মিলিয়ে ছিল যে আগে দেখতে পাইনি। পিঁপড়ের চলা দেখতে আমার ভাল লাগত। একা ব'সে ব'সে কতদিন দেখেছি এবং ভেবেছি কি ক'রে ওরা কোনো খাবার জিনিষের সন্ধান পেলে অন্যকে খবর দিয়ে ডেকে আনে। আবিষ্কার করেছি, ওরা পথ চলার সময় এমন কিছু চিহ্ন বা গন্ধ রেখে যায় যাতে সবাই ঠিক সেই একই পথে চলে আসে। এটি সত্য কিনা পরীক্ষার জন্য মাঝে মাঝে পথের উপর আঙুল ঘষে দিয়েছি।

তখন দেখেছি ওদের গতি ঠিক সেইখানে এসে থেমে যায় এবং সবাই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ভাঙা পথের এপারের সঙ্গে ওপারের যোগ স্থাপন করে। তাই একা আমি সেদিনের সেই ঘনসন্নিবিষ্ট পিঁপড়ে দলের পথের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ভাবছিলাম, লাইনের মাঝখানে একটু ফাঁক পেলেই ঘষে দেব। আর মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম ওদের শাদা শাদা ডিম মুখে নিয়ে ছুটে চলার দৃশ্য। কিন্তু ওদের পাশে একটি ব্যাঙকে আমারই মতো নিবিষ্ট মনে ব'সে থাকতে দেখে অবাক হলাম। এমন তো কখনো দেখিনি। ওর উদ্দেশ্য কি? সে যুগে অবশ্য পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণার কথা কেউ ভেবেছেন কি না জানি না, ভাবলেও বাংলার সুদূর এক পল্লীগ্রামে পিঁপড়ের তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো কেউ ছিলেন না অবশ্যই। এর সম্ভাবনার কথাও যদি সে বয়সে আমার কল্পনা করার ক্ষমতা থাকত, তা হ'লে অন্ততঃ সে দিন সেই ব্যাঙটিকে আমি বিজ্ঞানীর সম্মান দিতাম। আমি নিজেও যে ওদের চলার দৃশ্যের মধ্যে কোনো কিছু রীতি আবিষ্কার ক'রে, জানবার মতো বা পাঁচজনকে জানাবার মতো কিছু করছি, এ রকম কোনো কল্পনাও আমার মনে ছিল না; আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু মজা দেখা অথবা শিশুসুলভ কৌতূহল চরিতার্থ করা। আমার স্বভাবের সঙ্গে এ ধরনের কাজ বেশ মিলত। নাওয়া খাওয়া বিষয়ে উদাসীন ছিলাম, পড়াশোনায় মন বসত না, সমস্ত বছরের পড়া তিন চার দিনে প'ড়ে শেষ ক'রে রাখতাম, তার পরে আর ঐ একই পাঠ ভাল লাগত না। অঙ্ক শাস্ত্রকে কোনো শিক্ষকই আকর্ষক ক'রে তুলতে পারেন নি তখন, তাই ওতে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যাই হোক হঠাৎ একটি অদ্ভুত ঘটনা দেখে আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। দেখি সেই নিরেট পিঁপড়ের সারির মধ্যে সহসা আধ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা একেবারে ফাঁকা, এবং পিঁপড়েদের অবিরাম গতি সহসা বিপর্যস্ত! চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যে জিনিসটি আমি নিজে করব বলে অপেক্ষা ক'রে বসে আছি, তা হঠাৎ নিজে থেকে হ'ল কি ক'রে! অথচ ব্যাঙ আমারই মতো নির্বিকার দ্রষ্টা। বরঞ্চ আমি যেটুকু উসখুস করেছি ব্যাঙ তাও করেনি, তাকে এক চুল নড়তে দেখিনি।

কি ব্যাপার ভাবছি। ইতিমধ্যে বিভ্রান্ত পিঁপড়েরা পথ ঠিক ক'রে

নিয়েছে, কিন্তু বিভ্রান্ত আমি এ সমস্যা সমাধানের কোনো পথই পাচ্ছি না। ভাবতে ভাবতেই দেখি আবার কোন্ যাদুমন্ত্রে সেই একই জায়গার আধ ইঞ্চি স্থান শূন্য! ব্যাঙ পূর্ববৎ নির্বিকার। বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা পাচ্ছি না, রহস্য ভেদ করা অসাধ্য বোধ হচ্ছে, অথচ সে বয়সে একটি ব্যাঙের কাছে পরাজিত হওয়াও অসম্ভব।

অতএব মনোযোগ আরও ঘনীভূত ক'রে ব্যাঙের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম মাথা নিচু ক'রে। রহস্য ভেদ হ'ল। ব্যাঙ মুখের ভিতর থেকে চকিতে একটি জিভ বার ক'রে কতকগুলা পিঁপড়েকে তুলে নিয়ে মুখে পুরছিল। ক্রিয়াটি এমন আশ্চর্য ক্ষিপ্র গতিতে ঘটছিল যে হঠাৎ দেখে বোঝবার উপায় নেই। ব্যাঙ এতটুকু না ন'ড়ে, তড়িৎ গতিতে একটি সরু কাটির মতো লম্বা জিভ বা'র করতে পারে, এ তথ্য আমার জানা ছিল না। মনে হয় গাঁয়ের কোনো লোকেরই জানা ছিল না।

আমার মনে এই ঘটনা ছাপ এঁকে গেছে। এমনি ভাবে যত তুচ্ছ হোক, জীবনে যা কিছু নতুন জেনেছি তাই আমার কাছে পরম বিস্ময় ব'লে মনে হয়েছে। দিনের পর দিন তা নিয়ে ভেবেছি, এবং সবাইকে বলে বেড়িয়েছি। এককালে (অনুমান ১০৩৩-৩৪) আমার বন্ধু বসুবিজ্ঞান মন্দিরের গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে যখন তার বাল্যকালের রোমাঞ্চকর সব তথ্য আবিষ্কারের কথা শুনছিলাম, তখন আমার বাল্যজীবনের এ ঘটনাটিও তাঁকে না ব'লে পারি নি। আমি যখন বি. এ. পড়ি তখন বিজ্ঞানের মহৎ উদ্দেশ্য বিষয়ে একখানি বই (Discovery, The Spirit and Service of Science) ছিল আমাদের ইংরেজী টেক্সট বুক। তাইতে প্রথমে কীট নিয়ে গবেষণার আদি কথা প'ড়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। ফাবর্ (Fabre) দিনের পর দিন কীটদের ব্যবহার লক্ষ্য করছেন পথের ধারে ব'সে, আর তা দেখে গ্রাম্য মেয়েরা তাঁকে পাগল ভেবে কত করুণা প্রকাশ করছে! এ ঘটনা পড়বার সময় আরও একবার আমার সেই সেদিনের অতি তুচ্ছ উদ্দেশ্যহীন কৌতূহলী পিঁপড়ে দর্শনের দিনগুলির কথা মনে এসেছিল, ভাল লেগেছিল ভাবতে। এই সময়েই আর একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে আর এক বিস্ময় জাগিয়েছিল! একটি পতঙ্গ (মথ জাতীয়) এসে বসেছিল আমাদের বাড়ির বাইরের একটি কাঠ রাখা ঘরের বেড়ায়। মাটির রঙের পতঙ্গ, কিন্তু

তার পিঠে সম্পূর্ণ একটি জীবিত মানুষের মূর্তি আঁকা। দুটি পাখা গুটিয়ে বসলে অদ্ভুত সাদৃশ্য পাওয়া যায় মানুষের মুখের। ঘন কালো রেখার মূর্তি। চোখ নাক মুখ অবিকল মানুষের, চোখে তারা নেই শুধু আউটলাইন। আমি শিশুকাল থেকেই ছবি আঁকায় অভ্যস্ত ছিলাম, কাজেই আমার দেখায় সন্দেহ করবার কারণ নেই। পতঙ্গটি একবেলা ব'সে ছিল, এবং আমি অনেককে তা দেখিয়েছিলাম। এই অদ্ভুত ছবির কথা পঞ্চাশ বছর ধ'রে বলে আসছি কৌতূহলী জনকে। আমি দ্বিতীয় আর একটি দেখিনি। পতঙ্গবিদেরা নিশ্চয় এ রকম দৃশ্য দেখে থাকবেন। এটি মানুষের মাথার খুলি আঁকা Death's Head (acherontia atropos) নামক মথ নয়।

বাধাহীন দিগ্বলয়ে ঘেরা খোলা আকাশের সীমাহীন বিস্তার, শস্যক্ষেতের সবুজ সমুদ্রে কখনো বেগুনি, কখনো হলুদ ফুলের ঢেউ, কখনো অবিরাম সবুজ আর সবুজ, এমন পরিবেশে কোথাও নিজেকে স্থির রাখতে পারতাম না! মাঠে মাঠে, নদীর ধারে ধারে, অকারণ ঘুরে বেড়াতাম। নাওয়া খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। বাড়িতে বকুনি খেতাম নিয়মিত। ছুটির দিনগুলো এক নিশ্বাসে কেটে যেত। স্কুলে যেতে হবে কল্পনায় মন খারাপ হত।

নদীর যোগাযোগ সমুদ্রের সঙ্গে। সে কোন্ এক অজ্ঞাত হিমগুহা থেকে বেরিয়ে অবিরাম গতিতে চলেছে সেই লক্ষ্যে। কোথাও তার ছেদ নেই। তার সঙ্গে কত দেশের সম্পর্ক। এক বিরাট অতল অসীম সমুদ্রের কোলে গিয়ে তার যাত্রা শেষ। এই ছবিটি 'নদী' কবিতার সঙ্গে আমার মনে শিশুকাল থেকে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাই নদী আমাকে এমন টানত। তাই মনে হ'ত একমাত্র নদীই আমার আত্মীয়, ওর সঙ্গে আমার মন ছুটে চলত অজানা দেশে। ওকে আমি চিনি, ওর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত আমি চিনি।

বদ্ধ কোনো কিছু আমার প্রকৃতি বিরোধী ছিল। যা কিছু নিয়মিত তার সঙ্গে আমার জন্মবিরোধ। এবং যা কিছু নিষিদ্ধ তার প্রতি আমার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। নদীর মধ্যে দেখতাম এই নিয়মভাঙা গতি। সে যে কি দৃশ্য! বর্ষার পদ্মা! উন্মত্ত জলরাশি প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে চলেছে। কত ভাঙা গাছের ডাল, কত পাতা, খড় কুটো, পাক খেয়ে

খেয়ে তীর বেগে ছুটে চলেছে! গেরুয়া-রাঙা জল। পাকে পাকে ফুলে ফুলে উঠছে, মাঝে মাঝে পাড় ভেঙে পড়ছে আর কলকল শব্দ ভেদ ক'রে তার আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। আবার পাড়ে ফাটল দেখা দিল, প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে পাড়ের অংশ নিচে ব'সে গেল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল স্রোতের উপর। কোনো ফাটল সিকি মাইল জুড়ে। কখন ভেঙে পড়বে ঠিক নেই। তারই ধারে ধারে ছিল আমার গতি। কখনো এক লাফে ফাটলের ওপারে যাচ্ছি, আবার এক লাফে ফিরে আসছি। ওপারে যাবার পর যদি সেই ফাটলে বিচ্ছিন্ন জমিটুকু আমাকে-সুদ্ধ তলিয়ে যেত। যায়নি কেন, আজ ভাবলে চমকে উঠি। খেলা আর মৃত্যু—মাঝখানে একটি রেখা। সেই রেখার উপর হাঁটতে তখন কি মজা। যেন সার্কাসের তারে হাঁটা!

বর্ষার নদী কতভাবে দেখেছি। তার দুর্দমনীয় শক্তি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি। তার প্রত্যেকটি কলধ্বনি, প্রত্যেকটি আবর্ত, আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

একদিন ভোর বেলা জেগে উঠে ভয়ার্ত চিত্তে শুনি পদ্মার অতি প্রবল গর্জন। নদী থেকে হাঁটা পথে অন্তত ছ সাত মিনিটের দূরত্বে ছিল বর্ষার পদ্মার শেষ সীমা। শীতের পদ্মায় স্নান করতে যেতাম আধ মাইল হেঁটে। নদী তত দূরই ছিল আগের দিনও। কিন্তু হঠাৎ এ কি হ'ল। এমন গর্জন তো ভরা বর্ষাতেও আমাদের বাড়ি থেকে কখনো শোনা যায়নি—এমন প্রলয়ঙ্কর প্রবল গর্জন। সবাই ভীত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে আরও আগে যাদের ঘুম ভেঙেছে তারা নদীর ধার থেকে উত্তেজিতভাবে ফিরে এসে খবর দিল গ্রাম বোধ হয় গেল। বর্ষার মুখে হঠাৎ এক দিনে জল এমন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে যে কেউ তার জন্য আগে হ'তে তৈরি থাকতে পারেনি। পদ্মার এ রকম ব্যবহার এই প্রথম: গ্রাম সীমান্তের ঢালু পাড় থেকে যে-নদী পূর্ব দিন সিকি মাইল দূরে ছিল, সে নদী এখন প্রায় দুকূল হারা। নদী ক্ষেপে গেছে। ছুটে গিয়ে দেখি অসম্ভব কাণ্ড। নদীর ঢাল পাড়, শুকনো বুক, কোথায় অদৃশ্য। সেখানে নৌকা নেই। পাড়ের উপর কাঠের ব্যবসায়ী ছিল, তার শাল কাঠগুলো সাজানো থাকত, তারও একটা অংশ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। লোকেরা প্রকাণ্ড একটা বাঁশ এনে জলে ডুবিয়ে থৈ পাচ্ছে না, সবারই মুখে চোখে ভয়ের

ছাপ। আমি মূঢ় বিস্ময়ে পদ্মার সেই সর্বনাশা মূর্তি দেখছি ; গর্জনে কারও কথা কানে আসছে না। সবাই শুধু চেয়ে আছে, আর 'কি হবে কি হবে' ব'লে অস্থির হচ্ছে। সৌভাগ্যের বিষয় গ্রামের উপর সেবারে আর আক্রমণ হয় নি, গ্রাম রক্ষা পেয়ে গেল।

সাধারণত বর্ষার প্রথম জল এসে নদী যখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, তারই মুখে ইলিস মাছ ধরার মরশুম। ঝড়বৃষ্টি তখন কম, ঝড়ের কাল জ্যৈষ্ঠের শেষেই শেষ হয়ে যায়। তারপর মাছ ধরার কাল। তখন শত শত নৌকো একত্র স্রোতের সঙ্গে জলে জাল নামিয়ে ভেসে চলে। নৌকোয় মাত্র তুজন লোক। একজন হাল ধ'রে ব'সে আছে, আর একজন জাল ধ'রে; ইলিস মাছ জালে আটকা পড়লেই হাতের দড়ি কেঁপে ওঠে, বোঝা যায়। তখন জাল টেনে তুলতে হয়। তখন যে মাছ ধরা পড়ল, সেটিকে নৌকায় রেখে আবার জাল ফেলতে হয়। এক সঙ্গে তুটো তিনটেও ধরা পড়ে কখনো। এই ভাবে তু তিন মাইল স্রোতে ভেসে গিয়ে নৌকো ফেরাতে হয়। তখন স্রোতের বিপরীত মুখে উজিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সুবিধে এই যে এই মরশুমে বাতাস বয় পূব থেকে পশ্চিমে, তাই নৌকো ফিরে আসবার সময় পাল তুলে দিলেই কাজ হয়। এক সঙ্গে তুতিন শ পাল তোলা নৌকো জলের বুকে ফেনা তুলে উজিয়ে আসে। কোনো পাল শাদা, কোনোটা নীল, কোনোটা লাল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। এই ভাবে আসে, আবার পাল গুটিয়ে মাছ ধরতে ধরতে যায়, আবার আসে। ছবির মতো দেখায় যখন বিচিত্র রঙীন পাল তোলা অতগুলো নৌকো এক সঙ্গে ফিরে আসে। এদের সঙ্গে মাছ ধরা দেখেছি কতবার সেই বর্ষার পদ্মার বিপজ্জনক বুকে।

বর্ষাকালে আর শুনেছি দূরাগত জোড়া কামানের ধ্বনি—গুড়ুম গুড়ুম, পর পর তুটি আওয়াজ। গম্ভীর এবং জোরালো, কিন্তু সে যে কিসের আওয়াজ তা কেউ বলতে পারত না। দিন রাত শোনা যেত। আজও এর ব্যাখ্যা হয়নি, এর নাম শুনেছি বরিশাল গান্।

এই নদীর আর এক রূপ শীতকালে। তখন জল বহুদূর স'রে গিয়েছে, তীর ভূমির বিস্তীর্ণ বালুর বুকে হাজার হাজার জলতরঙ্গ আঁকা। কাদাখোঁচা পাখী জলের ধারে ধারে পায়ের ছাপ এঁকে কাদায় ঠোঁটের খোঁচা দিয়ে ফিরছে।

ছোট ছোট ছেলেরা এখানে সেখানে ছাতার আকারের কাঠামোয় বাঁধা জাল অগভীর জলে ফেলে দূরে দড়ি ধরে বসে আছে। এক ঝাঁক খয়রোলা মাছ তার উপর দিয়ে সাঁতার কেটে যাবার সময় এক হেঁচকা টানে তাদের ডাঙায় তুলে ফেলবে। মাথার উপরে অজস্র গাঙচিল উড়ছে। দূরে নদীর মাঝখানে এখানে সেখানে জল এত কম যে সে সব জায়গায় স্টীমার আটকাবার ভয়ে বাঁশের নিশানা পুঁতে দেওয়া হয়েছে। কত চরভূমি জল থেকে মাথা বার করেছে। ক্ষীণ নদীর ওপারের বালুতট দেখা যাচ্ছে—বহুদূর বিস্তীর্ণ সে বালুভূমি পার হয়ে দিগন্তে ঘননীল গাছের সারি—লোকালয়ের নিশানা। গাছের সবুজ দূর থেকে এমনি নীল দেখায়। এপার থেকে খেয়া নৌকো যাত্রী বোঝাই ক'রে ধীরে ধীরে নদী পার হলে যাচ্ছে। নদী পারেই ফরিদপুর জেলার সীমানা। সেখান থেকে দক্ষিণে ছ সাত মাইল হাঁটলে ঈস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের পাংশা স্টেশন। সেখান থেকে পুব দিকে প্রথমে কালুখালি, তারপর বেলগাছি, তারপর রাজবাড়ি, তারপর পাচুরিয়া জংশন, তারপর গোয়ালন্দ। (পরে রাজা সূর্যকুমার রায়ের স্মৃতিতে সূর্যনগর নামক একটি স্টেশন হয়—রাজবাড়ির আগে)।

ক্ষীণ পদ্মার বুকে স্টীমার চলছে জল মাপতে মাপতে। 'এ পানি তয় মিলে না'—ইত্যাদি ধ্বনি শোনা যায় অনেক সময়। নির্মেঘ নীল আকাশের নিচে প্রকাণ্ড নীলাভ নদী, জল এখন স্বচ্ছ, গ্রামের শেষে তীরে তীরে যতদূর দেখা যায় সরষে ক্ষেতের হলুদ ফুলে ছাওয়া। চারদিকে কি অপরূপ উদাস করা আলো আর হাওয়া। এমনি দিনে কতদিন নৌকোয় চড়ে কালুখালি ঘাটে নেমে, সেখান থেকে পালকীতে গিয়েছি রতনদিয়া গ্রামে—আমার মামাবাড়িতে। সে সব আজ স্বপ্নের মতো মনে পড়ে।

১৯০৬ কিংবা ৭ হবে, সেই সময়ে থিয়েটারের প্রসার হয়েছে সুদূর পল্লীতেও। বালককালে দেখেছি থিয়েটার সাতবেড়ের সংলগ্ন নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। পালা ছিল হরিশ্চন্দ্র, মনে আছে; আর মনে আছে ড্রপ্ সীনে ঘোড়ায় চড়া শিবজী মূর্তি। সেই রঙীন ছবি আজও স্পষ্ট দেখতে পাই, তার কনসার্টের সুর কানে বাজে।

পদ্মা নদীর ধারে ধারে আপন মনে ঘুরে বেড়ানোয় যে কি আনন্দ হ'ত,

প্রকাশের ভাষা নেই। কখনো ওপারের ট্রেন চলার শব্দে, কখনো স্টীমার যাওয়ার দৃশ্যে মন উধাও হয়ে যেত অদেখা অজানা দেশে।

স্টীমারের চেহারা ও নাম মনে আছে। প্রথমে যে স্টীমার আমি কাছে থেকে দেখেছি, তার নাম "ওয়াজিরিস্তান"। প্রকাণ্ড স্টীমার, পেটের দুই বিপরীত দিকে দুই চাকা বা প্রোপেলার। সেই চাকার আবরণের উপর অর্ধচন্দ্রাকার নামটি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। এ কিসের নাম, এর অর্থ কি এসব তখন সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ছিল। শিশুকালের কথা। কিছুদিনের মধ্যেই এ রকম চওড়া স্টীমার চলা বন্ধ হ'ল, তার বদলে দেখা দিল লম্বা স্টীমার—পিছনে তার চাকা। শুনলাম এ ধরনের স্টীমার অল্প জলে যেতে পারে—তাই পদ্মায় চলার পক্ষে খুব সুবিধাজনক। বর্ষা চলে গেলে পদ্মার বুকে বহু চড়া জাগে জল কমে যায়, তখন ভারী স্টীমার চলতে পারে না। অদৃশ্য চড়ায় আটকে-যাওয়া কত স্টীমার দেখেছি। দুদিন তিন দিন পর্যন্ত আটকে থেকেছে কোনো কোনোটা। আটকা পড়লে প্রাণপণে বাঁশি বাজাতে থাকে—উল্টো দিকে চাকা ঘুরিয়ে হাঁসফাঁস করতে থাকে, কখনো উদ্ধার পেয়ে যায় আপনা থেকেই, কখনো বা অন্য স্টীমার সে পথে গেলে সে দড়ি বেঁধে তাকে টেনে মুক্ত ক'রে দেয়।

গোয়ালন্দ ও দীঘা ঘাটের (পাটনার উজানে অবস্থিত) মধ্যে এই স্টীমার যাতায়াত করত। পরে যে সব লম্বা ও হাল্কা স্টীমার দেখা দিল তাদের নাম সবই মনে আছে। মিনার্ভা, জুপিটার, রোহিনী, সুহেইল, নেপচুন প্রভৃতি। পদ্মার উপরে ছিল সুরেশ ভৌমিকের বাড়ি। আমার সমবয়সী ছিল সে। সে ছিল স্টীমার-উন্মাদ। রাত দিন সে স্টীমারের স্বপ্ন দেখত, বহুদূর থেকে স্টীমারের বাঁশি শুনে ব'লে দিতে পারত কোন্ স্টীমার আসছে। উজান বা ভাটিতে কবে কোন্ স্টীমার সাতবেড়ে পার হবে তা সে মুখস্থ করে রাখত। ক্রমে আমারও ঘনিষ্ঠতা হ'ল এসব স্টীমারের সঙ্গে। একে একে সবগুলোতেই চড়লাম। ১৯১৭ সালে শেষ চড়েছি এ লাইনের স্টীমারে।

১৯০৫-৬ সালের কথা মনে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ পল্লী-গ্রামেও বিস্তৃত হয়েছে। দেশী কাপড় কিনছে অনেকে। পথে পথে "মায়ের

দেওয়া মোটা কাপড়" গান গেয়ে ফিরছেন গ্রামের উৎসাহীরা, তার মধ্যে আমিও সারাদিন ঘুরেছি বেশ মনে পড়ে। কি উদ্দেশ্য, কেন এ আন্দোলন, তা বোঝবার মতো বয়স নয়, শুধু এর মধ্যেকার রোমাঞ্চ আর উন্মাদনাটা অনুভব করেছি। সাতবেড়ে প্রকাণ্ড বন্দর। দুটো বাজার ছিল, নাম বড় গোলা, ছোট গোলা। বড় গোলায় বিদেশী বর্জন সম্পর্কে একটি সভা হয়েছিল, এবং সে সভায় বাবা বক্তৃতা দিয়েছিলেন—সেই ঘটনার একটি অস্পষ্ট ছবি মনে জাগে। তখন, বা কিছু পরে, আমি প্রথম বিড়ি দেখি সাতবেড়ে গ্রামে। কি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে যে দেখেছিলাম বিড়িকে আর দুর্লভ-দর্শন দু একজন বিড়ি-পায়ীকে! এই সময়কার একটি ঘটনা যা আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম সে হচ্ছে স্কুলে হিন্দু মুসলমানদের জন্য পৃথক রীতির প্রচলন। বাইরে থেকে ইনস্পেক্টর না কে এসে সব নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরে হেডমাস্টার আমাদের ডেকে বলেছিলেন, মুসলমান ছেলেরা সবাই টুপি পরে আসবে, তারা শিক্ষককে দেখলে হাত তুলে সালাম জানাবে, হিন্দু ছেলেরা হাত তুলে নমস্কার জানাবে। এই আপাত নির্দোষ রীতিটি খুব অল্পদিনের মধ্যেই চালু হ'ল এবং মুসলমান ছেলেরা উপরন্তু শুক্রবার বিকেলে নমাজ পড়ার নির্দেশ ও ছুটি পেল। বহুকাল পরে বুঝতে পেরেছি হিন্দু মুসলমানকে সম্পূর্ণ পৃথক করার মতলব ছিল এর পিছনে, এবং তা তখন থেকেই এইভাবে ঘোরাপথে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তখন গ্রামে হিন্দু মুসলমান শত্রুতা ছিল না, থাকা উচিত ব'লে কারো মনেও হয়নি, কিন্তু সরল গ্রামবাসীর মনে বীজ বপন করা হ'ল এই ভাবে।

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামে সাইকেল এলো একখানা। এক ডাক্তার এসেছিলেন তাইতে চ'ড়ে বাইরে থেকে। বহু লোকের ভিড় জমেছিল দু'চাকার গাড়ি দেখতে। সেই ডাক্তারের অতিমানবত্ব বিষয়ে আমাদের মনে আর কোনো সংশয় ছিল না।

তখনকার দিনে সুদূর পল্লীতে সংসারযাত্রা ছিল খুবই সরল। বাবা মাসিক পঞ্চাশ টাকায় চাকরি শুরু করেন। সংসার খরচ মাসে পাচ টাকার বেশি হত না। দৈনিক বাজার খরচ সর্বোচ্চ এক আনা। চাল দুটাকা আড়াই টাকা মণ। মাছের সময় এক পয়সার মাছ দুবেলার পক্ষে যথেষ্ট। ইলিসের মরশুমে একটা মাঝারি ইলিস এক পয়সা। একবার মাছের

কোনো দামই ছিল না, এক পয়সায় আটটা ইলিস। সেবারে মাছের শুধু ডিম খাওয়া হ'ত মাছ বাদ দিয়ে। তবে ইলিসের এমন প্রাচুর্য আর কখনো দেখিনি। কাঁচা লঙ্কা এক পয়সায় তিন চার সের, লাউ এক পয়সায় দুটো তিনটে, দুধ এক পয়সা দুপয়সা সের। ঘি মাখন সব সময়ে বাড়িতে তৈরি হত, বেশি দরকার হ'লে ঘোষেদের কাছ থেকে কেনা হ'ত আট আনা থেকে এক টাকা সের।

এই ছিল বাজারের সাধারণ অবস্থা। এ সময় নিজে অনেক দিন বাজার করেছি তাই মনে আছে। ইলিস মাছের সময় গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে নদীর ধারে বিদেশী পাইকারদের চালা উঠত। তারা প্রতিদিন প্রচুর ইলিস কিনে বসত কাটতে। প্রকাণ্ড ঝকঝকে ধারালো বঁটি, ডান হাতের বুড়ো আঙুলে পাট জড়ানো। মাছের মুড়ো বাদে সবটা মাছ তেরছা ভাবে চাকা চাকা ক'রে কেটে যাচ্ছে এক জন, আর একজন তাতে নুন মাখিয়ে পৃথক জায়গায় রাখছে। মাছের মুড়োগুলো শুধু তারা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে দিত। জায়গাটা আমাদের বাড়ির অনেকটা কাছে এবং মুড়ো খুব ভোর বেলা পাওয়া যেত ব'লে কিনতে যেতাম মাঝে মাঝে। এক পয়সার কিনলেই দুবেলা। এক পয়সায় সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৬টি মুড়ো কিনেছি অনেক দিন। সেদিন বাড়িতে শুধু মুড়োর ঝোল, আর চচ্চড়ি।

শীতের দিনে যখন ইলিস ক'মে আসত তখন অন্যান্য মাছ পাওয়া যেত প্রচুর। কোনো মাছই ওজন দরে বিক্রি নয়। ভোর বেলা পদ্মানদীর ধারে খরা জালে মাছ ধরা আরম্ভ হয়। নৌকা এক জায়গায় বেঁধে, প্রকাণ্ড ত্রিকোণাকার বাঁশের ফ্রেমে বাঁধা জাল ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছুক্ষণ পরে তার একটি কোণের উপর উঠে দাঁড়ালে মাছসুদ্ধ জাল উঠে আসে জল ছেড়ে। ছোট ছোট সুস্বাদু সব মাছ। সকালে কয়েক বন্ধু মিলে দাঁতন করতে করতে পদ্মার ধারে যেতাম মুখ ধুতে, রোদ পোয়াতে, আর এই মাছ কিনতে। ডাঙা থেকে খরাজালের দূরত্ব বারো চোদ্দ হাত। বড় রুমালের মতো বস্ত্রখণ্ডে এক পয়সা বা দুপয়সা বেঁধে ছুঁড়ে দিতাম নৌকার উপরে, জেলেরা পয়সা খুলে রেখে সেই কাপড়ে মাছ বেঁধে ছুঁড়ে দিত ডাঙায়। পিঁয়েল মাছ (পেট পিঙ্গল বর্ণ, তাই থেকে নাম) বাঁশপাতা মাছ, খরসোলা প্রভৃতি পাঁচমিশেলি মাছ, অদ্ভুত ভাল খেতে। যে-কোনো বাড়িতে আম জাম,

কাঁঠাল, কুল, পেয়ারা, আতা, কলা প্রভৃতি ফল ও বাড়ি সংলগ্ন ক্ষেতে বেগুন, লঙ্কা, সিম, লাউ, কুমড়োর ছড়াছড়ি। দূর দূর গ্রাম থেকে মুসলমান বিক্রেতারা শাকসব্জী, তরিতরকারী, দুধ, বাজারে বয়ে নেওয়ার পথে বাড়ির দরজায় বিক্রি করতে করতে যেত। পছন্দ মতো মাছ কিনতেই শুধু বাজারে যাওয়া। গ্রামে তখনও ব্রাহ্মণ বাড়িতে প্রকাশ্যে পেঁয়াজ খাওয়া চালু নয়, সবাই বাজার থেকে ও জিনিসটি ঢেকেঢুকে বাড়িতে আনত। আমি পেঁয়াজকলি বা পেঁয়াজ প্রকাশ্যে আনতাম, অথচ তার জন্য কেউ কোনো দিন কিছু বলেছে ব'লে মনে পড়ে না। আমরা ছিলাম বৈষ্ণব—আমার মা শাক্ত পরিবারের। বাড়িতে মাতৃ শাসনই প্রবল ছিল।

আমাদের বাড়ি ও আরও দু একখানি বাড়ি ভিন্ন সর্বত্র মেয়েদের চিরাচরিত গ্রাম্য সাজ। একখানি শাড়ি মাত্র সম্বল, না শেমিজ না ব্লাউজ না জুতো। বাডস শেমিজ প্রচলিত হয়েছিল তখন গ্রামেও এবং তার ব্যবহার অন্তত আমাদের গ্রামে দু তিনটি বাড়িতে আবদ্ধ ছিল। মেয়েদের জুতো পরা একেবারে অচল ছিল। আমার বোনেরা স্কুলে যাবার পর থেকে অন্দরে জুতো প্রচলিত হ'ল আমাদের বাড়িতে।

গ্রামে দলাদলি ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে। রাঢ়ি বারেন্দ্র দলাদলিই বেশি ছিল। কেউ কারো বাড়িতে খাবে না, আবার দেখতাম মাঝে মাঝে একসঙ্গে খাওয়াও হ'ত। বাবা বিদেশে থাকতেন এবং নিজে পড়াশোনা নিয়ে স্বতন্ত্র থাকতেন, কোনো গণ্ডগোলের মধ্যেই কখনো তাঁকে যেতে দেখিনি। সাতবেড়ে গ্রাম হিন্দু প্রধান ছিল, তার কারণ এটি ছিল একটি বিশিষ্ট বন্দর এবং ব্যবসা কেন্দ্র। তাই ব্যবসায়ী হিন্দু সম্প্রদায় ছিল এখানে বেশি। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় গ্রামে গ্র্যাজুয়েট মাত্র তিন জন—একজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের, এঁরা মৎস্য ব্যবসায়ী—এঁদের মধ্যে সবারই অবস্থা ভাল এবং তখন শিক্ষাক্ষেত্রে এঁরা এগিয়ে আসছেন। এঁদের সম্প্রদায়ের উমেশচন্দ্র হালদার ছিলেন এম-এ, কৃষ্ণনগর সরকারী স্কুলে ও কলেজে অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। আর একজন ছিলেন আমার বাবা। তিনি কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বি এ পাস করেন ১৮৯৭ সালে। আর একজন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সোমনাথ নামে পরিচিত ছিলেন) তিনি বার-অ্যাট্-ল হয়েছিলেন, অতএব গ্রামের সমাজ থেকে চ্যুত ছিলেন বলেই মনে হয়। তিনি দু একবার এসেছেন গ্রামে মনে পড়ে।

গ্রামের শীতের দিনের নদী ও মাঠের আবহাওয়া বর্ণনা করেছি কিন্তু ঘুরে ফিরে মন কেবলি ছুটে যায় সেই কালের মধ্যে, সেই দায়িত্বহীন প্রকৃতির কোলে লালিত শৈশবে। সেই বাশঝাড়, আসশেওড়া ঘেঁটু গাছের ঝোপ, তেলাকুচা, মাকালফলের লতা, মাটি ছোঁযা গুলঞ্চলতা, মাটি বেয়ে চলা পিপুললতা, গাছের ডালে ডালে দোয়েল, হলদে পাখী, হাঁড়িচাঁচা, টুনটুনি, শালিখ, ছাতারে—সব ছিল পরম আত্মীয়। লিখতে লিখতে লেখা থেমে গেছে কত বার, বেদনায় মন আর্ত হয়ে উঠেছে সেই পরিবেশ আর চলে যাওয়া দিনগুলির জন্য। সেই উদার নীলাকাশ, ওপারে ধুধু করা শাদা বালুচর, সোনালি রোদে সমস্ত স্বচ্ছ নদীটি উজ্জ্বল হযে উঠেছে। নৌকো চলেছে দূরে কাছে। সওদাগরি প্রকাণ্ড এক একখানা নৌকো ডবল পাল তুলে দিযে মন্থর গতিতে চলেছে। কোনো কোনো নৌকো গুন-টেনে নিযে চলেছে মাঝিরা। আকাশের গাযে চিল উড়ছে, মাছরাঙা ব'সে আছে খরাজালের বাঁশের উপর। জলে মাঝে মাঝে হুস ক'রে শুশুক মাথা তুলে ডুবে যাচ্ছে। এরই মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিযে ফেলতাম। মনে হ'ত এমনি মন্থর ভাবে, হাল্কা ভাবে, ভেসে চলি এপার থেকে ওপারে, তারপর আরও দূরে—আরও দূরে। আমি একা ঘর ছাড়া বালক, পৃথিবীতে আমার কোনো বন্ধন নেই। সমস্ত আকাশ, বাতাস, শস্য ক্ষেতের গন্ধ, পল্লীজীবন, পল্লীর মাটি, সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে একটি গানের স্বরের মতো আমার মনে বাজতে থাকত অবিরাম, আমার মাথা একটা অদ্ভুত মাদকতায় ঝিমঝিম করত।

গ্রামের ভিতরে বন্ধন, নদীর ধারে এলে উন্মাদকরা মুক্তির স্বাদ। মন ওপারের অদৃশ্য রেলগাড়ির এঞ্জিন-উদ্গিরিত ধোঁয়ার চিহ্ন ধ'রে অজানা দেশের স্বপ্ন গ'ড়ে তুলত। মনে হ'ত ছুটে চ'লে যাই দূর দুরান্তে—অবিরাম শুধু ছুটে যাই।

সেদিনের সব তুচ্ছ আজ অনেক বড় হয়ে উঠেছে। এক দিনের একটি সামান্য ঘটনা মনে এলো। প্রথম স্কুলে গিয়েছি—সেই সময়কার। আমাদের বাড়ি থেকে হাঁটা পথে প্রায় দশ মিনিট লাগত স্কুলে যেতে। পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাঁকের ধারে একটি বাড়ি ছিল। কার বাড়ি মনে পড়ে না। সেই বাড়ির একটি নিটোল স্বাস্থ্যের বউ কলসী কাঁখে নিয়ে ফিরছিল পদ্মা থেকে। আমি বই হাতে স্কুল থেকে ফিরছি একা। বৌটি আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোন্ বাড়ির ?

তখন আমি নিতান্তই শিশু। কোন্ বাড়ির আমি, এ প্রশ্নের উত্তর কি ভাবে দিতে হয় জানতাম না। আমি শুধু প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করলাম —ঐ দিকে, ঐ পথে গেলে একটা বাড়ি পাওয়া যায়, সেখানকার ছেলে। সে যদি আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করত তা হ'লে বলতে পারতাম। যদি আমার নিজের নাম জিজ্ঞাসা করত বলতে পারতাম। কিন্তু তুমি কোন্ বাড়ির ছেলে, এই ঘোরা প্রশ্নের সোজা উত্তর কি? সেই বয়সে তা আমার মাথায় আসেনি। খুব লজ্জা পেয়েছিলাম এবং নিজেকে খুবই ছোট মনে হয়েছিল এজন্য। পরে অনেক বার এই ঘটনাটা মনে পড়েছে এবং কেন প্রশ্নটি বুঝতে পারিনি এ জন্য নিজের উপর ভীষণ রাগ হয়েছে।

আজ এ ঘটনাটা হঠাৎ মনে এলো। আজ তো এর উত্তর জানি, কিন্তু আজ সে কোথায়? যদি সে বৌটি আজ বেঁচে থাকে, তবে তায় বয়স সত্তর পার হয়েছে নিশ্চয়। আজ সে স্থবির, একটিও তার দাঁত নেই, চামড়া শীর্ণ, হাতে হরিনামের মালা। আজ যদি তাকে খুঁজে বার করতে পারি তবে কাছে গিয়ে তার চেহারা দেখে চমকে উঠব। তাকে বলব, আমি তোমার সেদিনের প্রশ্নের আজ উত্তর দিতে এসেছি। কিন্তু সে বলবে সে উত্তর তার আজ আর প্রয়োজন নেই, কোনো দিনই ছিল না।

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় চিত্র

শিশুকাল থেকে বারো-তেরো বছর বয়স পর্যন্ত যে সব ঘটনা যখন যেমন মনে আসছে তাই লিখে চলেছি। সাতবেড়ের ঝড়ের কথা বেশ মনে পড়ে, বিশেষ ক'রে যে বারে ঝড়ের সঙ্গে বড় বড় শিল পড়েছিল।

সাতবেড়ে অঞ্চলে এবং ফরিদপুর জেলার উত্তর অঞ্চলে—এই দু জায়গারই মাত্র অভিজ্ঞতা তখন—বোশেখ মাসে প্রায় প্রতি দিন ঝড় বৃষ্টি হয়। বিকেলের দিকেই সাধারণতঃ। এই ঝড়ের খেলা জ্যৈষ্ঠমাসের আধাআধি পযন্ত চলে। অতি অল্পক্ষণের আয়োজনে প্রলয় কাণ্ড। মেঘহীন ভালমানুষ আকাশ, দূর দিগন্তে পশ্চিম দিকে বা উত্তর পশ্চিম কোণে সামান্য একটুখানি কালো আভাস —বার্কের ভাষায় no bigger than a man's hand—কিন্তু ওতেই যথেষ্ট। অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলতে কয়েক মিনিটের কাজ কি তৎপরতা। মনে হবে যেন কেউ প্রকাণ্ড এক অদৃশ্য তুলির টানে মেঘ এঁকে যাচ্ছে শূন্য আকাশ পটে।

স্তরে স্তরে সাজানো কাজল-কালো মেঘ। বর্ষাকালের পদ্মার স্রোতের মতো টগবগ ক'রে ফুটে-ওঠা আকাশ নদী। উপরের স্তরের কিছু মেঘ নিচে নামছে, নিচের স্তরের কিছু মেঘ উপরে উঠছে। সাজানোর কাজটি কিছুতে যেন মনের মতো হচ্ছে না। আতঙ্কিত পাখীরা ছুটে চলেছে আশ্রয়ের খোঁজে। তাদের স্পর্শ-চেতন মনে বিপদের সঙ্কেত এসে গেছে। আকাশের গায়ে তাদের একটানা গতি। তারপর দেখতে না দেখতে সহসা শুকনো পাতা আর ধুলোবালি উড়িয়ে, বড় বড গাছকে হেলিয়ে দুলিয়ে, ডালের মড়মড় ও শুকনো পাতার ঝনঝন শব্দের সঙ্গে একটানা শাঁ শাঁ শব্দ মিশিয়ে ঠাণ্ডা প্রবাহের সঙ্গে উঠে এলো ঝড়। কি তার প্রবলতা! সর্বাঙ্গে অনুভব করা যায়। তখন জানাশোনা আর সকল শক্তির উৎসকে খেলো মনে হয়।

ঝড়ের এ সর্বনাশা মূর্তির সঙ্গে পল্লীবাসী আমাদের শিশুকাল থেকে পরিচয়।

বিশেষ ক'রে পাবনা-ফরিদপুর অঞ্চলের লোকের। এ রকম নিযমিত ঝড কলকাতায় হয় না। এবং যে ঝড হয়, তা যত প্রবলই হোক, তাতে শহরের অনমনীয় ইটের বাড়িগুলোর সঙ্গে তার সঙ্ঘর্ষে যে শব্দ হয় তা ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ বড যোগ হয় না। কিন্তু পল্লীর ঝড়ে হাজার হাজার বনস্পতির আর্তনাদ যোগ হয়। প্রকৃতির সে এক অদ্ভুত আবির্ভাব-রূপ, আর মানুষের মনে তার অদ্ভুত অনুভূতি।

আমি যে বিশেষ ঝডটির কথা এখন স্মরণ করছি—সে ঝড়ের সঙ্গে প্রকাণ্ড এক একটা শিল পড়েছিল, এত বড শিল আমি আর দেখিনি। অবশ্য সাতবেড়ে গ্রামাঞ্চলে ঝ ্বৃষ্টির সময় নিয়মিত শিল পড়ে এবং প্রতি বছরই অন্তত দু একদিন পথঘাট ঢেকে যায় শিলে। পঞ্চাশ বছর আগের কথা বলছি। আজ সে আবহাওয়ার বদল হয়েছে কি না কোনো ধারণা নেই। তখন এটি বছরের স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। শিল কুড়িয়ে মোটা কাপড়ে চাপ দিয়ে বল তৈরি ছিল আমাদের সাধারণ খেলা। কলকাতায় (১৯৩৬ সম্ভবত) একবার মাত্র পথঘাট ছেয়ে যাওয়া শিল পডতে দেখেছি। কিন্তু আমি যে বিশেষ শিলের কথা বলছি তা এত বড যে কলকাতার সর্ববৃহৎ পঞ্চশিল বা ষট্শিল জুডলেও তার সমা হবে ব'লে মনে হয় না। ছোট ছিলাম বলেই যে ছোট জিনিসকে বাড়ি । দেখেছি তা নয়, বড়রাও সবাই বলেছেন সে শিল অতিকায় শিল।

সে দিন এমনি ব বড শিল আকাশ ভেঙে নিচে পড়েছিল বহুক্ষণ ধ'রে। গ্রামে অধিকাংশই প্রায় টিন আর খড়ের ঘর। বহু খড়ের ঘর ভেদ করেছিল সে শিল, আর টিনের উপর ঘণ্টাখানেক ধ'রে সেই অজস্র শিলের অবিরাম বর্ষণ। মনে হচ্ছিল যেন শিলভরা সম্পূর্ণ আকাশ-কড়াইটাকে সমস্ত পৃথিবীর উপর কাত ক'রে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। ভযে নির্বাক হযে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখছিলাম সে দৃশ্য।

গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ি বড বড '্ছের আড়ালে ঝড়ের হাত থেকে অনেকটা নিরাপদ, কিন্তু শিলের হাত থেকে বাঁচবার উপায নেই। সে দিনও অনেক বাড়ির ক্ষতি হযে ল। এর সঙ্গে যে ঝড ছিল তা অতি প্রবল হাওয়া সত্ত্বেও তার কোনো পৃথক শব্দ আর সেদিন কর্ণগোচর হযনি, শিলের শব্দ আর সব শব্দকে ঢেকে দিযেছিল। আমাদের স্কুলের জন্য বাইরে খোলা

জায়গায় করুগেটেড শীটের বড ঘর তৈরি হচ্ছিল। পরদিন শুনলাম ঝড়ে তার চাল উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে অনেক দূরে। গিয়ে দেখেছিলাম, কাগজের শীটের মতো জড়ানো টিনের শীট অন্তত সিকি মাইল দূরে বিধ্বস্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে। স্কুল ঘরের চারদিক তখনও খোলা ছিল, বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়নি, অতএব ঝড় অবাধে ভিতরে ঢুকে চাল ছিঁড়ে মাথায় তুলে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

বালককালে গ্রাম্যজীবনের সকল দিকের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলাম। বয়স্কদের যা করতে দেখেছি তাই আদর্শ মনে ক'রে তার অনুকরণ ক'রে কৃতার্থ বোধ করেছি। মাছধরা তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

চারদিকে মাছ। স্নান কবতে নেমে কাছাকাছি-বাঁধা নৌকোর গায়ে গামছা অথবা কাপড় দিয়ে মাছধরা ছিল খুব সোজা। দুজনে দুদিকে ধরে গামছার একপাশ ডুবিয়ে নৌকোর গায়ে গায়ে চেপে ধ'রে উপরে তুললেই অনেক মাছ। চিংড়ি মাছই বেশি। শীতের মুখে যখন খানা ডোবা সব শুকিয়ে আসত তখন অল্প জলে পলো দিয়ে মাছ ধরেছি। আরও কম কাদাজলে হাত দিয়ে শিঙি মাগুর প্রভৃতি অনেক ধরেছি, মাছের কাঁটার ঘা-ও খেয়েছি অনেকবার। বর্ষার মুখে পদ্মার জলে বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি খাঁচা পেতে মাছ ধরাও খুব চলতি ছিল। ওখানে তার নাম ছিল দোয়ার। কোথায়ও বলে দিয়ার, মনে হয় দুয়ার কথার অপভ্রংশ। কৌশলপূর্ণ দুয়ার এর বৈশিষ্ট্য। মাছের প্রবেশের জন্য সেই দুয়ার। এই খাঁচা বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি। দোয়ার পেতে দুধারে বাঁশের কাঠির ক্রস্ পুঁতে তার সঙ্গে শক্ত ক'রে বেঁধে দিতে হয়—তারপর দোয়ারের মুখ থেকে ডাঙা পর্যন্ত পাতলা চেঁচাড়ির তৈরি চিকের মতো দেখতে তিন চার হাত লম্বা বেড়া পুঁতে দিতে হয়, যাতে মাছ তাতে বাধা পেয়ে দোয়ারের মধ্যে ঢুকে যেতে বাধ্য হয়। একবার ঢুকলে আর বেরোতে পারে না এমন কৌশলে তৈরি। সন্ধ্যা বেলা দোয়ার পেতে খুব ভোরে গিয়ে তুলতে হয়। বড় বড় চিংড়ি ও আড় মাছের বাচ্চা প্রভৃতি অনেক ধরা পড়ে। পিছনের ছোট্ট দরজা খুলে বার করতে হয়। আমিও একবার একজনের প্রায় পায়ে ধ'রে একটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু বর্ষার পদ্মায় বালকের পক্ষে সেটি বিপজ্জনক বোধ হওয়ায় এক দিনের বেশি শখ করা চলল না।

পল্লীগ্রামে ঘুড়ি ওড়ানোর শখ ছোটদের মধ্যে যেমন বড়দের মধ্যেও তেমনি দেখেছি। কলকাতায় যেমন প্রতিযোগিতা ক'রে ঘুড়ি কেটে দেওয়ার রীতি বা খেলা, আমাদের সে রকম ছিল না। যার যার ঘুড়ি তার তার হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়ছে। সে সব ঘুড়ির চেহারা বিচিত্র। যে চতুষ্কোণ ঘুড়ি কলকাতার আকাশে ওড়ে আমাদেরও অর্থাৎ ছোটদের ঘুড়িও তাই, ক্বচিভেদে কারো কারো ঘুড়ির সঙ্গে দীর্ঘ ল্যাজ জোড়া থাকত। দশ পনেরো বিশ হাত ল্যাজ এবং ঘুড়ি আমরা প্রত্যেকে নিজ হাতে তৈরি ক'রে নিতাম। একাজ অত্যন্ত সহজ ছিল: সাধারণ কাগজের ঘুড়ি, জেলেদের জালবোনা ভারী সুতোয় ওড়ানো হত। সুতো কেনা নয়, বন্যার আগে পদ্মার বিস্তীর্ণ বালু তীরে জাল মেরামত করত জেলেরা, তারই সব ফেলে দেওয়া সুতো কুড়িয়ে কুড়িয়ে জোড়া হ'ত। প্রকাণ্ড ফুটবলের মতো গুলি। ঘুড়ি দূর আকাশে উঠে যেত। ল্যাজ সুদ্ধ ঘুড়ির নাম ছিল পতিং। বাবা বলতেন কথাটা বোধ হয় পতঙ্গ থেকে এসেছে। আমাদের ঘুড়ি তৈরিতে জিওল গাছের আটা ব্যবহার করতাম। কোনো দিকে ওজন সামান্য কিছু ভারী হলে বিপরীত দিকে ঘাস বেঁধে ওজন ঠিক ক'রে নিতাম।

বয়স্কদের ঘুড়ি অন্য জাতের, ঢাউস ও কোযাড়ে। এ সব নাম কোথেকে এলো জানি না। তবে চীন দেশের ঘুড়ির ছবি দেখেছি তাতে ঐ ঢাউসের চেহারার মতো ঘুড়ি দেখেছি। ঢাউস উড়লে উড়ন্ত চিলের মতো অনেকটা দেখতে হয়, অথবা বাদুড়ের মতো। কোযাড়ের চতুষ্কোণ চেহারাটা সৌন্দর্যহীন বলা চলে। তার চারদিকে চারটি কালো নিশান। দুখানা পা ও দুখানা হাতের মতো, শুধু মুণ্ডটি নেই। কোয়াড়ের উপরের অংশ ধনুকের মতো, ছিলেটা বেতচেরা ফিতের। উপরে উড়তে থাকলে একটানা বোঁ-বোঁ শব্দ বাঁশির শব্দের মতো বাজতে থাকে। হাতে ধ'রে বেশিক্ষণ রাখা যায় না এমন তার শক্তি। গাছে বেঁধে রাখতে হয় তার মোটা দড়ির একপ্রান্ত। বাঁশের শলার ফ্রেমে কাগজ আঁটা লম্বা বাক্সের মতো ঘুড়িও দেখেছি কদাচিৎ, তার নাম ফানুস ঘুড়ি। কোযাড়ে ঘুড়ি যারা ওড়ায তারা ঘুড়িকে সমস্ত রাত গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে, সমস্ত রাত আকাশে বাজতে থাকে এক ঘেয়ে বাঁশি। কেউ কেউ শখ করে ঢাউস ঘুড়ির মুখেও ছোট্ট একটি ধনুক লাগিযে দেয়— বেতের পাতলা ছিলেযুক্ত ধনুক। এ ধনুকও বাজতে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় আর একটি জিনিস গ্রামে বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে সেখানে স্বাস্থ্যচর্চার আয়োজন। খেলার মাঠের কোণে, বাড়িসংলগ্ন জমিতে, এমন কি বাড়ির ভিতরেও প্যারালেল বার ও ডন বৈঠকের আয়োজন। বয়স তখন আমার আটের বেশি নয়, আমিও এর অনুকরণ করতাম, কিন্তু এটি যে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তা জানতাম না। অনেক পরে বুঝতে পেরেছি এ সব। আমরা কয়েক বন্ধু পদ্মার ধারে বালু জড়ো ক'রে নিতাম এবং সেই বালুস্তূপের উপর উপুড় হ'য়ে পড়তাম দুই কনুইয়ে ভর ক'রে। দুই হাত দুই সমকোণে ভেঙে দেহ সম্পূর্ণ সরল রেখে এ রকম পড়া বেশ অভ্যাস সাপেক্ষ। এখন যদি এ রকম করতে যাই তা হ'লে দুহাতের জোড় খুলে যাবে।

গ্রামে তৈরি ব্যাট ও বল দিয়ে আমরা ক্রিকেট খেলতাম পদ্মার ধারে। কখনো বা স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে কোনো মাঠে ফুটবল খেলা হ'ত। স্কুলের নিজস্ব কোনো খেলার ব্যবস্থা ছিল না। তখনও সাঁতার কাটা সম্পূর্ণ শিখিনি, মাঝে মাঝে অভ্যাস করছি মাত্র।

একটি স্ত্রীলোককে কুমীরে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, গল্প শুনেছি। বর্ষাকালেই কুমীরের ভয় বেশি। তাকে সবাই সাবধান ক'রে দিয়েছিল—বলেছিল কুমীর দেখা দিয়েছে, বেশি দূরে যেয়ো না, কিন্তু সে তা শোনেনি, বলেছিল এতকাল চান করলাম—

কথা শেষ হবার আগেই তার পায়ে টান পড়েছিল এবং 'ওরে বাপরে' ব'লে ডুবে গিয়েছিল। এ ঘটনা আমার জন্মের পূর্বে ঘটেছিল। আমার কানে মাত্র একদিন একটি উত্তেজক খবর পৌঁছেছিল—বড় গোলার ঘাটে এইমাত্র একজন লোককে কুমীরে ধ'রে নিয়ে গেল।

কুমীরের মানুষ ধরা ও মানুষ খাওয়া সম্পর্কে গ্রামে নানা রকম কাহিনী প্রচলিত; তখন সেসব কাহিনী বিশ্বাস করতাম সরল মনে। যারা বলত তারাও বিশ্বাস করত। শুনেছি কুমীর মানুষ ধ'রে নিয়ে কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে ওঠে, তারপর তার হাত পা মুণ্ড প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ল্যাজের সাহায্যে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে শূন্য থেকেই লুফে নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলে। কুমীর সোজাসুজি দেহ থেকে কামড়িয়ে খেতে পারে না। কুমীরের একটি গোপন ভাণ্ডার থাকে, সেখানে সে স্ত্রীলোকের দেহে যে সব

অলঙ্কার পায়, সেগুলো জমা করে রাখে। এভাবে একটি কুমীরের ধনভাণ্ডারে হাজার হাজার টাকার অলঙ্কার জমা হয়ে আছে। কেন আছে এবং এর উদ্দেশ্য কি, তা কেউ জানে না, ওটা কুমীরের স্বভাব, অতএব সমালোচনার বাইরে।

একবার বাঘে মানুষ ধ'রে নিয়ে গেছে গ্রামে ঢুকে, এমন কাহিনীও শুনেছি। কোন্ এক অনঙ্গের মাসির ভাগ্য ছিল খারাপ। এ ঘটনাও আমার জন্মের পূর্বেকার। একবার বর্ষাকালে একটি টাইগার কি করে গ্রামে ঢুকে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল এবং হৈ হৈ গণ্ডগোলে একটি হেলানো তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামে শিকারী নেই কেউ। চারদিকে বহুলোকের পাহারা। কয়েক জন ছুটে গেল তাঁতিবন্দের চৌধুরী জমিদারদের বাড়িতে মাইল ছয়েক দূরে। তাঁরা বললেন সমস্ত রাত আটকে রাখ বাঘ, সকালে গিয়ে মারা হবে।

সমস্ত রাত নানারকম কানফাটানো আওয়াজ ও হল্লা ক'রে বাঘকে ঘিরে রাখা হ'ল, সকাল হ'লে সবাই একে একে চ'লে যেতে লাগল, কারণ এখন তো আর ভয় নেই, এখন দিনের আলো—বাঘের সাধ্য কি এক পা হাঁটে। দিনের আলোয় ওরা চোখে দেখে না। কিন্তু যখন বাঘ চোখেও দেখল এবং এক পা এক পা ক'রে এগিয়েও আসতে লাগল, তখন অবশিষ্ট লোকগুলো কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এ কি অবিশ্বাস্য কাণ্ড! এ বাঘের অসাধ্য তো তা হ'লে কিছুই নেই। এটি নিশ্চয় সামাজিক প্রথা অমান্যকারী বাঘ। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যত অভিযোগই থাক, প্রত্যক্ষ সত্য কথাটি এই যে বাঘ দিনের বেলা ভালই চোখে দেখে এবং সে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তখন গতিশক্তি-রহিত বেপমান লোকগুলো চাপা এবং কাঁপা গলায় বলতে লাগল, ওরে তোরা সোর গোল করিস নে, যেতে দে, যেতে দে।

বাঘ অবশ্য এ অনুমতির অপেক্ষা না করেই চলতে শুরু করেছিল। কাছেই ঘন জঙ্গল ছিল, সেখানে সে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। শিকারীরা এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন। আমাদের বাল্যকালে এসব কাহিনী নিয়ে মুখে মুখে ছড়া রচিত হয়ে খুব প্রচারিত হয়েছিল, এখন আর সে ছড়া মনে আনতে পারি না।

প্রচুর সাপ থাকা সত্ত্বেও আমি মাত্র একটি লোককে সাপের কামড়ে মারা যেতে দেখেছি ছেলেবেলায়। ওঝারা কি ভাবে ঝাড়ার কাজ করে, মাঝে মাঝে গায়ে জল ঢালে, গাছের ডাল দিয়ে চাবুক মারে, আর মন্ত্র আওড়ায়, সব দেখেছি। তিনদিন পরে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল। আমি একবার মাত্র শীতকালের এক রাত্রে বাঘের ডাক শুনেছি ঘরের পাশে। শীতকাল হচ্ছে বাঘের মরশুম। চারদিকে টিনের আওয়াজে ঘুম ভেঙেই শুনি বাঘের ডাক। কুকুরটা কোথায় যেন লুকিয়ে শুকনো গলায় দীর্ঘ একটানা কেঁউ কেঁউ শব্দ ক'রে চলেছে। বাঘটা বোধ করি মিনিট দশেক ডেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাবার মুখে শুনেছি ঠাকুরদার (দেবনাথ) চরিত্র স্মরণীয় ছিল, তিনি সাধু ব্যক্তি ছিলেন। যা কিছু হাতে আসত সব বিলিয়ে দিতেন সবাইকে। কেউ কিছু বিক্রি ক'রে গেলে (দুধ মাছ ইত্যাদি) যদি পরে শুনতেন বাজার দরের চেয়ে শস্তায় দিয়ে গেছে, তা হলে পরে তাদের জোর ক'রে আরও বেশি দিয়ে দিতেন। বাড়ির জমির ফল বা তরি তরকারী পাড়ার সবাইকে দিয়ে তারপর খেতেন। এই প্রসঙ্গে বলি—আমাদের বংশ তালিকায় দেখেছি উর্ধ্বতন অধিকাংশ ব্যক্তিই কিছুকাল সংসার করার পর সংসার ত্যাগ ক'রে গেছেন। শুনেছি সংসার বিষয়ে উদাসীনতা আমাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য।

গ্রামে ম্যালেরিয়া ছিল খুব। আমরা প্রায় জ্বরে ভুগতাম। আমার অনুজ সুবিমল, তার হ'ল কালাজ্বর। তখন ও নাম ছিল না, ওর নাম ছিল দোকালীন জ্বর। ওর কোনো চিকিৎসা ছিল না তখন। বাবা-মা তাকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। আমার তখন বয়স এগারো। আমি বাড়িতেই ছিলাম। বহু-রকম চিকিৎসা হয়েছিল কলকাতায়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেছিলেন জগৎ রায়, কবিরাজি চিকিৎসা করেছিলেন বিজয়-রত্ন সেন। এসব মনে আছে—চিঠিতে লিখতেন বাবা। আড়াই মাস পরে রতনদিয়া (মাতুলালয়) থেকে কুটীশ্বর নামক একটি লোক এসে খবর দিল ওঁরা সব কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন রতনদিয়া। ভাইয়ের অবস্থা অনেকটা ভাল। আমাকে যেতে হবে রতনদিয়া। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম। শীতকাল। খেয়া পার হয়ে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে

চলেছি। পায়ে বুটজুতো, হেঁটে খুব আরাম। কি উৎসাহ রতনদিয়া যেতে। বেলা চারটেয় রওনা হয়ে প্রায় আটটায় এসে পৌঁছলাম রতনদিয়া। বাবার কাছে যেতেই আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে বললেন সে আর নেই রে।

বাবা সেবারে আর সাতবেড়ে ফিরলেন না। ১৯১০ সালের গোড়ার দিকে, বাবা ওখান থেকেই আমাকে পোতাজিয়া নিয়ে চললেন হাই স্কুলে ভর্তি ক'রে দেবেন বলে। হঠাৎ এলাম নতুন পরিবেশে। এক ক্লাস উপরে ভর্তি হলাম- অর্থাৎ নিয়ম মতো হওয়া উচিত ক্লাস ফাইভ, কিন্তু ভর্তি হয়েছিলাম ক্লাস সিক্সে। গোয়ালন্দ থেকে ভোরবেলা ব্রহ্মপুত্র লাইনের স্টীমারে চেপে বেলা ১১টা আন্দাজ সময়ে পাবনা জেলার আড়ালিয়া (পরে সাবুগঞ্জ) স্টেশনে এসে নামতে হয়। তারপর সেখান থেকে নৌকো ভাড়া ক'রে বড়াল নদীপথে রাউতারা গাম, তারপর সেখান থেকে মাইল খানেক হাঁটা পথে পোতাজিয়া। বর্ষাকালে বাড়ির দরজায় আসে নৌকো। স্থানীয় জমিদার অম্বিকানাথ রায় স্কুলের সেক্রেটারি, তাঁদের প্রশস্ত একটা ঘরে ছিল হেড মাস্টারের বাস।

এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বড়ই কষ্ট হ'তে লাগল। রেড়ির তেলের প্রদীপে রাত্রে পড়া। তার সল্‌তে অদ্ভুত। বর্ষাকালে জলে এক রকম লতা গাছ হয়, তারই ভিতরের শাঁস, গোল লম্বা এবং শাদা, স্পঞ্জের মতো তেল শুষে নেয়। তাতেই প্রদীপ জ্বলে। গ্রামটিও অদ্ভুত। এক একটা উঁচু জায়গার উপরে এক একটা পাড়া। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যেতে হ'লে পাহাড়ের মতো নিচে নেমে কখনো সঙ্কীর্ণ ঢালু পথ বেয়ে, কখনো বা বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে গিয়ে আর এক পাড়ায় আরোহণ। বর্ষাকালে জলে সব ভরে ওঠে এবং দুই পাড়ার মধ্যবর্তী জল, পাড়ার জমির সমতলে এসে দাঁড়ায়। তখন নৌকোয় যাতায়াত। গ্রামটি প্রকাণ্ড, কিন্তু এ রকম পল্লী ভেনিস আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। এ গ্রামে সাইকেল বা মোটর সম্পূর্ণ অচল।

মনে হল এ আমার নির্বাসন। এ রকম জায়গায় বাবা কেন এবং কি ভাবে, এসেছিলেন তা আমি জানি না। তবে এ সময়ের দু বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পোস্টকার্ড আমি দেখেছিলাম ; চিঠিখানি এই—

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

বোলপুর বিদ্যালয়ে ইংরেজি অধ্যাপনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। বেতন পঞ্চাশ—বিদ্যালয় গৃহেই বাস করিয়া অন্যান্য অধ্যাপকদের সহযোগে ছাত্রদের পর্যবেক্ষণভার লইতে হয়। যদি এ কার্যভার গ্রহণ করা আপনার অভিমত হয় তবে কতদিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে পারিবেন জানাইবেন। লোকের অভাবে ক্ষতি হইতেছে অতএব আপনার মত জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। আমি ফাল্গুন মাস এখানেই যাপন করিব স্থির করিয়াছি যদি সুবিধা মত আমার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর হয় তবে সকল কথা আলোচনা হইতে পারিবে। আশা করি ভাল আছেন। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্ডের বিপরীত দিকে ডাক ছাপ SHELIDAH. B O 18 FE 08 NADIA

ঠিকানা—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী সমীপেষু

Potazia (Pabna)

কার্ডখানা আজও আমার কাছে আছে। এক পয়সা দামের পোস্ট কার্ড ১৯০৮ সালে লেখা।

বাবা ১৮৯৮ সালে প্রথম এখানে হেড মাস্টার হয়ে আসেন। এ চিঠি দেখার পর আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবাকে, কিন্তু তিনি কি বলেছিলেন মনে নেই, কিংবা হয় তো বলেছিলেন এখানকার দায়িত্ব হঠাৎ ছাড়ি কি ক'রে। ১৯২৩ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অন্য একটি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বাবার কথা উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন "আমি একবার ডেকেছিলাম তাঁকে, হয় তো যেখানে ছিলেন সেখানকার সবাই তাঁকে ছাড়তে চাননি।" আমি বলেছিলাম—"সম্ভবত তাই।"

পোতাজিয়া গ্রামটি যত বিচিত্রই হোক, আমার শিশুকালের পরিচিত সকল পরিবেশ থেকে এমন বিচ্ছিন্ন মনে হ'তে লাগল যে সহজে এ জায়গার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। মানিয়ে নিতে দেরি হ'ল,

যদিও একবার দেশে গেলে সহজে আর এখানে আসা হ'ত না। এখানে সব চেয়ে খারাপ লাগত বাইরের সঙ্গে এর যোগাযোগহীনতা। সাত-বেড়েতে ছিল পদ্মা, তার চলন্ত রূপ আমার মনকে সচল ক'রে রাখত। ওপারে ছিল রেলগাড়ি, সেও সর্বদা চলছে কত দূর দেশে। কিন্তু এখানে কিছু নেই। বহুদূরে ছোট নদী, আমার কল্পনাকে বহন করার পক্ষে তা বড়ই ছোট।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগাযোগ আবিষ্কার ক'রে নিলাম। সে আমার কত বড় মুক্তি। সে হচ্ছে এখানকার ডাকঘর। এই ডাকঘরই তো আমার কাছে এত দিন বাইরের জগতের স্বাদ গন্ধ বহন ক'রে এনেছে, এখানেও তারই আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ছোটদের জন্য যে সব মাসিকপত্র ছিল তার গ্রাহক হয়ে গেলাম। বড়দের কাগজও আমার অপঠিত থাকত না। এ ভিন্ন আমার পরিচিত যাবতীয় বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলাম নিয়মিত। তার ফলে প্রতি ডাকে আমার নামে অনেক চিঠি না হয় পত্রিকা আসত, এবং এরই জন্য সমস্ত দিন আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম। বিকেলে ডাকঘরে না যেতে পারলে দিনটি বৃথা মনে হ'ত। বর্ষাকালে নৌকোয় যেতাম, এবং আমি নিজেই নৌকো চালিয়ে যাওয়া শিখে গেলাম অল্প দিনের মধ্যে।

সেক্রেটারি অম্বিকানাথ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকুমুদনাথ রায় (পরে অবসর প্রাপ্ত সেশনস জজ এবং ১০-১০-৫৭ তারিখে পরলোক গত)—তিনি তখন মুনসেফ। পরিবারে তাঁরই দুই পুত্র মাত্র, ফণী ও মণি। বড়, ফণী, আমার সহপাঠী। ফণী 'মুকুল'-এর গ্রাহক ছিল, আমিও এখানে এসেই প্রথমে মুকুলের গ্রাহক হই এবং ধাঁধার উত্তর দিয়ে নিজের নাম ছাপা দেখে বড়ই পুলকিত হই। নাম ছাপার অক্ষরে ইতিপূর্বে ইংরেজীতে দেখেছি। এপিফ্যানি নামক খ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ক সাপ্তাহিক কাগজখানা আমার নামে আসত বরাবর, ইংরেজী শেখার আগে থেকেই। জলছবির যুগে বিজ্ঞাপন দেখে রবার স্ট্যাম্প ও পকেট প্রেস—নানা জাতীয়, কত যে আনিয়েছিলাম তার সীমা-সংখ্যা নেই। প্রথম বয়সে নাম ছাপার অক্ষরে দেখার একটা মোহ আছে। ও যেন নিজেকেই পরিচ্ছন্ন আকারে দেখা।

ডাকঘরে চিঠির পর চিঠি। এই চিঠি লেখা আমাকে নেশার মতো পেয়ে

বসল। আমার রচনা শিক্ষা, বাংলা বা ইংরেজী, কলেজ জীবন পর্যন্ত এই চিঠির সাহায্যেই হয়েছে ব'লে আমি মনে করি।

মুকুলের পরে (কতদিন পরে মনে নেই) গ্রাহক হই 'প্রকৃতি'র এবং তারপর 'শিশু'র। প্রকৃতি আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। ওতে পি ঘোষের আঁকা ছোট ছেলেমেয়ের ছবির মধ্যে এমন একটা অভিনবত্ব পেলাম যা তার আগে কোনো বাঙালী শিল্পীর ছবিতে পাইনি। এই প্রকৃতিতেও ধাঁধার উত্তর দেওয়া চলত নিয়মিত এবং শেষে ফণীর অনুকরণে ধাঁধাও পাঠিয়েছিলাম এবং তা ছাপা হয়েছিল। আমার আঁকা ছবি দুবার ছাপ হয়েছিল প্রকৃতিতে। যতদূর মনে পড়ে এই প্রকৃতি কাগজেই ১৯১১ সালেরা মোহনবাগান দলের ছবি দেখে কি আনন্দ ও গব যে অনুভব করেছিলাম! আজও সে কথা মনে এলে ভাল লাগে। এক পুজোর ছুটিতে রজনীকান্ত সেনের মৃত্যুর সাচত্র খবরও প্রকৃতি কাগজেই দেখেছিলাম।

কিন্তু ডাকঘরের খোলা পথ সত্ত্বেও আমার মন ছুটে যেত দূর পদ্মা নদীর তীরে। সেখানকার আকাশ বাতাস, সেখানকার ক্ষেতের ছবি, সেই সরষে তেলের ঝাঁঝালো গন্ধের পরিবেশে ব'সে ঘানিতে পাক খাওয়া, বর্ষায় নব অঙ্কুরিত আম আঁঠির শাঁস বা'র করে তার বাঁশি বাজানো, কুমোরের চাকের পাশে অপলক চেয়ে থাকা, সেই যতদূর ইচ্ছে পদ্মার পাড়ে ছোট ছোট ঝাউ গাছের ঝোপের ভিতর দিয়ে লক্ষ্যহান ঘুরে বেড়ানো, সব এক সঙ্গে মনে জেগে উঠত। চোখে শিশুকাল থেকেই কিছু কম দেখতাম। দূর দৃষ্টি ঝাপসা ছিল, তার সঙ্গে চোখের জল মিশে সব যেন কোথায় হারিয়ে যেত।

দেশের প্রত্যেকটি ইঞ্চি মাটির সঙ্গে আমার কি কঠিন বন্ধন তা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ছিল না, আজও নেই, কিন্তু তার স্মৃতি মনকে বিচলিত করে। তখনও এমনই করত। তাই আমি পোতাজিয়াতে কোনো বছরই দুতিন মাসের বেশি থাকিনি। স্কুলের পড়ায় মনোযোগ খুব বেশিক্ষণ রাখতে পারতাম না, সে জন্য ভাল ছাত্র হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনো হয়নি। পাঠ্য বস্তু মোটামুটি বুঝে যেতাম, এবং অতি দ্রুত সব জ্ঞাতব্যেরই মূল সত্যটি অস্পষ্ট হলেও চকিতে চোখে ভেসে উঠত। সেজন্য খুঁটিনাটি তথ্যে কোনো আগ্রহ ছিল না। কোনো একটি বিষয় নতুন জানলে নতুন আবিষ্কারের

আনন্দে মনে উত্তেজনা জাগত, আমি যা জেনেছি তা সবাইকে না জানানো পর্যন্ত ভাল লাগত না। এ আমার একটি নতুন উত্তেজনা ছিল।

এই সময় ১৯১০ সালের শেষের দিকে প্রথম কলকাতা যাবার সুযোগ ঘটল। সাতবেড়ে গ্রামের এক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ছেলে কলকাতা কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন, তাঁর নাম মুকুন্দলাল হালদার। গৌরকান্তি, স্বাস্থ্যবান, মধুর স্বভাব, মধুরভাষী। তিনি স্কট লেনের সুবিখ্যাত মৎস্য-ব্যবসায়ী মতিলাল কুণ্ডু মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতা এলাম এবং ঐখানেই উঠলাম। কলকাতায় প্রথম, তাই প্রায় সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দিন কাটত। মনে আছে এই সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে ফোটোগ্রাফ তুলিয়েছিলাম আট আনা দিয়ে। কাঁচের উপরেই পজিটিভ প্রিণ্ট্, পিছন কালো কাগজে ঢাকা ও আর একখানা কাঁচ চাপিয়ে ফ্রেমে এঁটে দেওয়া। এক আধখানা মোটর গাড়িও পথে দেখেছিলাম মনে পড়ে। পরের বছরের শেষে পঞ্চম জর্জ আসা উপলক্ষে কলকাতা আসার প্রবল একটি বাসনা জাগে মনে, এবং রতনদিয়ার কাছে কালুখালি স্টেশন উঠে আসাতে একা যাওয়া খুবই সুবিধাজনক মনে হ'ল। কিন্তু সে কি ভিড়! রিটার্ন টিকিট কিনে ডিসেম্বরের বোধ হয় ২০শে ২১শে থেকে ঢাকা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ওঠার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলাম, এবং কয়েকদিন চুপ ক'রে থেকে ২৮শে কিংবা ২৯শে তারিখে নতুন টিকিট কিনে দিনের গাড়িতেই গেলাম। এক দিকের টিকিট নষ্ট হ'ল। দিনের এইট-ডাউন প্যাসেঞ্জার শীতের দিনে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, সেজন্য একা এ গাড়িতে এ ক'দিন চেষ্টা করিনি, যদি শিয়ালদহ গিয়ে পথ না চিনতে পারি। কিন্তু সঙ্গে একজন যাত্রী পাওয়াতে আর কোনো অসুবিধে হল না। এলাম ১৯১১ সালের শেষে। রাজ দর্শন হল ১৯১২ সালের প্রথমে।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। কলকাতা আলোয় আলোময়। চোখে ধাঁধা লাগে। মুকুন্দলাল আমাকে খুব ভাল বাসতেন, তিনি রাজদর্শন করিয়ে দিলেন ময়দানে। পেজেণ্ট শো। তারপর বাজি পোড়ানো। সবই কল্পনাতীত ব্যাপার। বেশ কয়েক দিন কলকাতায় থেকে, ফ্রেমে বাঁধা রাজারাণীর রঙীন ছবি কিনে নিয়ে গেলাম দেশে।

১৯১০ সালের একটি বড় ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। সে হচ্ছে হ্যালির

ধূমকেতু। জীবনের একটি পরম বিস্ময়। চারিদিকে খুব উত্তেজনা। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করত ভয়ানক একটা কিছু হবে। খবরের কাগজে কি লেখে জানবার জন্য ছুটোছুটি করত। প্রথমে শেষ রাত্রের দিকে উঠত, ক্রমে সময়ের বদল হ'তে হ'তে সন্ধ্যা বেলা দেখা যেত। অর্থাৎ দিনের আলো কমে গেলেই আকাশ জোড়া ধূমকেতু কাঁচা সোনার রঙে ফুটে উঠত। শুনতাম ধূমকেতুর ল্যাজ পৃথিবী ছুঁয়ে যাবে। শুনে ভয় হত বেশ। তারপর শুনলাম পৃথিবী তার ল্যাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল, তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি। ধূমকেতুর মাথাটি থাকত দক্ষিণে পদ্মানদীর ওপারে আর পুচ্ছটি ক্রমশ চওড়া হয়ে মধ্য-আকাশও পার হয়ে যেত। প্রতিদিন দেখে দেখে পুরনো হয়ে গিয়েছিল। বেশ মনে আছে রতনদিয়া থেকে এক বন্ধু মজার ভাষায় আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, "এখানে আমর যে ধূমকেতু দেখছি তার দুটো দাঁত, তোমাদের ওখানকার ধূমকেতু ক' দাঁতের ?"

ধূমকেতুর কথায় সগুপঠিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি চিঠির কথা মনে পড়ল। চিঠিখানি ১৩৬৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা কথাসাহিত্যে বেরিয়েছে। চিঠির তারিখ ৩রা আশ্বিন ১৩৪৭ (১৯৪০)। লিখছেন "ধূমকেতু দেখার সুযোগ ঘটেনি। ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু উঠেছিল শুনেছি, সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন খুব ছেলে মানুষ, পাড়াগাঁয়ে থাকি, কেউ দেখায় নি।"

এই চিঠিখানি আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে। কারণ বিভূতিবাবু আমার চেয়ে অন্তত চার বছরের বড় ছিলেন। (দ্বারেশ শর্মাচার্যকে বিশ্বাস করলে আমাদের বয়সের পার্থক্য চার বছরই দাঁড়ায়)। ১৯১০ সালে ওঠা হ্যালির ধূমকেতু এমন বিরাট এবং এমন স্মরণীয় ঘটনা এবং এমন দীর্ঘদিন ব্যাপী 'ইভেণ্ট' যে তা পনেরো ষোল বছরের বালকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। তবু তিনি এ রকম লিখলেন কেন, এটি আমার কাছে একটি রহস্য রয়ে গেল। তাঁর জীবিতকালে হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে কখনো তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি মনে পড়ে না। সে সময় এ কথা জানলে এর একটা মীমাংসা তখনই হয়ে যেত, আজ তো আর কোন উপায়ই নেই।

হাই স্কুলে যে ইংরেজী বই প্রথম পড়েছি তার নাম যতদূর মনে পড়ে

নেলসন্‌স্ ইণ্ডিয়ান রীডার। তাতে দু চার পাতা পরপর একখানা দুখানা রঙীন ছবি ছিল। একটি রেলগাড়ির ছবি, একটি জ্যোৎস্না রাতের ছবি। পড়া ভুলে সেই ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে স্বপ্নজাল বুনতাম।

একটা কবিতার এই টুকু এখনও মনে আছে—

Follow me full of glee
Singing merrily merrily merrily.

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়তে এ দুটি লাইনের উল্লেখ দেখে চমকিত হয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ আরও শিশুকালে পড়েছিলেন, তাই তিনি এর অনেক কথাই ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর যেটুকু মনে ছিল বা ঐ কথাগুলো তাঁর মনে যে রূপ নিয়েছিল তা এই—

"কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং।" তিনি লিখেছেন—"অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি—কিন্তু কলোকী কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজিও ভাবিয়া পাই নাই।"

বিষয়টি আমি এর পর ভুলে গিয়েছিলাম। নইলে তাঁর জীবিতকালে মনে করিয়ে দিতে পারতাম। খুব অল্প দিন হ'ল জীবনস্মৃতির একটি পরবর্তী মুদ্রণ খুলে দেখি 'কলোকী' কলোকীই আছে, 'Follow me'-তে বদল হয়নি।

আর একখানি কল্পনা-উধাওকারী বই আমার হাতে আসে এই সময়। নাম ফিলিপস ইণ্ডিয়ান মডেল অ্যাটলাস। তার একদিকে দেশের সীমানা জ্ঞাপক রঙীন ম্যাপ, তার বিপরীত পৃষ্ঠায় সেই দেশেরই রিলিফ ম্যাপের দুরঙে ছাপা ফোটোগ্রাফ। সমুদ্র অংশ নীল, জমির অংশ সীপিয়া রঙের। এর এক একখানা পাতার মধ্য দিয়ে আমি দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করতাম। সবচেয়ে ভাল লাগত ভারতের উত্তরের অংশটি। তুষার ঢাকা পর্বতচূড়া ও সমস্ত হিমালয়ের উঁচু নিচু জমির যেন সত্য একখানা ফোটোগ্রাফ। কি রহস্যভরা সে ছবি। পাহাড় পর্বত তখন দেখিনি, শুধু সমতল জমি দেখায় অভ্যস্ত চোখে হিমালয়ের কল্পনা খুব ভাল লেগেছিল। বাবার কুমারসম্ভবের কাব্যানুবাদ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে কিছুকাল আগে ছাপা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ছন্দ ও ধ্বনির সৌন্দর্য সম্পর্কে

মনে ধারণা জন্মিয়ে দেবার জন্য তিনি সে অনুবাদ মাঝে মাঝে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়তেন। বিশেষ ক'রে হিমালয়ের বর্ণনা অংশ, যথা—

সিন্দূরে গৈরিকে কিন্নরী-ললনা
বিভ্রম ভূষা করি' বিহরিছে শিখরে—
ধাতু আভা লেগে যবে মেঘে শোভে ছলনা
অকাল সাঁঝের মত পর্বত উপরে।
কটিতটে চলন্ত জলদের নিম্ন,
ভূঙ্গি সানুর ছায়া সিদ্ধেরা সমুদয়
বৃষ্টির জলে পড়ে' হলে পরে খিন্ন
রোদ্দুরে গিরিচূড়ে লভিতেছে আশ্রয়।

ইত্যাদি ছত্রগুলি বার বার শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এর একটা অস্পষ্ট অর্থ মনে জেগে উঠত। এতে হিমালয় সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভীতি ও সম্ভ্রমপূর্ণ আকর্ষণ জেগে উঠেছিল এবং তার বছর দুই পরে তার পরিণাম কি হয়েছিল, তা পরে বলা যাবে। এই অ্যাটলাসে ভূ-গোলকের ৩৬৫ দিনে সূর্য প্রদক্ষিণের একটি সুন্দর রঙীন ছবি ছিল। এ থেকে ঋতু পরিবর্তনের ধারণা হয়েছিল সহজে। ভূগোলের অনেক জানবার জিনিস এই একখানি বই থেকেই খুব অল্প সময়ে জানা হয়ে গিয়েছিল। ছবিগুলো রঙীন ছিল বলেই তার প্রতি এক অদ্ভুত মায়া। রঙের সম্পর্কে আমি প্রায় উন্মাদ ছিলাম। রঙীন ছবির বই ছেলেবেলায় যতগুলো হাতে এসেছিল তা সযত্নে রক্ষা করতাম। বাইবেলের রঙীন ছবির সাহায্যে ইংরেজী অ্যালফাবেটের একখানা খুব বড় আকারের বই ছিল। তার কাগজ খুব মোটা, এবং দুখানা কাগজ দুধারে, মাঝখানে মোটা গজ কাপড় দিয়ে এমন আঁটা যে তা সহজে ছেঁড়া যায় না। সে বইখানাও আমার খুব প্রিয় ছিল। জলছবির আকর্ষণের কথা আগে বলেছি। শেষ পর্যন্ত জলছবি বই-এর মার্জিনে, চেয়ারে, ডেস্কে, দরজায়, চৌকাঠে, জানালায়, আয়নায় এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের হাতে, পায়ে, কপালে, কাপড়ে, জামায়, লাগিয়ে জলছবি পর্বের একটা উপসংহার টেনে দিয়েছিলাম।

রঙের নেশা কিন্তু ওতে কাটেনি। তারই ফলে বহুদিন রঙীন ছবি আঁকা এবং কিছুকাল পরে তা ফেলে (১৯২৯ থেকে) রঙীন ফোটোগ্রাফ তোলার পালা। এ বয়সে সকল রঙ গেরুয়া রঙের তীর্থে এসে উত্তীর্ণ হলেই হয় তো শোভন হত, কেননা সব রঙ কালো হয়ে মিলিয়ে যাবার ধাপ তো প্রায় দেখতে পাচ্ছি।

১৯১০-১১ সাল থেকে রতনদিয়ার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ক্রমে বাড়তে লাগল। সম্ভবত রেল স্টেশন খুব কাছে ব'লেই। এখান থেকে যতদূর ইচ্ছা সহজে যাওয়া যায়, এখানে আর শুধু কল্পনায় ভ্রমণ নয়। এটি আমার কল্পিত আদর্শ জায়গার সঙ্গে অনেকটা মেলে। সাতবেড়েতে পদ্মার পাড়ে ব'সে এখানকার পথে চলা রেলগাড়ির ধোঁয়া দেখে মনে মনে স্বপ্ন রচনা করেছি, এখানে সে স্বপ্ন রূপ ধরেছে। এখানকার মাঠে যেন আরও আত্মীয়তা। আমার মাতামহের প্রভাব এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট, অতএব এখানে আমার নতুন মর্যাদা, এখানে যারা আমার বন্ধু তাদেরই জমি এখানে দিগন্তস্পর্শী। কালুখালি স্টেশনে (তখন প্রায় তিন মাইল দূরে। ১৯১১-এর প্রথমে রতনদিয়ার সীমানায়!) প্রায় প্রতিদিনই যেতাম রতনদিয়াতে থাকতে, সেভেন-আপ গাড়িতে রাজবাড়ি যেতাম, গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রু-ডাউনে ফিরে আসার অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করতে। স্টেশনে যেতে যেতে কিংবা ফিরে আসতে আসতে মেঠো পথের উপর একটা প্রচণ্ড মোহ জন্মে গেল। বলা বাহুল্য একমাত্র শীতকালেই এর আকর্ষণ বেশি ছিল, যদিও বর্ষাতেও দু-একবার গিয়েছি জল ঠেলে। শীতকালের সেই অজস্র কুলের ভারে নুয়ে পড়া ডাল থেকে যথা ইচ্ছা সুস্বাদু কুল পেড়ে খাওয়া, মটরের গাছ থেকে মটর-শুঁটি ছিঁড়ে নেওয়া, এবং সব চেয়ে মধুর, আখের গুড়ের টাটকা-জমা সর খাওয়া। মাঠের এক জায়গায় আখ মাড়াইয়ের এবং জ্বালানোর বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে গেলেই ওটা দক্ষিণা হিসেবে পাওয়া যেত প্রজাদের কাছ থেকে।

দু মাইল দূরে হারোয়া গ্রামে প্রতি শীতকালে বসত মেলা। স্থানীয় জমিদার আলিমুজ্জমান চৌধুরী এম. এল. এ'র জমিতে। মথুর কুণ্ডুর প্রকাণ্ড চালায় প্রকাণ্ড ভিয়েন, বড় বড় কড়ায় রসগোল্লা, পান্তুয়া আর জিলিপি তৈরি হচ্ছে দিনরাত। খদ্দেরের ভিড় সেখানে সবচেয়ে বেশি। টাটকা উপাদানে তৈরি টাটকা খাবার, পাবনা ফরিদপুর অঞ্চলে চির প্রসিদ্ধ। তার স্বাদ

কলকাতায় মিলবে না। ছেলে বয়সের স্বর্গ এই মিষ্টান্নের দোকান। এখানে খাওয়া শেষ ক'রে পুরনো রেল লাইন ধ'রে ঘোরা পথে ফিরে আসার তৃপ্তিকর আস্বাদ, স্মৃতিতে অর্ধ বাস্তব অর্ধ মায়ায় জড়িয়ে আছে আজও।

রতনদিয়ার আরও একটি আকর্ষণ ছিল এখানকার পরিবেশ। সাতবেড়ে গ্রামটি প্রকাণ্ড, বড় এলোমেলো, অধিকাংশ স্থান ঘন জঙ্গলে ভরা। বর্ষায় বড় বড় পথ জলে আর কাদায় দুর্গম হয়ে ওঠে। গ্রামের মধ্যেই ছোট ছোট অনেক খোলা জমি, সেখানে পাট পচানো হয়। রতনদিয়া গ্রাম সে তুলনায় স্বর্গ। এ গ্রামটি ছোট্ট। দক্ষিণে চন্দনা নদী (শুধু বর্ষায় স্রোতস্বতী হয়)। উত্তরে গ্রামের সীমার উপর দিয়ে চলল রেল লাইন ১৯১১ থেকে। গ্রামের দৈর্ঘ্য হাঁটাপথে মিনিট সাতেক, আর প্রস্থ মিনিট পাঁচেক। একটি দ্বীপ যেন। বাছাইকরা লোকেরা এসে যেন একটি গ্রাম গ'ড়ে তুলেছিল পূর্ব পরিকল্পনার সাহায্যে। বৃত্তি হিসেবে এক এক শ্রেণী লোকের বাস এক একটি এলাকায়। সব সাজানো গোছানো। মোট প্রায় পঞ্চাশটি পৃথক বাড়ি। প্রধান দুটি পথের ধারে সম্পন্ন অথবা শিক্ষিত লোকদের বাড়ি। মোট সাতটি বাড়ি পাকা, তার মধ্যে দুটি বাড়ি দোতলা। ১৯৫০ সালের হিসেবে একশ থেকে সওয়া শ বছর গত হ'ল সে সব বাড়ি তৈরি হয়েছে ধরা যায়। ১৯১০ সালেই একটি বাড়ি ভাঙার মুখে। সেটি গোপাল সান্যাল মহাশয়ের বাড়ি। মানময়ী গার্লস স্কুলের লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্রদের পরিবার এঁরই সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

এক একটি বাড়ি সুন্দর সাজানো, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, এবং চারদিক সুন্দরভাবে ঘেরা।

১৯০৯-১০ এর কথা বলছি। রতনদিয়ার ঐশ্বর্যের তখন পূর্ণ অবস্থা। বেহিসেবী উপভোগ তখন উচ্চ মাত্রার শেষ চিহ্নে গিয়ে পৌঁছেছে। কি প্রাণধর্ম, কি উচ্ছলতা, কি বিলাস! একটি বালকের চোখে তা অবশ্যই অভিনব। ভোজন বিলাস ভিন্ন অন্য কোনো বিলাসের মূর্তি এমন প্রত্যক্ষ করিনি এর আগে। এখানে সমস্ত বিলাসই মাত্রার বাইরে। গানবাজনা আরম্ভ হ'ল তো পনেরো বিশ দিন ধ'রে চলল তা। যেখানে যত ওস্তাদের সন্ধান পাওয়া যেত কাছাকাছি, তাদের সবাইকে আনা হ'ত সে আসরে।

উচ্চশিক্ষিতেরা বিদেশে থাকতেন, ছুটিছাটা উপলক্ষে কদাচিৎ আসতেন। অনেকেরই গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে আন্তরিক মিল ছিল না, আদর্শের সংঘাত অনিবার্য। একমাত্র ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য (রাজবাড়ি রাজা সূর্যকুমার ইনস্‌টিটিউশনের হেডমাস্টার) সহজ মানুষ, তিনি স্বতন্ত্র থেকেও সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতেন। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন। অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় (এস-ডি-ও) স্থায়ীভাবে গ্রাম ছেড়েছিলেন, ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (ত্রিপুরা স্টেটের ম্যানেজার) কদাচিৎ আসতেন।

যারা গ্রামে থাকতেন তাঁরা সম্পূর্ণ আর এক জাত। এঁদের মধ্যে আমার মাতামহ যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও তাঁর অনুজ ললিতচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন সর্ব বিষয়ে নেতা—অন্তত সে সময়ে তো বটেই। এ কথা বলছি কারণ তাঁদের এবং গ্রামের আর সবার অধঃপতন তার পর থেকেই শুরু। ১৯১০-১১ থেকেই সমৃদ্ধির শেষ সীমা পার হয়ে যাচ্ছিল সেটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

যোগেশচন্দ্র ললিতচন্দ্র—এঁরা বংশগত ভাবে গুরুগিরি করতেন। গ্রামের প্রধানেরা কয়েকজন এঁরা শিষ্য ছিলেন, দেশ বিদেশে অনেক বড় বড় শিষ্য ছিলেন এঁদের। রাজসাহীর সুবিখ্যাত দানবীর জমিদার কিশোরীমোহন চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। এঁদের ঐশ্বর্য কি ভাবে উপার্জিত জানি না, রুচি এবং সৌন্দর্য-বোধ কোথেকে এলো তাও জানি না, কিন্তু যা দেখেছি তাতে বিস্ময় বোধ করেছি।

মামাদের বাড়িটি তিন-চার বিঘে জমির উপর। এমন সুন্দর সাজানো বাড়ি ওখানে আর ছিল না। বহিরঙ্গনের উঠানটি একটি 'লন'। তার উত্তরে মণ্ডপ ঘর। সেখানে কালীপূজো হত এবং দোলের সময় গৃহ দেবতা গোপালকে চতুর্দোলায় শোভাযাত্রা করিয়ে ঐখানে এনে বসানো হত।

লন-এর পশ্চিম দিকের ঘর হচ্ছে বৈঠকখানা। তার উত্তর দিকের কুঠুরীটি অস্ত্রাগার। সেখানে নানা জাতীয় খড়্গ—ছোট বড় মাঝারি, শড়কি বল্লম তলোয়ার ছোরা প্রভৃতি। খড়্গ বা লম্বা দা—যার নাম রামদা—তার প্রত্যেকটির উপরে নক্সা খোদাই করা। দুদিকে দুটি চোখও আছে, কোনোটার চোখ আবার মিনে করা। এই অস্ত্রের কতকগুলি পশুবলিতে ব্যবহার্য, আর কতক-গুলি শৌখিন। হাড়ের বা শিঙের হাতল। বল্লম শড়কি প্রভৃতি শিকারের

জন্য। এ অঞ্চলে যে অভিনব বাঘশিকার দেখেছি, তা পৃথক ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বড় মণ্ডপ ঘরের পাশে পূব দিকে পৃথক ঘর, তাতে বিরাট নিকষকালো শিব-লিঙ্গ। পূব দিকের আর একটি বড় ঘর কাঠ কয়লা ইত্যাদি রাখবার। দক্ষিণ দিকে বাগানের জমির সঙ্গে দেউড়ি, তার মাঝ খান দিয়ে পথ। তার এক অংশে জোড়া তক্তাপোষে ফরাস পাতা, দু পাশে চওড়া বেঞ্চি। এখানে প্রবীণদের পাশাখেলা হ'ত প্রতিদিন, কখনো গানবাজনা। এর বিপরীত অংশে তামাকের সরঞ্জাম। চাকরেরা সেখানে কাঠের উপর তামাকপাতা রেখে দা দিয়ে কাটছে, আর একজন তাতে চিটে গুড় মাখিয়ে চটের উপর ক্রমাগত ড'লে ড'লে কলকেয় চাপানোর উপযোগী ক'রে তৈরি করছে। পরিমাণে বেশি হ'লে বড় কাঠের হামামদিস্তে ব্যবহার করা হ'ত।

বৈঠকখানা ঘরে প্রকাণ্ড ফরাস। দেয়ালের ধারে ধারে নানা বাদ্যযন্ত্র সাজানো। গোটা দুই বেহালার বাক্স, তবলা, ঢোলক, পাখোয়াজ, তানপুরা, সেতার, করতাল এবং খোল দেয়ালে সেকেলে লিথোয় ছাপা একরঙা বা রঙীন ছবি। একটি ছবি বেশ মনে পড়ে, আয়নার ধারে একটি বৌ ব'সে চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে। নিচে নাম ছাপা আছে বিনোদিনী। প্রত্যেক ছোট ছবির মাঝখানে একটি ক'রে কাঠের মাউন্ট করা শিঙসমেত হরিণের মাথার খুলি। প্রবেশ দ্বারে মোষের শিঙ। ঘরের মাঝখানে মাথার উপর প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন, তা থেকে চক্রাকারে কত তেপাশা কাঁচ ঝুলছে। ছোটবেলায় তা থেকে দু একটা খুলে নিয়ে তাতে চোখ লাগিয়ে 'রামধনু' দেখেছি লুকিয়ে লুকিয়ে। বাইরের প্রশস্ত দালানে চারটি নক্সা আঁকা বড় বড় মোটা কাঁচের আবরণে ঘেরা দীপাধার, ছাত থেকে শিকলে ঝুলছে। দালানে সারি সারি সাজানো চেয়ার বেঞ্চি। যেখানে সেখানে রূপো বাঁধানো হুঁকো রাখবার ধাতুনির্মিত জোড়া পরী, দুহাতে দুটি পাত্র ধ'রে আছে।

লন্ এ প্রত্যেকটি ঘরের সামনে চারটি থেকে আটটি ঝাঁকড়া পাতাবাহারের গাছ। কোনোটি লম্বা পাতা লাল ছিট, কোনটি বেঁটে পাতা হলদে ছিট দেওয়া। ললিতচন্দ্র নিজ হাতে এ সব গাছ ছেঁটে দিতেন। ঘাস একটি বড় হ'লে ছেঁটে সমান ক'রে দিতেন, সমস্ত লন্ এবং ফুলের বাগান নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন। একটি কুটো পড়বার উপায় ছিল না সেখানে। অস্ত্রাগারও তাঁর নিজস্ব এলাকা,

অন্যের প্রবেশ নিষেধ। প্রতিমাসে সেগুলো বা'র ক'রে নিজ হাতে ঘ'সে মেজে তাতে নারকল তেল মাখিয়ে রাখতেন। ঘরে খাটের স্থান বদল হ'ত মাসে দুবার ক'রে। কোনো বদলই মনের মত হত না।

বাড়ির উত্তরের বাগানে তেজপাতার গাছ, দারুচিনির গাছ সপেটার গাছ— গ্রামে দুর্লভ-দর্শন এ সবই, দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা।

কালীপূজো হ'ত কোনো উপলক্ষে, নিয়মিত নয়। যাবতীয় শাক্ত আচার। প্রচুর পশুবলি—মাংস ও খাদ্যের ছড়াছড়ি। ললিতচন্দ্র মাঝে মাঝে কাঁচা রক্ত পান করতেন, তিনি অন্য পানীয় স্পর্শ করতেন না। অন্যটি ছিল জ্যেষ্ঠের অধিকারে।

শিবপূজো করতেন যোগেশচন্দ্রের মা ও ভগ্নী অন্দরে গৃহ দেবতা কালো পাথরের গোপাল, নাড়ু হাতে। রূপোর চোখ। আর কয়েকটি শালগ্রাম শিলা। এগুলি একসঙ্গে রোজ পূজো হ'ত। যোগেশচন্দ্র ললিতচন্দ্র দু জনেই পূজো করতেন পালা ক'রে। একই সঙ্গে শৈব শাক্ত এবং বৈষ্ণব রীতি। রতনদিয়াতে থাকলে ভোরে উঠে ফুল তুলে দিতাম। সে ফুলের গন্ধের স্মৃতিতে আজও গোলাপ-গন্ধরাজ-বেলী-যূঁই আমার বিশেষ প্রিয়।

এই ভট্টাচার্য বাড়ি ছিল সবার "ঠাকুর বাড়ি"; ওঁরা সবারই ঠাকুর মশায়। আমিও ঐ দলে পড়েছিলাম। জবরদস্ত ছিলেন তাঁরা। ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং ললিতচন্দ্র এ ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, দেখেছি। বাড়ির সীমানা দিয়ে অন্য কারো পাল্কীতে যাবার উপায় ছিল না। একবার দেখেছি পাল্কী-যাত্রীকে চ্যালেঞ্জ ক'রে নামিয়ে দেওয়া হ'ল, তিনি হেঁটে গেলেন অবশেষে, এবং বাড়ির সীমানা পার হয়ে তবে পাল্কীতে উঠতে পারলেন। বাড়ির সীমানার সঙ্গে যুক্ত পথে অপিরিচিত কেউ গেলে "কে যায়?" চ্যালেঞ্জ করা হত, এবং তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে যেতে হ'ত। কেউ চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিলে ললিতচন্দ্র অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসতেন। যোগেশচন্দ্র ছিলেন বিপরীত। উৎসবে উদার হয়ে পড়তেন। একবার দেখলাম ঢোল বাজনায় বিগলিত হয়ে বাদককে খুব দামী এক জোড়া শাল বখশিস দিলেন। ভট্টাচার্য বাড়ির বোধ হয় সেটি শেষ শাল জোড়া।

পতনের ঠিক আগের অবস্থা।

প্রথম পর্ব

তৃতীয় চিত্র

রতনদিয়ার অখ্যাত পল্লীজীবনে ইংরেজী প্রভাবই স্পষ্ট, অথচ মজা এই যে, যাঁদের মধ্যে এ প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রকট, তাঁরা ইংরেজী জানতেন না আদৌ। তাঁদের বাড়িঘরের চেহারায়, চালচলনে, অনেকখানি আধুনিক ছাপ। এটি কি ক'রে সম্ভব হ'ল তা আমি জানি না। যাঁরা যথার্থ ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন শুদ্ধাচারী।

গানবাজনার পরিবেশটি ছিল অদ্ভুত। নদীয়া জেলার এক সানাইবাদক, আকবর আলী সেখ, মাঝে মাঝে সানাই বাজাতে আসত, কিছুদিন পর থেকে সে গ্রামের আসবে রয়ে গেল, তাকে আর ছাড়া হ'ল না। সে প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর ওখানে বাস ক'রে গেল। কণ্ঠসঙ্গীতেও সে ওস্তাদ ছিল. সব আসরে তাকে দেখা যেত, সে না থাকলে আসর জমত না। আত্মসুখী লোক, খুব হাসিখুশি ভাব।

ক্রমে বংশানুক্রমিকভাবে যারা ঢাক ঢোল বাজাত, তবলা বাজাতেও তাদেরই ডাক পড়ত। ঢোল ও তবলা দুইই সমান চলত তাদের হাতে।

বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য (বেণীঠাকুর নামে পরিচিত) খুব তবলা-উৎসাহী ছিলেন। তিনি পাণিনি পড়ার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থকাম হয়ে তবলা ধরেছিলেন। আমি শিশুকাল থেকে প্রায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত তাঁকে তবলা অভ্যাস করতে দেখেছি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এ অভ্যাস চালিয়ে গেছেন। শেষ রাত্রে উঠতেন এবং তবলার বোল মুখে উচ্চারণ করতে করতে বাজাতেন। নিস্তব্ধ ঘুমন্ত গ্রামের প্রান্ত থেকেও তা শোনা যেত। তাঁর হাতে তবলা ফেঁসে যেত মাসে অন্তত দুবার।

কোনো আসর বসলেই তিনি আগে এসে তবলা দখল ক'রে বসতেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গায়কের গান থেমে যেত, তিনি সবার গাল খেতেন, কিন্তু দমতেন না সহজে। অনেক সময় তাঁকে জোর ক'রে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাড়িতে তিনি অনেক টাকা খরচ ক'রে একখানা করুগেট টিনের ঘর তৈরি করিয়েছিলেন। ঘরখানা যাতে খুব মজবুত হয়, ঝড়ে ওড়াতে না পারে, সেজন্য আস্ত শালকাঠের খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছিল। বড় বড় গাছের আড়ালে ঘরখানা স্বাভাবিকভাবেই নিরাপদ ছিল, তদুপরি শালকাঠের খুঁটি, ঝড়ের সাধ্য কি তাকে নড়ায়। বহু অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ ছিল এ ঘর তৈরির পিছনে।

এই ঘর ছিল গানের একটি বড় আসর। প্রবীণদের পরবর্তী ধাপের গুণীদের এটি পীঠস্থান ছিল। এইখানেই বেণীঠাকুরের তবলা সাধনা চলত। গানের পুরো আসর চলছে এমন সময় হয়তো পশ্চিম আকাশে দেখা দিল কালবোশেখীর মেঘ। ঝড়ের সঙ্কেত। বেণীঠাকুরের তবলায় ভুল তাল বাজতে লাগল, তিনি তবলা ছেড়ে মুহুর্মুহু আকাশের দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর আসন্ন ঝড়ের প্রথম শব্দে, সব ফেলে, ঝড়ের বেগে ছুটে চললেন কিছু দূরে অবস্থিত বরদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাকাবাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সেখানেই কি সম্পূর্ণ ভরসা আছে? যদি সেই একতলা বাড়ি ভেঙে পড়ে? তাই তিনি বরদানন্দকে বলেছিলেন, হলঘরে গোটাকত শালকাঠের থাম লাগিয়ে নিলে কেমন হয়?

অরবিন্দ ঘোষ এলেন চার মাইল দূরে পাংশাতে। জায়গাটি রতনদিয়া থেকে পাঁচ ছ মাইল দূরে, পুরনো কালুখালি স্টেশন থেকে চার মাইল। কোন্ বছর ঠিক মনে পড়ছে না। আমি আর এক উৎসাহী বন্ধু, হরেন্দ্রকুমার রায়, সকালের এইট-ডাউন প্যাসেঞ্জারে সেখানে গিয়ে হাজির। অরবিন্দ ঘোষ তখন খুব বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন, বালকমনে সে নামে এক অদ্ভুত বিস্ময়। শুধু তাঁকে দেখতে ছুটে যাওয়া।

পাংশা স্টেশনের আশ্রয়ে গিয়ে ব'সে আছি। এরই কয়েক মাইল দূরে দু তিন বছর আগে এক অতি ভয়াবহ কলিশন ঘটেছিল, পূজোর ছুটির যাত্রীবাহী ট্রেনের। দুই গাড়ির এঞ্জিনে এঞ্জিনে সামনাসামনি ধাক্কা লেগেছিল। মনে পড়ে খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা হয়েছিল। লাইন ব্লকে ছাপা ছবি। তখন প্রেস ফোটোগ্রাফি ছিল না, খবরের কাগজে হাফটোন ব্লক ছাপা হ'ত না। দুই এঞ্জিন খাড়া হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট মনে আছে। কত গুজব যে রটেছিল। সত্য মিথ্যা জানি না, শুনেছিলাম মরা আধমরা শত শত যাত্রীকে

মালগাড়ি বোঝাই ক'রে গোয়ালন্দ ঘাটে নিয়ে গাড়িসুদ্ধ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাংশার পরবর্তী স্টেশন মাছপাড়া। এই দুইয়ের মাঝখানে ঘটেছিল এই দুর্ঘটনা।

স্টেশনে ব'সে আছি, কোথায় অরবিন্দ ঘোষ, কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে ভাবছি, এমন সময় বিরাট এক স্বদেশী সংকীর্তন দল সে পথে এলো গান গাইতে গাইতে। আমরা সেই দলে মিশে গেলাম। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রইল অরবিন্দ ঘোষকে খুঁজে বা'র করা। এই কীর্তন দলের কোন্ জন অরবিন্দ ঘোষ দুজনে অনুমান করতে লাগলাম। শেষে দুজনে একমত হয়ে এক ব্যক্তির উপর লক্ষ্য রাখলাম। পাছে আমাদের বোকা মনে করে, সেজন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

বিকেলে সভা। সভার বিজ্ঞপ্তি বিলি হয়েছিল, তাতে দেখলাম পাংশা স্বদেশ বান্ধব সমিতিতে অরবিন্দ ঘোষ বক্তৃতা দেবেন। বিকেলে সভাস্থলে গেলাম। অরবিন্দ ঘোষকে দেখলাম। গলায় পদ্মফুলের মালা। হাল্কা চেহারা। তবে কীর্তনের তিনি নন। আরও একটি নাম ও বাবড়িচুলযুক্ত চেহারা মনে পড়ে—গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। খুব জোর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু কারো বক্তব্যই কানে যায় নি, আমরা শুধু চোখের খুশিতেই খুশি।

১৯১১-১২ থেকে রতনদিয়াতে আসা আরও একটু বেশি হ'তে লাগল। স্কুলে বছরে তিন মাসের বেশি কখনো থাকি নি। তার একটি কারণ ছিল ম্যালেরিয়া। এ সময় ম্যালেরিয়ায় পুনঃপুনঃ ভুগছিলাম। সামান্য জ্বর হলেই ভাত বন্ধ হত। দুধ খাওয়া ভয়ানক অপরাধ ছিল, ওতে নিউমোনিয়া হয়। জ্বরের তাপ ১০৫ ডিগ্রী হ'লেও মাথায় জল দেওয়া নিষেধ ছিল। এ সব কারণে ম্যালেরিয়া হ'লে খাওয়ার দিকে লোভ খুব বেড়ে যেত। ভাত না খেয়ে, দুধ না খেয়ে, দুর্বল হয়ে পড়তে হ'ত খুব। অতএব এ ব্যাধিটি বালকের পক্ষে সুখের ছিল না আদৌ। একবার ম্যালেরিয়ায় মাসখানেক ভুগলাম, আর শুয়ে শুয়ে ভাত খাওয়া সুখী লোকদের কথা কল্পনা করতে লাগলাম। নিজের উপর ভীষণ রাগ হ'ত।

আমার জ্যাঠতুত ভাই নলিনী কলকাতায় প্রায় আসতেন। তিনি একবার কলকাতা থেকে রতনদিয়া ফিরে গিয়ে আমাকে একটি উত্তেজনাপূর্ণ খবর দিলেন—কলকাতায় ম্যালেরিয়ার এক ওষুধ বেরিয়েছে তাতে পথ্যের কোনো

বিচার নেই, যা ইচ্ছে খাওয়া যায়। সে ওষুধের এইটিই প্রধান আকর্ষণ। শুনে আনন্দে রোগশয্যা থেকে লাফিয়ে উঠলাম, এবং ঠিকানা নিয়ে, ১০০ ডিগ্রী জ্বর গায়ে, পরদিনই এক রিটার্ন টিকিট কেটে কলকাতা রওনা হয়ে গেলাম। যতদূর মনে পড়ে ওষুধের নাম জার্মলীন।

ওষুধ কেনা বাবদ কিছু টাকা, এবং উদ্বৃত্ত গোটাপাঁচেক টাকা সঙ্গে রইল টিকিট কেনার পর। এসেই ওষুধ নিয়ে ফিরে যাব। কলকাতার পথ তখন আমার চেনা। (টাইম টেবলের সঙ্গে কলকাতার ম্যাপ থাকত, তা দেখে বড় বড় সমস্ত পথ চিনে ফেলেছিলাম।) ওষুধ খেলে সব খাওয়া যায়, বিধিনিষেধ কিছুই নেই, যত ভাবছি তত উৎফুল্ল হচ্ছি, ট্রেনের মধ্যে সময় যেন আর কাটে না। তবু কোনোমতে রসনা সংযত করলাম। শেষে শিয়ালদহ পৌঁছে আর থাকতে পারলাম না—সোজা ওষুধের দোকানে না গিয়ে মির্জাপুর স্ট্রীটের এক খাবারের দোকানে উঠে আগে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিলাম। এবারেও হ্যারিসন রোডের দিকে ওঠা হল না। বেঞ্চে উঠলাম। পরদিন সকালে উঠে সন্দেশ দিয়ে শুরু ক'রে বিকেল পর্যন্ত ডিমভাজা, লুচি, রাবড়ি, রসগোল্লায় শেষ। ওষুধ খেলে তো এ সব খাওয়া যাবেই, তবে আর চিন্তা কি, সামান্য একটু আগে-পরের ব্যাপার মাত্র।

সে দিনও ওষুধ কেনা হল না, পরদিনও না, তার পরের দিনও না। ওষুধ অপেক্ষা করতে পারে, খাওয়া পারে না। এতদিনের রুদ্ধ বাসনা মিটিয়ে নিলাম মনের সাধে। তারপর ওষুধ কেনার পালা। কিন্তু তখন আর তার দরকার ছিল না, পয়সাও ছিল না। জ্বরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম শূন্য হাতে, এবং ফিরে আসার পর জ্বর আপনা থেকেই সেরে গেল সেবারের মতো।

এর কিছুদিনের মধ্যেই রতনদিয়া গ্রামের শিকারীদের মারা একটি বাঘ দেখলাম। সেটি টাইগার, ডোরাকাটা; চার পা বাঁধা, একটা লম্বা বাঁশের সঙ্গে ঘাড়ে ঝুলিয়ে আনা হল গ্রামে। বহু লোকের ভিড় জমল সে বাঘ দেখতে। এখানে বাঘ মারা হ'ত এক অভিনব নিষ্ঠুর উপায়ে। গ্রামের বাইরে অন্যান্য যে সব গ্রাম আছে তার অধিকাংশই ঘন জঙ্গলে ভরা। বাঘের দৌরাত্ম্যের খবর শীতকালে প্রায় পাওয়া যেত।

এই রকম বাঘের খবর এলে রতনদিয়ার শিকারীদের পরিচালনায় নানা

গ্রামের শিকারী সেখানে গিয়ে সন্দেহজনক স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে বাঘের অবস্থান জায়গাটি আবিষ্কার করত এবং বহু লোকের সতর্ক পাহারায় দড়ির জাল দিয়ে তার চার দিক বেষ্টন ক'রে ফেলত। খণ্ড খণ্ড জাল বহু লোকে বহন করত। ঘেরা সম্পূর্ণ হ'লে ঘেরা জায়গার আয়তন ক্রমে ছোট ক'রে আনা হ'ত চারদিকের জঙ্গল কেটে কেটে। জালের ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে জঙ্গল কাটতে থাকলেই জালের ঘের ক্রমে কমে আসত। বাঘ শড়কির খোঁচার দূরত্বের মধ্যে আসা চাই, নইলে শিকার ব্যর্থ। জাল ঘেরার কাজটি খুব কঠিন। সমস্ত দিন লাগত। তারপর সমস্ত রাত আগুন জেলে হল্লা ক'রে পাহারা দেওয়া হ'ত। পরদিন সকাল থেকে মারার আয়োজন।

কি ক'রে বাঘ মারা হয় তা দেখার সুযোগ পাওয়া গেল অল্প দিনের মধ্যেই। চন্দনা নদীর ওপারে মোহনপুর গ্রামে একটি চিতাবাঘ ঘেরা হয়েছে, এবং সকালে মারা হবে শুনে দলে দলে লোক যাচ্ছে দেখতে, আমিও সে দলে যোগ দিলাম। বাঁশের সাঁকোর পারে মাইলখানেক হাঁটলেই সেই গ্রাম।

গিয়ে দেখলাম দড়ির জালে ঘেরা জঙ্গল। বেশ উঁচু, বাঘ তা ডিঙিয়ে যেতে পারে না হঠাৎ। আমি যখন গেলাম তখন দেখি বাঘকে কেন্দ্র ক'রে জঙ্গলে যে বৃত্তটি ঘেরা হয়েছে তার ব্যাস যথেষ্ট দীর্ঘ, তাকে আরও খাটো না করলে হবে না। তাই জালের ভিতর হাত ঢুকিয়ে চার দিক থেকে তখন জঙ্গল কাটা হচ্ছিল। আমাদের দাঁড়াবার জায়গায় কিছু পূর্বেই অনেক গাছ ছিল, তার খোঁচা খোঁচা গুঁড়িগুলি অবশিষ্ট আছে, সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

ঘেরা বৃত্তটির ব্যাস ২৫-৩০ হাতের বেশি না হলেই ভাল। জালের ফাঁদে ফেলা বাঘকে বন্দুক দিয়ে মারা নিষেধ। নিয়ম হচ্ছে বাঘকে ঢিল মেরে বা খুঁচিয়ে উত্তেজিত ক'রে তুলতে হবে। তারপর বাঘ ছুটে আসবে আক্রমণ করতে, কিন্তু লাফিয়ে পড়বে দড়ির জালে, আর ঠিক সেই সময় শড়কি দিয়ে খোঁচা মারতে হবে। খোঁচা খেয়ে বাঘ বিপরীত দিকে ছুটে যাবে, কিন্তু সেখানেও শিকারীরা হাজির। সেখান থেকে খোঁচা খেয়ে গর্জন করতে করতে আর এক দিকে যাবে, আবার সেখানে খোঁচা খাবে। এইভাবে বহু শিকারী একসঙ্গে হল্লা করতে করতে বাঘকে একটু একটু

ক'রে কাবু করতে থাকবে। কারো শড়কির কোনো একটি আঘাতে বাঘকে ধরাশায়ী করা নিষেধ, তা হলে সেটা হবে শিকার আইনের বিরুদ্ধাচরণ. সব শিকারী যাতে অন্তত একটি ক'রে খোঁচা মারতে পারে এই হচ্ছে আইন। খোঁচার এই নিষ্ঠুর সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থাটি সবাইকে মানতে হয়। এটি কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূত্র ধ'রে অথবা কোন অতিসভ্য যুগের বিলাসিতার অঙ্গ রূপে, চলে আসছে তা ভেবে পাওয়া যায় না।

যাই হোক, মোহনপুরের সেই জাল ঘেরা বাঘের হত্যা-দৃশ্যে আমার উপস্থিতিটি সে দিন আমার নিজেরই কাছে বিস্ময়কর বোধ হচ্ছিল। তার কারণ কোনো জিনিষের পরিণাম দর্শন যে বয়সে সম্ভব নয়, সেই বয়সে আমি সে দিন কিঞ্চিৎ পরিণাম চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলাম। শিকারীদের উপর ভরসা করার মতো মনের অবস্থা নয়, বাঘের আচার ব্যবহার সম্পর্কেও কোন জ্ঞান নেই, এমন অবস্থায় দড়ির জালে ঘেরা এক অদৃশ্য হিংসার আক্রমণ-সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব পুলক অনুভব করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যখন দেখি বেণীঠাকুর সেখানে এসেছেন তখন মনের জোর ফিরে এলো অনেক খানি। তখন এই কথাটাই মনে এলো যে তা হ'লে সম্ভবত ভয়ের কিছু নেই।

অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে, দড়ির জালের বাইরে থেকে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে জঙ্গল কাটা দেখছিলাম। এক সাহসী ছেলে কিছু দূরে একটা গাছের উপরে উঠে বসেছে। সে গাছটি বেষ্টনীর ভিতরে অবস্থিত। সে নিরাপদ উচ্চতায় নিশ্চিন্ত ছিল।

বেলা তখন সাড়ে আটটা বা ন'টা হবে। এমন সময় অতর্কিতে শত শত দর্শক একসঙ্গে 'বাঘ!' ব'লে চিৎকার ক'রে ছুটতে লাগল ডান ধার থেকে বাঁ ধারে। আমি পড়ে গেলাম সেই দিশাহারা ছুটন্ত লোকের গতি পথে। ঘটা ক'রে পড়েও গেলাম এক ধাক্কায়। অতগুলো ভয়ার্ত লোকের উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার চাপটা খুব সহজ ছিল না। তবু তাদের সমস্ত আতঙ্ক আমার মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াতে আমিও মুহূর্তে বিদ্যুৎ শক্তি লাভ করলাম এবং এক লাফে উঠে তাদের সঙ্গে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু তখন কি করছি কোনো খেয়াল ছিল না। প'ড়ে গিয়ে কাটা-গাছের কাঁটা-প্রায় উদ্ধত সব গুঁড়িতে পিঠ যথেষ্ট ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল, কিন্তু কে কার পিঠ নিয়ে

তখন মাথা ঘামায়? মুহূর্তে কি যে ঘটে গেল তা চিন্তা করার উপায় ছিল না।

যখন সম্বিত ফিরে এলো, তখন দেখি আরও অনেকের সঙ্গে আমিও উঠে এসেছি নিকটস্থ এক গৃহস্থের একটি ঘরে। তখন নিশ্চিত বুঝতে পারলাম, ছুটন্ত লোকের ধাক্কায় চিৎ হয়ে প'ড়ে যাওয়াকেই আমি শেষ সিদ্ধান্ত ব'লে মেনে নিই নি, মনের অবচেতন স্তরে উত্থানের সম্ভাবনাটাও থেকে গিয়েছিল।

এখানে দাঁড়িয়ে দেহের কম্পন কিছু কম পড়ার পর শোনা গেল চিতা বাঘটি গাছের ডালে-বসা ছেলেটিকে লক্ষ্য করে উচ্চ লাফের এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল যা দর্শকেরা মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী চিতা বাঘের কাছ থেকে আদৌ আশা করে নি, তাই এই কাণ্ড। অবশ্য এ খবরটাও সত্য কিনা তাও বলা যায় না। মানুষ নিজের ভীরুতা ঢাকার জন্য প্রতিপক্ষের শক্তিতে অলৌকিকত্ব আরোপ করে থাকে। সম্ভবত ভয়েই এখানকার দর্শকেরা সামান্য একটি চিত্রক-দর্শনে এ রকম বিচিত্র ব্যবহার করেছিল।

কিন্তু বাঘটা জাল ডিঙিয়ে বাইরে এসেছে কি না তা কেউ বলতে পারল না, কারণ কোনো দর্শকই কোনো খবর ঠিক জানে না, জানবার আর উপায়ও নেই তখন। কারণ আমরা তখন মিনিট পাঁচেক দৌড় পথের দূরত্বে, এবং সেখানে ফিরে যেতে তখন কেউ রাজি নয়। অতএব অনিশ্চিত খবরে আমাদের মধ্যে ভয় আরও বেড়ে গেল।

দেখলাম প্রায় পঞ্চাশ জন দর্শক সেই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা কজন আছি একটি ঢেঁকি শালায়। খড়ের ঘর, বাঁশের খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘরের দরজা নেই।

এই প্রসঙ্গে আর এক বীরের কথা না বললে বর্ণনা বৃথা হয়। সে ললিতচন্দ্রের পুত্র, নাম প্রদ্যোতকুমার। এ রকম ক্ষীণজীবী যে মনে হয় হাওয়ায় উড়ে যাবে। দেহ লম্বা এবং হাল্কা। এই বালকের সাহস ছিল দুর্দমনীয় এবং গলার আওয়াজ আর সবাইকে ছাপিয়ে যেত। সমস্ত দুঃসাহসিক কাজে তার অগ্রাধিকার। সব কাজে সে এগিয়ে আসবে সবার আগে এবং কি করলে সে কাজ সব চেয়ে সহজ হবে তার পরিকল্পনা তার মুখ থেকে খইয়ের মতো ফুটে বেরোত।

দুনিয়ার আর কেউ কিছু জানে না, সে সব জানে, এ কথা সে নিজে

বিশ্বাস করত। শিকারের খবর পেলেই সে গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ। তাকে সর্বদা দেখা যেত শিকারীদের সঙ্গে।

মোহনপুরের শিকারের স্থানে সে আগেই এসে পৌছেছিল এবং যখন 'বাঘ!' ব'লে ভয়ার্ত চিৎকারের সঙ্গে সবাই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটে পালিয়েছিল তার মধ্যে তাকে দেখা যায় নি, এমনি ছিল তার সাহস।

সাহস ছিল বেশি, শুধু দেহটি উপযুক্ত হ'লে শিকারীদের উপর সর্দারি না ক'রে সে নিজেই শিকারী হ'তে পারত।

কিন্তু এই ক্ষোভ সে মিটিয়েছিল অন্যভাবে। নানাস্থানে অন্যান্যদের সঙ্গে বাঘ শিকারে উপস্থিত থেকে সে এটি অন্তত বুঝেছিল যে আর যাতেই হোক শুধু বক্তৃতা দিয়ে বাঘ শিকার করা যায় না। ভিতরে অদম্য তেজ, বাইরে শক্তির অভাব। সম্ভবত এই কারণেই সে গোপনে গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের দলে মিশেছিল।

এ খবর আমাদের কারো জানা ছিল না। জানলাম অনেকদিন পরে। কালুখালি স্টেশনের কাছে চব্বিশ বছর আগে (১৯৩৩?) লাট সাহেবের (অ্যাণ্ডারসন) গাড়ির নিচে যে প্রচণ্ড বিস্ফোর ঘটে, তার মূলে এই প্রদ্যোৎকুমার। সে নিজ হাতে সিগন্যালের কাছে রেল লাইনে মারাত্মক বোমা পেতে এসেছিল। ধরা প'ড়ে গিয়েছিল অবশ্য। জেল খেটেছিল চার বছরের বেশি।

মোহনপুরের বাঘ শিকারের সময় তার বয়স দশ বছরের বেশি নয়, কিন্তু গর্জনে তখনই সে বাঘের সমান যায়। আমাদের পালিয়ে আসার পর সে এসে আমাদের সাহস দিতে লাগল।

এমন সময় আর একজন পলাতক দর্শক এসে যখন খবর দিল বাঘ বেরিয়ে এসেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তখন কানের কাছে এক আশ্চর্য ধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম। দেখি চাপা ও কাঁপা কান্নার সুরে কে আমাদের মাথার উপর থেকে আবৃত্তি করছে—হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান! চেয়ে দেখি বেণীঠাকুর।

তিনি সবার আগে ছুটে এসে সেই তখন থেকে এই ঘরের একটি বাঁশের আড়ের উপর বসে আছেন।

অনেক পরে জানা গেল বাঘ বেরিয়ে যায় নি। যে ছেলেটি গাছের

ডালে ব'সে ছিল বাঘ তার দিকে লাফিয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু যাত্রাগানের দর্শক বাঘ শিকারের দর্শক হ'তে গেলে অনর্থ ঘটা স্বাভাবিক। যাই হোক, আমরা নিশ্চিন্ত মনে ওখান থেকেই আর এক পথে বাড়ির দিকে রওনা হলাম, বাঘ মারা দেখার আর সাহস হল না। চিতা বাঘটিকে দুপুর বেলা মারা হয়েছিল

রতনদিয়াতে প্রায় প্রতিদিন গানের আসর বসত। আসরের তিনটি জায়গা ছিল। একটি যোগেশচন্দ্রর বাড়িতে, একটি বেণীঠাকুরের বাড়িতে আর একটি গিরিজাকুমার রায়ের বাড়িতে। তখনকার-আধুনিক রজনীকান্ত সেনের "ঐ বধির যবনিকা তুলিয়ে মোরে প্রভু" গানটি বহুবার শুনেছি বীরেন্দ্র মজুমদারের মুখে। তিনি সতেরো থেকে এসে গানের আসরে দুচার সপ্তাহ কাটিয়ে যেতেন গানের পরিবেশ ভালই লাগত, অকারণ এক কোণে ব'সে থাকতাম বেণীঠাকুরের তবলা চর্চার উন্নতি হবে মনে ক'রে বেণীঠাকুরের কয়েকজন শুভার্থী আমাকে হারমোনিয়াম বাজনা শেখাতে লাগলেন এবং হাত কিছু উন্নত হ'লে দুতিনটি গৎ শেখালেন। প্রথমত গানের সঙ্গে হাতে মাত্রা তাল প্রভৃতি ভাগ বোঝালেন, তারপর হারমোনিয়ামে। শেষে যখন দেখলেন দুতিনটি গৎ আমার বেশ শেখা হয়ে গেছে তখন বেণীঠাকুরকে আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল তাঁর ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য আমার বাজনার সঙ্গে তিনি তবলা চর্চা করতেন। কিন্তু আমি ও বেণীঠাকুর ভিন্ন আর সবাই জানতেন তাঁর শিক্ষা আরম্ভেই শেষ হয়ে গেছে, তার আর কোনো বিবর্তন আশা নেই। মাঝখানে আমার যেটুকু দুর্ভোগ ছিল তা ভুগলাম। অবশ্য এ পথে আমারও কোনো বিবর্তন ছিল না।

আরও কয়েক বছর পরের ঘটনা হলেও এখানে উল্লেখ ক'রে গানের আসরের কথা শেষ করি। বরিশালের এক ওস্তাদ গায়ক কাছাকাছি কোথায়ও এসেছেন শুনে গ্রামের উৎসাহীরা তাঁকে ধ'রে নিয়ে এলেন। নামটি যতদূর মনে হয় মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে আসর বসবে, উত্তেজনা বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে, বহু রসিক ব্যক্তি আসছেন নানাস্থান থেকে। তাঁর সঙ্গে তবলা বাজাবে কে তা নিয়ে কথা উঠেছিল। বেণী-ঠাকুরের খুব ইচ্ছা একবার চেষ্টা ক'রে দেখেন। অতিথি তাঁর বাড়িতেই

আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আর সবাই তাতে আপত্তি করাতে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তবলাবাদকের অভাব ছিল না, কিন্তু তবু একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটল। ঠিক এই সময় কলকাতা অঞ্চলের কোনো এক সুবিখ্যাত যাত্রার দলের নামকরা তবলাবাদক, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় রতনদিয়াতে এসেছিলেন গঙ্গাচরণ চাটুজ্যের বাড়িতে। তিনি কিছুদিন আগে, অসুখ থেকে উঠে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন। তাঁকেই ধ'রে আনা হ'ল।

গানের আসর বসবে সকালে, আমিও দর্শকরূপে উপস্থিত আছি। দেখি সেই নবাগত ওস্তাদ গাঁজা টানছেন। এক ছিলিম শেষ হয়ে গেল, আর এক ছিলিম ধরালেন। তারপর আরও এক ছিলিম। কত বড় গায়ক, সবাই তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে, কিন্তু তিনি নির্বিকার। পর পর আট ছিলিম শেষ হ'ল। একঘণ্টা লাগল মোটের উপর। এরপর শুরু হ'ল গান। এ রকম গান গাওয়া আমি আগে বা পরে আর কখনো দেখি নি। প্রায় তিন ঘণ্টায় শেষ হ'ল সে গান। অনেক গান নয়, একটিমাত্র গান। যত রকম সুর বিস্তার সম্ভব, যত রকম মাত্রা ভাগ সম্ভব, মিনিটে এক মাত্রা থেকে সেকেণ্ডে দশ পনেরো মাত্রা। খাদে সুর নামতে নামতে আর নেই সুর, তখন শুধু হাত নাড়া আর মুখনাড়া চলল মিনিট চার পাঁচ এই নীরব গান। সুর শ্রবণের সীমানায় উঠে এলো খাদ থেকে, 'ফেড ইন' ক'রে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে চড়ার দিকে তুলতে তুলতে আবার সুরের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল, সুর গলাতেও নেই, যন্ত্রেও নেই। চলল নীরব গান তিন চার মিনিট। তারপর চড়ার অশ্রুতির দেশ থেকে সুর নেমে এলো শ্রুতির সীমানায়। তবলা কিন্তু চলছে অবিরাম বিদ্যুৎচালিত আঙুলে। তার কোথায়ও ছেদ নাই।

যে সাতটি রং আমরা চোখে দেখি সেগুলো তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হিসেবে পর পর সাজালে তার হ্রস্ব প্রান্তে থাকে বেগুনী বা ভায়োলেট, আর দীর্ঘ প্রান্তে থাকে লাল বা রেড। দুদিকেই রং আছে আরও, কিন্তু তা চোখে দেখা যায় না। বেগুনী পারে যে রংটি আছে তাকে বলা হয় আলট্রা-ভায়োলেট। লালের পারে যে রংটি আছে, তাকে বলা হয় ইনফ্রা-রেড। এ দুটি কথা রঙের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জীবনে এই প্রথম গানের সাতটি সুরের

দুই প্রান্তে সুরের আলট্রা-খাদ ও ইনফ্রা-চড়ার অস্তিত্ব সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া গেল।

আশু বন্দ্যোপাধ্যাযের বাজনা উচ্চপ্রশংসিত হ'ল, কিন্তু তাঁর কাছেও গানের এ রীতি নতুন। একই গান প্রায় তিনঘণ্টা গাওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার।

বিকেলে আবার আসর বসল। এবারে আরও বেশি শ্রোতা। কিন্তু গানের আগে যেমন রাগের আলাপ, তেমনি ওস্তাদজির সব কিছুর আগে গাঁজার আলাপ। যথারীতি আট ছিলিম, বাঁধা বরাদ্দ। আশুবাবু বাজনা শেষ ক'রে বললেন হাতে দারুণ ব্যথা হয়েছে।

পরদিন আসর বসল সকালবেলা। রাজবাড়ি থেকে হেডমাস্টার ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যও এসেছেন। গাঁজা পর্ব তখন কেবল শুরু। বহু শ্রোতার ভিড়। ধৈর্য রাখা কঠিন। ত্রৈলোক্যবাবু ধৈর্যের সঙ্গে তিন ছিলিম পর্যন্ত টানা দেখলেন। চতুর্থবার সাজার সময় দুহাত দিয়ে ওস্তাদজির দু'হাত চেপে ধ'রে বললেন এখন আর খাবেন না দয়া ক'রে, এত লোক বসে আছে। ওস্তাদজি কলকে ছেড়ে দিয়ে তানপুরাটি তুলে নিলেন এবং তাতে গেলাপ পরিয়ে দেয়ালের সঙ্গে খাড়া ক'রে রেখে অভিমান-আহত কণ্ঠে বললেন—ওটা যদি থাকে তবে এটাও থাক।—ব'লে গুম হয়ে ব'সে রইলেন। ত্রৈলোক্যবাবু বললেন, না না, আমার অন্যায় হয়েছে আপনি চালিয়ে যান।

আশুবাবুর হাতে ব্যথা হয়ে জ্বর হয়েছিল, তাঁকে এক রকম জোর ক'রেই তুলে আনা হয়েছিল, কিন্তু বাজাতে বসে তিনি সে সব ভুলে গেলেন, এবং বাজনা শেষে বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ রকম তবলার হাত স্থানীয় কারো পূর্বে দেখা ছিল না, সবাই একথা স্বীকার করলেন। কিন্তু ওস্তাদজির গানের উচ্চ প্রশংসা হলেও তাঁর তিনঘণ্টা বিস্তারী গানের রীতিতে সবাই অবাক। এর অভিনবত্বই লোকের কৌতূহল উদ্রেক করেছিল বেশি।

আশুবাবুর অক্ষমতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বেণীঠাকুরকে এ আসরে কোনো সুযোগই দেওয়া হ'ল না, এবং উপস্থিত অন্য বাদকেরা একাজে সাহস পেলেন না, অতএব আসর তিন দিনের বেশি চলল না।

ক্রমেই রতনদিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। এখান থেকে যে কোনো জায়গায় যাওয়া সবচেয়ে সোজা, অথচ বরাবর থাকাও সম্ভব নয়। সেজন্য শিশুকালের স্বপ্ন সফল ক'রে একখানা বাইসাইকেল কিনে ফেললাম। এতে গ্রাম্য পথের দূরত্ব আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল। সকালে রতনদিয়া থেকে বেরিয়ে চন্দনা নদী পারের ফেরি-ফাণ্ডের বড় রাস্তা ধ'রে পাংসা স্টেশন, এবং তারপর থেকে গ্রাম্য পথে পদ্মার বালুচরে যাওয়া এবং খেয়া নৌকোয় নদী পার হয়ে সাতবেড়ে। এই যাতায়াত শীতকালে খুবই সহজ। সাতবেড়ে থেকে পোতাজিয়া ২৮ মাইল দূরে। সাইকেল ততদূর পর্যন্তই ব্যবহার করলাম। দুটি শীতকালে সাইকেলে পোতাজিয়া গিয়েছি। সাইকেলের সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসসহ একটি বড় ব্যাগ ও পিছনে টুল ব্যাগ বাঁধা থাকত। পথে প্রয়োজনবোধে মেরামতের কাজও শিখে নিয়েছিলাম।

পথ চলা তখন কত নিরাপদ ছিল। একা বালকের পক্ষে পাবনা জেলার আধুনিকতা-স্পর্শ বর্জিত অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা, সরল নির্ভরতা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি ক'রেই তো চলত। অপরিচিত গ্রাম্য জীবনের সমস্ত পরিবেশটি তাই আমার চেতনার মধ্যে এক অদ্ভুত শ্রদ্ধা ভালবাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আজও।

কলকাতার পথ ও পরিবেশ আমার পরিচিত হওয়াতে সেই বাল্যকালেই কতজনের ফরমায়েস খাটতে হত। একবার এক নিউমোনিয়া রোগিণীর জন্য অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে গেলাম টাকা জমা দিয়ে, এবং তা পেঁছে দিয়ে জমা টাকা তুলে নিয়ে গেলাম। একবার এক রোগীকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দিতে এলাম। শিয়ালদ থেকে পাল্কী ভাড়া লাগল এক টাকা। তখন পাল্কী সব সময়েই পাওয়া যেত, রিকশ ছিল না। এক হঠাৎ-অন্ধ হওয়া বন্ধুকে মাসে দুতিনবার নিয়ে আসতে হ'ত ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের কাছে, বীডন স্ট্রীটে। চোখ ভাল হয়ে গিয়েছিল বছর-খানেকের চিকিৎসায়।

এই সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন এই সাময়িকভাবে অন্ধ বন্ধু নৃপেন্দ্রকুমার রায়কে নিয়ে আসছি এইট-ডাউন প্যাসেঞ্জারে। ১৯১৩ সালের প্রথম দিক হবে যতদূর মনে হয়। কুমারখালি থেকে এক ভদ্রলোক

উঠলেন আমাদেরই কামরায়। তখন গাড়িতে ভিড় থাকত না আদৌ। কুমারখালি থেকে ওঠা ভদ্রলোকের হাতে প্রায় দশ ইঞ্চি ব্যাসের এক পানের ডিবে, তাঁর বড় সিগারেট কেস্-এ ২০টি সিগারেট। তিনি ক্রমাগত পান ও সিগারেট খাচ্ছেন, কিন্তু পোড়াদহ স্টেশনে এসে যখন তিনি আরও গোটাপঞ্চাশেক পান আর দু প্যাকেট সিগারেট কিনলেন, তখন তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। এত পান সিগারেট খাওয়া কখনো দেখিনি, আমার কাছে এটি একটি নতুন আবিষ্কার ব'লে মনে হ'ল, তাই কৌতূহল বশত তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। তাঁর নাম হরিপদ সান্যাল। প্রশস্ত দেহ, স্থূল কিঞ্চিৎ, কৃষ্ণবর্ণ এবং ঘন কোঁকড়ানো চুল। শুনলাম বি. এ. চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, এবং আরও আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িতেই থাকেন।

এরপর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, শুধু মনে রেখেছি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

আরও কয়েক বছর পার হয়ে এসে তাঁর কথাটি শেষ ক'রে রাখি। যে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সে সময় আমি ক্লাস-নাইনে পড়ি। তারপর আমি বি. এ. পড়তে এসে দেখি তাঁর সঙ্গেই পড়ছি; খুবই আশ্চর্য লাগল। শুনলাম অনেক দিন ধ'রে তিনি ফেল করছেন। তারপর আমি বি. এ. পাস ক'রে চলে যাই। প্রাইভেট এম. এ. পরীক্ষা (১৯২৩) দিতে এসে দেখি তিনি তখনও বি. এ. পড়ছেন। আরও বললেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই মর্মে এক আবেদন পাঠিয়েছেন যে তিনি গত আট বছর ধ'রে বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং এই আট বছরের হিসেবে তিনি সব বিষয়েই পাস করেছেন, এমন অবস্থায় তাঁকে বি. এ. পাস ঘোষণা করা হোক। শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয় এ চিঠির উত্তর দেননি।

তাঁর যুক্তিতে অসঙ্গতি ছিল না কিছু। এক বিষয়ে ফেল করলে পরের বছর আবার সব বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার রীতি যে অন্যায় তা এতদিনে সংশোধিত হয়েছে।

আমি এম. এ. পাস করার পর একবার কলকাতা আসি, হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা, আমাকে ধরলেন ইংরেজী নাটক একটু পড়িয়ে দিতে। কয়েক দিন দিয়েছিলাম। এর কয়েক বছর পর তাঁর সঙ্গে আবার দেখা, শুনলাম বি. এ. পাস করেছেন এবং ল পড়ছেন। আরও কিছুদিন পরে শুনি, তিনি

আর বেঁচে নেই। অবিরাম পান সিগারেট খাওয়া যেমন পূর্বে দেখা ছিল না, তেমনি অবিরাম পরীক্ষা দেওয়ার দৃষ্টান্তও পূর্বে দেখা ছিল না। এ রকম ধৈর্য আজ আর দেখা যাবে না।

আমার নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হওয়ায় বাধা ছিল। অবশ্য প্রধান বাধা মনের। স্কুলের পরিবেশ শেষ পর্যন্ত ভাল লাগলেও দৈহিক বাধা প্রবল হয়ে ওঠে। ম্যালেরিয়ায় আর একবার খুব বেশি রকম আক্রান্ত হই। তবু পড়ার ধারা যে বজায় রেখেছিলাম সে কেবল বন্ধুদের পড়িয়ে। অন্যকে পড়াতে আমার খুব ভাল লাগত। রতনদিয়া এবং পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামের অন্তত দশজন ছাত্র কালুখালি স্টেশন থেকে রেলের দৈনিক যাত্রী ছিল রাজবাড়ি স্কুলের। তারা সবাই আমার কাছে আসত ম্যাপ আঁকিয়ে নিতে। পড়াতাম অনেককে। ওতেই আমার নিজের পড়ার কাজ হয়ে যেত।

গিরিজাকুমার রায়ের বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে কবিরাজ দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য কবিরাজি করতেন। তিনি সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছিলেন, কিন্তু কোন্ সূত্রে তা আমার মনে নেই। কবিরাজের চেয়ে তিনি সমাজ সংস্কারক ছিলেন বেশি। তখন তার জাতিভেদ নামক সুবিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার রক্ষণশীল মহলে তা নিয়ে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন লেফটেনাণ্ট কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ বই প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, কেননা আমিও মনে মনে ছিলাম নিয়ম ভাঙার দলে। আমার এক অনুচর হরেন্দ্রকুমার রায় (পূর্বে উল্লেখিত), সেও দিগিন্দ্রনারায়ণের বিশেষ অনুগত ছিল।

আমাদের বালক মন সহজে প্রভাবান্বিত হওয়া স্বাভাবিক, এ বিষয়ে হরেন্দ্রকুমার ছিল চরম। এ রকম মানসিক গঠন আর আমি দ্বিতীয় দেখিনি। আমার অনেক উৎসাহজনক কাজেরই সে ছিল সঙ্গী, যেখানে সে আমাকে ছাড়িয়ে যেত, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য ছিল আমার নাগালের বাইরে। সে স্কুলে খুব ভাল ছেলে ছিল। স্কুলের একটি বার্ষিক পরীক্ষায় একবার অঙ্কে পুরো মার্ক পেল কিন্তু তার পরের বছর পেল শূন্য। কি ক'রে এটা হ'ল তা উল্লেখযোগ্য।

তার পিসতুত ভাই প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন সাহেবগঞ্জ স্কুলে

ম্যাট্রিকুলেশন পড়ে। বাইরের জগতের যা কিছু আধুনিক তা তখন পর্যন্ত তারই মধ্যস্থতায় রতনদিয়ার ছাত্র মহলে আমদানি হ'ত। ফুটবল খেলায় টীম গঠন, শিক্ষা-মূলক ভ্রমণ করা প্রভৃতিতে তার ভীষণ উৎসাহ। আমার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল তার, যদিও তিন চার ক্লাস উপরে পড়ত সে। একবার সে ডি. এল. রায়ের সাজাহানে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলো গ্রামে একখণ্ড সাজাহান হাতে নিয়ে। প্রায় এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (তখন স্কুলের ছাত্র) দ্বিজেন্দ্রলালের একখানা ফোটোগ্রাফ দেখালেন, তাতে লেখা ছিল 'আমার তরুণ বন্ধু রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে।' এ দুটি ঘটনার যোগাযোগে দ্বিজেন্দ্রলাল ওখানকার স্কুলের ছেলেদের মধ্যে 'হীরো' হয়ে পড়লেন। সে কি উন্মাদনা। প্রবোধ আপন উন্মাদনা সবার মধ্যে সঞ্চারিত করল, এবং সে তার কাজ শেষ ক'রে সাহেবগঞ্জে ফিরে গেল, কিন্তু সর্বনাশ হ'ল হরেন্দ্রের। সাজাহান হ'ল তার ধ্যান জ্ঞান। তার বাইরে জগতে আর কিছু নেই, সে আগাগোড়া সাজাহান মুখস্থ ক'রে এমন আনন্দ পেল যার কাছে স্কুল তুচ্ছ হয়ে গেল, এবং পরের বছর অঙ্কে শূন্য এবং অন্যান্য বিষয়ে কম মার্ক পেয়ে ফেল করল। শুধু তাই নয়, এক দিন স্বপ্ন দেখল সে নিজে ডি. এল. রায় হয়ে গেছে।

দিগিন্দ্রনারায়ণের প্রভাবে পরে হরেন সমাজ বিষয়ে চিন্তাশীল হয়ে উঠেছিল, এবং কয়েকখানা বইও লিখেছিল জাতির অধঃপতন বিষয়ে। অবশ্য এ সবই তার নিজের অধঃপতনের পরে। বহুকাল পরে (১৯২১ সম্ভবত) সে শান্তিনিকেতনে চাকরি নিয়ে যায়। তখন তাকে ঠাট্টা ক'রে বলা হ'ত, "দ্বিজেন্দ্রলাল তোমার সর্বনাশ করেলেন, বাঁচালেন রবীন্দ্রনাথ।" এই হরেন্দ্রকুমারের মনের একটা অংশ বরাবরই কোমল ছিল, সে জন্য শান্তি-নিকেতনে স্টোরের কাজের ফাঁকে সে-মনের যতটুকু অবশিষ্ট থাকত তাইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে মেতে সে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। তার পরিচয় পাওয়া যেত দেশে ফিরলে। কলকাতায় শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী যখন যোগেশ চৌধুরীর সীতা মঞ্চস্থ করেন তখন আমার সঙ্গে সে সেই নাটক দেখেছিল। এই নাটক দেখে সে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে আমার ভয় হয়েছিল মাথা খারাপ হয়ে না যায়। অভিনয় দেখে ফিরে এসে সে সমস্ত রাত জেগে বসে ছিল, আমাকে ঘুমোতে দেয়নি। দশ পনেরো মিনিট পর পর আমাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে শুধু বলেছিল 'কি দেখলাম।'

এর পর তিন দিন আর সে কোনো কাজ করতে পারে নি। কয়েক বছর পরে সে বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র গ্রামে থাকলে খুব হৈ হৈ-এর মধ্যে দিন কাটত। সর্বদা আবৃত্তি চলছে নানা নাটক কাব্য থেকে, ডাকঘর ছিল চাটুজ্যেদের বাড়িতে। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র যোগেন্দ্রকুমার লাহোর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, তিনি পাঠ শেষ না করেই চলে এসেছিলেন দেশে। দেশের সম্পত্তি তিনিই দেখাশুনা করতেন। তিনি ছিলেন রত্নদিয়া ডাকঘরের পোস্ট-মাস্টার। একদিন রবীন্দ্র মৈত্রের ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার খবর এলো ডাকঘরে। আমরা যাচ্ছিলাম ডাকঘরে দেখি রবীন্দ্র মৈত্র উল্লাসে ফেটে পড়ছেন—যাকে দেখছেন তাকেই বলছেন, 'না, আমি ফেল করেছি।' হাতে পোস্টকার্ড, তাতে প্রথম বিভাগে পাস করার খবর ছিল। 'ফেল করেছি' বলেই সেখানা সামনে মেলে ধরছিলেন

আমার অনুজ সুবিমলের অকাল মৃত্যুতে বাবা শোকাহত হয়েছিলেন স্বভাবতই। তা ভুলে থাকবার জন্য গীতার মধ্যে ডুব মারলেন এবং ঐ সঙ্গে গীতার অনুবাদও করতে লাগলেন। প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠে সেতার নিয়ে বসতেন এবং আপন মনে কিছুক্ষণ বাজিয়ে চলতেন। গীতার অনুবাদ সম্পূর্ণ হ'ল ১৯১২ সালে। বাবার দুজন নির্ভরযোগ্য ছাত্র শ্রীনলিনীরঞ্জন রায় (বর্তমানে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ) ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তখন কলকাতায় কলেজে পড়তেন। সুরেনদা ব্যবসায় নেমে সফল হয়েছেন, তিনি এখন কলকাতা-বাসী। তাদের উপর ভার পড়ল গীতার অনুবাদ ছাপাবার। এই সময় আমি খুব ছবি আঁকার অভ্যাস করছিলাম 'হাউ টু ড্র গুড পিকচাস' নামক একখানি মোটা বই বাবা কিনে দিয়েছিলেন। তা থেকে বাবার সাহায্যে পাস পেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা হতে দেরি হ'ল না। বিলেত থেকে ডাকে অনেক রঙীন ছবি আনিয়ে নিয়েছিলাম। তা ভিন্ন মাস্টারপীসেস অফ আর্ট নামক একখানা বড় বই কিনেছিলাম। গীতার জন্য কয়েক খানা ছবি এঁকে দিয়েছিলাম সেই বালক বয়সে। আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য সে গুলো ছাপাও হয়েছিল, যদিও না হলেই ভাল হ'ত।

অনুবাদ গীতাবিন্দু নামে ছাপা হয়। ছাপার সময় আমিও দু একবার

কলকাতায় এসেছি। ব্লক করেছিলেন কে. ভি. সেন। তাঁর সঙ্গে এই উপলক্ষে আলাপ হয়েছিল। পুরনো রিপন কলেজের বাড়ির দোতালায় ছিল তাঁর ব্লক তৈরির কারখানা। নিচে বণিক প্রেস নামক এক ছাপাখানা ছিল ফটকে ঢুকেই ডান ধারে। অনেক পরে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি উঠে আসে এখানে।

অনুবাদের সময় ছন্দের আনন্দে বাবা খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। উৎসাহী শ্রোতাদের কাছে অক্লান্তভাবে প'ড়ে প'ড়ে শোনাতেন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় যতগুলি ছত্র আছে, কাব্যানুবাদেও ঠিক ততগুলি ছত্র। প্রচলিত শ্লোকগুলি পৃথক ছন্দে অনুবাদ করা হয়েছিল যাতে সহজে মুখস্থ করা যায়। অনূদিত গীতাতেও এগুলি পৃথক ছন্দে রচিত। পয়ার ছন্দ চলতে চলতে হঠাৎ এলো—

বসনখানি জীর্ণমানি' যেমন তারে ফেলে'
আরেক নব বসন পরে মানব অবহেলে,
তাহারি প্রায় দেহীর কায় জীর্ণ হলে পর
আবার সে যে গ্রহণ করে নূতন কলেবর। (২-২২)

কিংবা

কবি পুরাতন, বিশ্বশাসন কারী,
অণু হতে অনুসূক্ষ্ম যে তনু ধরে,
অনন্তরূপ, অচিন্ত্যরূপ ধারী
সূর্যের সম অজ্ঞান-তম' হরে—

এ সব বিচিত্র ছন্দের মাদকতায় পাঠ-পরিবেশ আচ্ছন্ন হয়ে যেত। ছন্দের ঝঙ্কারের অদ্ভুত এক নন্দনশক্তি। বিশ্বরূপ দর্শন (একাদশ অধ্যায়) বিশেষ ক'রে অনুবাদকারীর প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি নিজের ছন্দের টানে ভেসে যেতে লাগলেন। সে ধ্বনি আজও কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে—

"অনল-শ্বসনা লেলিহা রসনা মেলিয়া সকল দিশে,
তোমার বদন বিশ্বের জন নিঃশেষে গরাসিছে!
নিখিল জগৎ তোমার মহৎ তেজে যে উঠিল ভরি'
উগ্র ঝলক সমগ্র লোক দগ্ধি' ছুটিল, হরি।" (৩০)

কিংবা

"বিশ্ব বিশাল গ্রাসি আমি কাল স্বয়ং ভয়ঙ্কর
নিখিল-বিনাশ-সাধনে আয়াস করিনু অনন্তর!
তুমি নাহি মারো, তথাপি কাহারো নিস্তার নাহি আজি,
রয়েছে যদিও প্রতিপক্ষীয় অনেক যোদ্ধা সাজি! (৩২)
তুমি উঠি তবে খ্যাতি লুটি লবে, সমরে সমুদ্যত;
অরাতি পুঞ্জ জিনিয়া ভুঞ্জ রাজ্য সমুন্নত!
আমিই সবাকে বধিয়াছি আগে, কেহই রহেনি বাঁচি"—
'নিমিত্তমাত্র কেবল মাত্র হও হে সব্যসাচী।' (৩৩)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার এর চেয়ে ভাল ছন্দানুবাদ হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

শ্রীনলিনীরঞ্জন রায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫ রামতনু বসু লেন, এই ছিল প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা। রবীন্দ্রনাথ গীতাবিন্দু পাঠাতে প্রশংসা ক'রে ছোট একখানি চিঠি দিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয় সে চিঠিখানি হারিয়ে গেছে। বই বিক্রির ব্যবস্থাও প্রাকশেকেরাই করেছিলেন। আমি মাঝে মাঝে এসে বই দোকানে দিতাম। দুটি মাত্র জায়গায় রাখা হ'ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও বরেন্দ্র বুক স্টলে। এঁরা প্রতিমাসে বিক্রয় কমিশন কেটে টাকা শোধ করে দিতেন। বরেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় হয়, আমার সঙ্গে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করতেন। আজও তিনি টিকে আছেন বরেন্দ্র লাইব্রেরিতে।

পোতাজিয়াতে ইতিমধ্যে আমি আরও দুখানা কাগজের গ্রাহক হয়েছি। একখানা লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'বয়েজ ওন পেপার' আর একখানা কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্', দ্বিসাপ্তাহিক। নিজের পছন্দসই সংবাদ বা রচনা বেছে নিয়ে পড়তাম এবং মোটামুটি এক রকম বুঝে নিতাম। মুকুল, প্রকৃতি, শিশু, নিয়মিত আসত। 'বালক' নামক একখানা মিশনারি কাগজ বার্ষিক মূল্য ছ আনা, আমার খুব প্রিয় ছিল। মনে আছে চার লাইনের ছড়া লিখে অ্যাব্রাহাম লিংকন-এর জীবনী একখানা উপহার পেয়েছিলাম।

লেখার ইচ্ছা হ'ত। ফণীন্দ্রনাথ কবিতা লিখত, তার কবিতা সে সময় ছাপা হ'ত কোনো কোনো বড়দের কাগজে। বাবা বললেন রচনা অভ্যাস করতে হ'লে খবরের কাগজে লেখা অভ্যাস করা ভাল। তাই ঠিক করলাম।

পাবনা থেকে সুরাজ নামক একখানা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ হ'ত, তাতে পনেরো দিন পর পর স্থানীয় সংবাদ লিখে পাঠাতাম। স্থানীয় আবহাওয়া ও অন্যান্য অনেক তুচ্ছ খবর লিখতাম এবং তা আমার নামে ছাপা হ'ত। একখানা ক'রে কাগজ পেতাম তার বিনিময়ে। ১৯১৩ সাল সম্ভবত মনে পড়ছে না ঠিক।

১৯১৩ সালের ১২ই কিংবা ১৩ই মে, পোতাজিয়া স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির কিছু পূর্বের ঘটনা। দিনাজপুরের একটি ছেলে, নাম উপেন, পোতাজিয়াতে পড়ত। সে ছুটির আগেই বাড়ি যাচ্ছে, আমারও খুব ইচ্ছে হ'ল ওর সঙ্গে গোয়ালন্দ হয়ে রতনদিয়াতে আসি। সকালে রওনা হয়ে রাত ৮টার সময় গোয়ালন্দ পৌঁছলাম স্টীমারে। উপেনের কাছে আগেই শুনেছিলাম সে হিমালয় দেখেছে এবং বরফ ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখেছে, বহুদূর থেকেই দেখা যায়।

হিমালয় সম্পর্কে আমার একটা রহস্যময় আকর্ষণ জন্মেছিল, আগে বলেছি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল উপেনের সঙ্গেই যদি চ'লে যাই তা হ'লে হিমালয় দর্শন সহজেই হ'তে পারে—নইলে ভবিষ্যতে কবে হবে বা আদৌ হবে কি না কে জানে। এ সুযোগ ছাড়া চলে না, সঙ্গে যথেষ্ট টাকা ছিল, আমার গ্লাডস্টোন ব্যাগে ছবি আঁকার খাতা আর দুএকটি টুকিটাকি জিনিস। দার্জিলিঙ সম্পর্কে সে সময় কোনো ধারণা ছিল না, শুনেছিলাম ঠাণ্ডা দেশ, তাই বোশেখের শেষের তপ্ত হাওয়ায় সে ঠাণ্ডা কল্পনা ক'রে ভাল লাগল। তারপর গোয়ালন্দ থেকে পোড়াদহ, সেখান থেকে দামুকদিয়া ঘাট পার হয়ে সারাঘাট থেকে আর এক গাড়িতে সমস্ত দিন পরে এলাম শিলিগুড়ি। পথে কয়েক ঘণ্টা ধ'রে অবিরাম বর্ষণ হয়েছিল। সারাঘাট থেকে সম্ভবত সান্তাহার মিটার গেজ লাইনের গাড়িতে উঠেছিলাম, এখন মনে নেই। শিলিগুড়িতে পৌঁছতে রাত হয়েছিল। সেখানে গিয়ে জানা গেল পরদিন সকালে দার্জিলিঙের গাড়ি। সমস্যা হ'ল রাত কাটাব কোথায় এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে।

প্ল্যাটফর্মের উপরে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল বাজারের দিকে গেলে একটি খাবারের দোকান আছে। অতএব সেই দিকেই রওনা হচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন ব্যাগ টেনে নিচ্ছ কেন,

অসুবিধে হবে। কোথায় রাখব ব্যাগ? বললেন, এই প্ল্যাটফর্মে রেখে যাও, কেউ নেবে না। অবিশ্বাস করতে শিখিনি তখনো, তাই কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে ব্যাগ শিলিগুড়ির সেই দীর্ঘ এবং প্রায় জনশূন্য প্ল্যাটফর্মে রেখে রাত্রের অন্ধকারে খাবারের দোকানের সন্ধানে যাত্রা করলাম দুই বালক।

দোকান পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেখানকার খাদ্য মুখে স্পর্শ মাত্র করেই ফেলে দিতে হ'ল। অনেক দিনের পচা খাদ্য। হতাশ মনে ফিরে এলাম। ব্যাগটি সত্যিই কেউ ছোঁয়নি, যেমন রেখে গিয়েছিলাম তেমনি প'ড়ে ছিল। আমার 'পথে পথে' বইতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, সেখানে এই ঘটনা বিষয়ে মন্তব্য করেছি—

শিলিগুড়িকে এতক্ষণ প্রশংসা করছি না কেন। শিলিগুড়ি ১৯১৩ সালে [illegible] বড় আনন্দ ছিল না। [illegible] বোঝা যায় [illegible] সে সময়ে শূন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি গ্লাডস্টোন ব্যাগ চুরি করার মতো লোক সেখানে ছিল না। চোর তো ছিল না, এমন সুযোগ পেয়ে সাময়িকভাবে চোর হয়ে উঠবে এমন সাধুও কেউ ছিল না।

স্টেশনের লোকের পরামর্শ শুনে রাত্রিটা 'দার্জিলিঙ হিমালয়ান' গাড়ির মধ্যে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। এ রকম অদ্ভুত খেলনা গাড়ি দেখে খুব হাসি পাচ্ছিল। আমরা কোথায় যে ঠিক যাব তা জানি না; দার্জিলিঙে না তার আগের কোন স্টেশনে, কিছুই স্থির করিনি। কোনো অভিজ্ঞতা নেই। শুনলাম গাড়ির মধ্যেই টিকিট পাওয়া যায়, ট্রামের মতো। তাই টাইম টেবল দেখে তিনধরিয়া, তারপর কার্সিয়ং এবং সেখান থেকে দার্জিলিঙের টিকিট কিনলাম। নামতে ইচ্ছে হচ্ছিল না মাঝ পথে। যত উপরে উঠছি তত অদ্ভুত লাগছে, এবং দেখছি সবার গায়েই শীতের পোষাক। আমরা বুঝতেই পারিনি কেন এ সময়ে সবার গায়ে শীতের পোষাক। দার্জিলিঙে পৌঁছে অবশ্য বুঝেছিলাম। শীত খুব বেশি ছিল না দিনের বেলা, মে মাস। কিন্তু সবার মাঝখানে আমাদের পোষাক বেখাপ্পা লাগছিল। আমার গায়ে চেক-ছিটের গলাবন্ধ কোট, সঙ্গীর গায়ে শার্ট। দার্জিলিঙে নামতেই এক যুবক কাছে এসে খুবই ভদ্রভাবে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি পুলিসের লোক ব'লে পরিচয় দিলেন। তিনি আমাদের পোষাক দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পালিয়ে এসেছ বাড়ি থেকে?'

এ প্রশ্নের উত্তরে সোজা বললাম, "না।" কোথায়ও যাওয়া বিষয়ে এ রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে তা জানতাম না। পুলিস অফিসারের উদ্দেশ্য কিছু খারাপ ছিল না। তাঁর কাছেই শুনলাম কোনো হোটেল বা স্যানাটোরিয়ামে একটি সীট খালি নেই, এবং সেজন্য তিনিই আমাদের থাকবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। পাবনার লোক শুনে পাবনার এক ভদ্রলোক, নাম অন্নদাগোবিন্দ সান্যাল, তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন স্থানীয় আদালতের কেরানি, আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করলেন। দুটো ওভারকোট সংগ্রহ ক'রে দিলেন। খাওয়া তাঁদের মেসে চলত, শোবার ব্যবস্থা হ'ল আরও সুন্দর। পরিচয় হ'তে হ'তে রতনদিয়ার অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এক শরীকের পুত্র, নাম শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খান্তি নামে পরিচিত), এগিয়ে এলেন রতনদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আছে শুনে। তিনি তখন একটা বড় বাড়িতে থাকতেন, বাড়িটি খালি ছিল। সেইখানে রাত্রিবাস ঘটতে লাগল।

পুলিস অফিসার প্রতিদিন খোঁজ নিতে আসতেন, এবং প্রতিদিন আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিজে পোস্ট করতেন। আমি আসবার সময় শিলিগুড়ি থেকে আগেই বাবাকে সব জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম।

দার্জিলিঙের সমস্ত সুন্দর লাগল। এ রকম উন্মাদ করা সৌন্দর্য আর আমি দেখিনি। দার্জিলিঙের দৃশ্য-বৈচিত্র্য, শত রকমের অভিনবত্ব আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলল। যা ছিল এতদিনের কল্পনা, যার জন্য অন্তরে অন্তরে আমি এমন টান অনুভব করেছি, তা যে এমন আশ্চর্য সুন্দর, তা যে ভাষার অনেক উর্ধ্বে একটি অর্ধচেতন সত্তার শুধু স্পন্দনময় একটি আনন্দ আবেগ, তা আগে কল্পনা করতে পারিনি। আমি ইতিপূর্বে ভাবপ্রবণ হরেন্দ্রকুমারের সীতা নাটক দেখার পরিণাম বর্ণনা করেছি। চিন্তা করতে গিয়ে দেখি, দার্জিলিঙ দেখে আমিও ঠিক ঐ রকমই অভিভূত হয়েছিলাম। দুটি পৃথক জিনিস, কিন্তু অনুভূতির গভীরতা সম্ভবত দুদিকেই সমান।

একটি সংজ্ঞাহীন বলিষ্ঠ সৌন্দর্যের স্পর্শ যে একটি ভাবপ্রবণ বালকমনকে এমনভাবে ভেঙেচুরে দার্জিলিঙের কুয়াসার গুঁড়ো গুঁড়ো দানার মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে পারে, তা স্বপ্নেরও আগোচর ছিল। নিজেকে শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম, এ কি দেখলাম!

প্রথম পর্ব

চতুর্থ চিত্র

দার্জিলিং দেখা দিল একটি রহস্য প্রশ্নরূপে। হঠাৎ সব নতুন, সমতল মাটি নেই, দিগন্ত রেখা নেই, গ্রীষ্মের দাহ নেই, দৃশ্যের একঘেয়েমি নেই, সব অনিয়মিত, সব অস্থির। ঊর্ধ্বে মেঘ, পায়ের কাছে মেঘ, পায়ের নিচে মেঘ। আকাশে গাছ, পাশে গাছ, পায়ের নিচে গাছ। আকাশে মানুষ, পাতালে মানুষ। মনের সে যে কি অবস্থা তা বোঝানোর ভাষা নেই। শুধু একটি ভাবসমাহিত অবস্থা।

আজ আমি ভেবে অবাক হই—এই অদ্ভুত উদ্দাম নিসর্গ শোভা কি ক'রে আমাকে এমন ভোলাল। কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে চলে এলাম এখানে? তখনকার দিনে অন্য কোনো দিকে পথ খোলা ছিল না, সে জন্যই হয় তো। আজকের দিনে বালক বয়সে এ রকম সুযোগ পেলে নির্ঘাৎ বখে।

দার্জিলিঙ মনের সমস্ত ধারণা ওলটপালট ক'রে দিল। অভ্যস্ত জিনিসের বা জানা জিনিসের বাইরেও যে সত্য আছে, সুন্দর আছে, তা মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না ব'লেই মন নতুনের কাছে অনেক সময় এমন পরাভূত হয়। মনের গোঁড়ামি ছাড়লেই মনের মুক্তি। তা স্বাস্থ্যকর কি ক্ষতিকর, সে প্রশ্ন আলাদা।

কিন্তু আমি যে দার্জিলিঙে ব'সে স্বপ্ন দেখছি, এর কোনো দাম আছে কি না আমি জানি না। চোখ খুলে দিবাস্বপ্ন দেখছি। মেঘ এসে সব ঢেকে দিচ্ছে, আবার ঢাকনা খুলে গিয়ে সব রোদে ঝলমল ক'রে উঠছে। পরক্ষণেই হয় তো ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হয়ে গেল সেকেণ্ড খানেক। মেঘ আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, কাছের মানুষ চেনা যায় না। মনে হচ্ছে পৃথিবী এখানে এসে ফুরিয়ে গেছে, পায়ের নিচে থেকে সব শূন্য। কিছুক্ষণ পরেই রবারে-ঘষা পেন্সিলের ছবির মতো একটু একটু দেখা যাচ্ছে সব।

দার্জিলিঙের প্রথম প্রভাত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোনা-গলানো তরঙ্গায়িত

রেখায় ফুটে-ওঠা কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্যে। বিছানা থেকে মাথা তুলে সে দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটা অদ্ভুত পবিত্র সে দৃশ্য। এই নতুন জায়গার কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ, সব গোলমাল হয়ে গেল। কোন্ রূপকথার রাজ্যে এসেছি এবং অপ্রস্তুতভাবে! আমাকে কোনো অভিনবত্বের সন্ধানেই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে না। যে-কোনো দিকে চোখ মেললেই অভিনবত্বের অক্লান্ত শোভাযাত্রা। কোথাও পুনরাবৃত্তি নেই, শুধু চোখ মেলে ব'সে থাকা।

সাত দিন ছিলাম দার্জিলিঙে। মনে পড়ে বারলিংটন স্মিথের দোকান থেকে যত পারি কেবল ছবি কিনেছিলাম। ফোটো পোস্টকার্ড ও ফোটোর বই। একখানা বইতে বইয়ের আকারের চেয়ে বড় একখানা রঙীন ছবি ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার। লম্বা প্যানোরামা, অদ্ভুত সুন্দর ছাপা, ভাঁজ খুলে দেখতে হ'ত। ফোটো পোস্টকার্ডগুলো একরঙা ও রঙীন দুরকমই ছিল। পোষাকের অভাব কিছু মিটিয়ে নিয়েছিলাম হোয়াইটঅ্যাওয়ে লেডল'র দোকানে ঢুকে। সেখানকার কেনা একজোড়া দস্তানা আজও প'ড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়।

দার্জিলিঙে জলাপাহাড় রোডে অনেক ঘুরেছিলাম। স্টেশন থেকে ঠিক কতদূরে কোন্ এলাকায় ছিলাম এখন তা আর মনে পড়ে না। ঘুরে ঘুরে নানা লোক-প্রসিদ্ধ স্থান দেখার প্রবৃত্তি তখন ছিল না; ঘর থেকে খেয়ে বেরিয়ে কোনো একটা নির্জন পথের ধারে গিয়ে বসে থাকতাম। পথই একমাত্র লক্ষ্য, এক একটি বেলা কাটিয়ে দিতাম ঘুরে অথবা ব'সে।

একই জায়গায় ব'সে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য রহস্যের স্বাদ আমি পেয়েছি সেই বালক বয়সেই। জীবনে কোনো উচ্চকাঙ্ক্ষা ছিল ব'লে মনে পড়ে না, কিন্তু যে প্রেরণা আমি সমস্ত অন্তরে অন্তরে বালক কাল থেকে অনুভব করেছি সে হচ্ছে এই সৌন্দর্যভোগের প্রেরণা। ছেলেবেলা থেকেই আমি অনেকখানি কল্পজগতে বাস করতে অভ্যস্ত হয়েছি, সে আমার নিজের গড়া জগৎ। তা আজও সম্পূর্ণ ভেঙে যায়নি। সেই জগতের পরিব্রাজক আমি চিরদিন। আমার মনের গঠনটাই এই, চেষ্টা ক'রে হয় তো কিছু বদলানো যায়, কিন্তু মূলতঃ কোনো বদল হয় না।

দার্জিলিঙকে কেন এত ভাল লাগল তা যত ভাবেই ব্যাখ্যা করি, তাকে

ঠিক ব্যাখ্যা বলা যায় না। আমি নিজে যা জানি না তার ব্যাখ্যা করব কি ক'রে। দার্জিলিঙের ছোট গাড়ি, তার অদ্ভুত পথ, তার আদিম অরণ্যখচিত দেহ, তার ফাটলে ফাটলে অন্তঃসলিলা স্নেহধারার প্রকাশ, তার নতুন মানুষ, নতুন ভাষা, নতুন ঘরবাড়ি তার চিরতুষারমৌলি দীর্ঘপর্বতশ্রেণী; তার মেঘভেদী উচ্চতা, তার অকালশৈত্য, তার অস্থির শোভা, তার বিরামহীন রূপান্তর—সব মিলে একটা সুখস্বপ্নানুভূতি মাত্র। গাড়িতে উপরে ওঠার সময় থেকে আরম্ভ ক'রে পলকহীন চোখে শুধু একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি মনে মনে কি দেখছি, এ কি স্বপ্ন না সত্য? মাঝে মাঝে গাড়ি থেকে নেমে পাথর, মাটি, পাহাড়-বেয়ে-চুইয়ে-পড়া জল, স্পর্শ ক'রে ক'রে প্রশ্ন করেছি নিজের মনকে—এ কি স্বপ্ন না সত্য? পথের ধারে ব'সে সমস্ত দেহ দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছি হিমালয়ের জমি। মাটিতে অর্ধশায়িত অবস্থায় দুহাতে ঘাস মাটি পাথর চেপে ধ'রে শুধু অনুভব করতে চেষ্টা করেছি, এ কি জিনিস। খাওয়া ভুলে গিয়েছি। সঙ্গীকে ছেড়ে দিয়ে আমি একা ব'সে থেকেছি পাহাড়ের ধারে। কখনো ফেরিওয়ালার কাছ থেকে দুচার আনার কেক কিনে খেয়ে বিকেল পর্যন্ত একই জায়গায় ব'সে কাটিয়েছি তবু তৃপ্তি হয়নি, তবু সেই চলমান রূপের কাছে আমি অবসন্ন এবং পরাজিত।

দার্জিলিঙের কটি দিনের একটি ভাষাহীন উপলব্ধি নিয়ে নিচে নেমে এলাম। পুলিসের আর এক জন অফিসার আমাদের সঙ্গে এলেন শিলিগুড়ি অবধি। সেখানে এসে তিনি আমাদের টিকিট কিনে দিয়ে চলে গেলেন। শেষে মনে হয়েছে এ শুধু আমাদের প্রতি মমত্ববশতই নয়, এর পিছনে ব্রিটিশরাজের নিরাপত্তার প্রশ্নও ছিল।

একই সঙ্গে সাবলাইম আর রিডিক্যুলাস, পর্বত এবং মূষিক; সর্বত্র এই বৈষম্য, এড়াবার উপায় নেই।

স্টেশনে এসে একখানা ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস কিনলাম স্টল থেকে। সেই কাগজে সেই স্টেশনে ব'সে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু সংবাদ প'ড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ঘটনাটা আমার বিশেষ ক'রে মনে আছে, তার কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে একটি রোমান্টিক ভাব ছিলই, তদুপরি নতুন ক'রে জেগেছিল ভারতবর্ষ কাগজ সম্পর্কে। তখনও কাগজ প্রকাশিত

হয়নি, কিন্তু কি আকুল আগ্রহে তার অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় সম্পাদকের মৃত্যু সংবাদটা ভীষণভাবে অপ্রত্যাশিত ছিল।

দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এসে কিছু দিনের মধ্যে আবার ম্যালেরিয়া জ্বরে কাতর হয়ে পড়ি। জ্বর আর কিছুতে ছাড়ে না। পিলে হাতে লাগে এমন অবস্থা। জ্বর ১০০ ডিগ্রী (ফারেনহাইট) প্রায় বাঁধা। কিন্তু এই অসুখটি ক্রমে এমনই ধাতসওয়া হয়ে উঠেছে যে জ্বর নিয়েই বেশ চলফেরা করছি, অভিভাবকীয় শাসনও শিথিল। শেষ কালে নিজেরই উপর বিরক্ত হয়ে চ'লে এলাম কলকাতায় এবং জ্যাঠতুত ভাই নলিনীরঞ্জনের পরামর্শ অনুযায়ী লেফটেনাণ্ট কর্নেল রসিকলাল দত্তের কাছে গেলাম এক অপরাহ্নে। চৌরঙ্গী থেকে বেরিয়েছে এমন একটা পথ, সদর স্ট্রীট সম্ভবত, মনে নেই আজ, কিন্তু আর সবই মনে আছে। তিনি তখন আর. এল. দত্ত নামে প্রসিদ্ধ। ক্ষীণদেহ, সাহেবী পোষাকপরা ডাক্তার। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ভাল ভাবে পরীক্ষা করলেন। কাঠের খাটো স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করেছিলেন বুক পরীক্ষায়। ফী দিয়েছিলাম আট টাকা। তাঁর ব্যবস্থা সবই মনে আছে। প্রেসক্রিপশনও মুখস্থ আছে অনেক দিনের ব্যবহারে। সেটি এইভাবে লেখা ছিল—

Re.

(i) Arsenoferratose
one teaspoonful to be
taken twice after meals

(ii) Ferri et quini citras
one tablet thrice daily.

(iii) Casagra
two teaspoonfuls at
bedtime.

তিনটিই পেটেণ্ট ওষুধ, কিনতে গেলাম স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রীটের দোকানে ধর্মতলা স্ট্রীটে। একঘণ্টা আন্দাজ ব'সে রইলাম, তারপর পেলাম ওষুধ। দেরির কারণ, প্রত্যেকটি শিশির মূল লেবেল তুলে তাতে দোকানের লেবেল লাগিয়ে তার উপর ডাক্তারের নির্দেশ পরিষ্কার হাতে লিখে দেওয়া হয়েছে। স্ক্রিপ্ট টাইপে "দি প্রেসক্রিপশন"--স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রীট অ্যাণ্ড কোং ছাপা একখানি মোটা খামে প্রেস্‌ক্রিপশনখানি ফেরৎ পেলাম। ওষুধের নাম যে আজও মনে আছে তার কারণ ওষুধ বিষয়ে খুব ছেলেবেলা থেকে আমার

একটি দুর্দমনীয় আকর্ষণ ছিল। বাল্যকালে ওষুধ নিয়ে যেসব এক্সপেরিমেণ্ট করেছি তা শুনলে ভেষজ জগৎ স্তম্ভিত হবে, অতএব তা আর বলব না, তবে এই আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত আমাকে অনেক দূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং এককালে ডাক্তারী পরীক্ষার্থীরা আমার কাছে ডোজ জিজ্ঞাসা ক'রে স্মৃতি ঝালাই ক'রে নিত। সে সব কথা ভবিষ্যতের জন্য রইল।

আর. এল. দত্তের শুধু ওষুধ ব্যবস্থা নয়, হাওয়া-বদল ও পথ্য বিষয়েও ব্যবস্থা ছিল। বলেছিলেন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকতে হবে। সকালে পথ্য দুধবার্লি, দুপুরে ভাত, বিকালে দুধবার্লি, রাত্রে রুটি বা লুচি। সকালে এবং বিকালে বেড়াতে হবে নিয়মিত।

বন্ধু প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় (পূর্বে উল্লেখিত) থাকত সাহেবগঞ্জে, সেখানে যাওয়াই ঠিক করলাম। ই আই. আর. গাড়িতে এই প্রথম চড়া। এবং এই প্রথম অনুভব করলাম এ গাড়ি আমাদের ই. বি এস. আর. গাড়ি থেকে অনেক আরামপ্রদ, এতে ঝাঁকুনি অনেক কম, শুধু দুধারে একটু হেলেদুলে চলে। নতুন জায়গায় যাওয়ার উত্তেজনায় রাত্রে ঘুমনো সম্ভব ছিল না। প্রায় ফাঁকা গাড়ির সুপ্ত নির্জনতার মধ্যে আমি একা জেগে বসে আছি কাঁচের জানালায় নাক লাগিয়ে। শীতকালের মধ্য রাত্রি। বাংলার সীমা ছাড়াতে দেরি আছে তখনও, বীরভূমের আকাশে অস্পষ্ট তালবনের সিলুয়েট দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ট্রেনের শব্দ প্রখর এবং গাঢ় হয়ে উঠছে তাকিয়ে দেখি গাড়ি দুই উঁচু জমির প্রাচীর ভেদ ক'রে চলেছে। ক্রমে শক্ত মাটির, পাথুরে মাটির উপর চলতে চাকার সঙ্গে রেলের একটা মধুর ঠুং ঠাং আওয়াজ হচ্ছে। এ দিকের রেল লাইন সমতল জমির উপরে পাতা, সেও আমার কাছে নতুন। পূর্ববঙ্গের সব জায়গায় সমস্ত রেল উঁচু পথের উপর পাতা।

একটি রাত্রির অবসানে আবার চোখে সব নতুন। নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন ভাষা। এই ছবিটিও আমার সহজ-মুদ্রণগ্রাহী বালকমনে চির-চিহ্নিত হয়ে আছে। একটা অহেতুক আনন্দের স্মৃতি সকল সত্তাকে জড়িয়ে ধরে, কোনো দিন আর তাকে ছাড়ানো যায় না।

আমার চোখে তখন পাহাড়-পর্বত মাত্রেই অতি সম্ভ্রমের বস্তু। সম্ভবত এই জন্যই সাহেবগঞ্জ আমার চোখে খুব ভাল লাগল, কারণ এখানেও যতদূর

চাই, পাহাড়শ্রেণী পূবপশ্চিমে সীমাহীন বিস্তৃত। এবং সে পাহাড়ও কুয়াসায় কিছু ঢাকা কিছু খোলা। তাতে ঘননীল ঘন সবুজ আর ঘন বেগুনীর মিশ্রণ। পাহাড়ের কোলে সমতল বহুপ্রশস্ত মাঠ সবুজঘাসে ঢাকা, তার বুকে আঁকাবাঁকা চলার পথ। সে সব পথ দূর পাহাড়ে মিলিয়ে গেছে। শুনলাম সাঁওতালরা আসে ঐ সব পাহাড় পার হয়ে, সেখানে তাদের বাড়ি আছে পাহাড়ের তলে তলে। সাঁওতালও এই প্রথম দেখলাম, দার্জিলিঙের ভুটিয়া লেপচার কালো সংস্করণ। সুতরাং এও অভিনব। দার্জিলিঙের পরেই হঠাৎ সমতল বাংলার জমিতে এসে শেষ অবধি দার্জিলিঙকে একটি স্বপ্ন ব'লেই মনে হয়েছিল। একটি স্পর্শযোগ্য বস্তু যেন ছুঁতে না ছুঁতে হাতছাড়া হয়ে গেল। সাহেবগঞ্জের পাহাড় দেখে সে দুঃখ কিছু ভুলতে পেরেছিলাম। যেন এ একটা কতবড় আশ্রয়। আজন্ম সমতলে বাস ক'রে হিমালয়ের মতো এমন মহিমময় বিরাটত্বের উপলব্ধি চট ক'রে হয় না। মনে তার ছাপমাত্র পড়েছিল একটা সুখস্বপ্নের মতো। দেখার আগে ছিল স্বপ্ন, দেখার পরেও তা স্বপ্ন হয়েই রইল। চেতনায় তা সত্য হয়ে উঠতে অনেক দেরি হ'ল। মনের মধ্যে তাকে একটু একটু ক'রে গড়তে লাগলাম। সাহেবগঞ্জের পাহাড় একটা ধাপের কাজ করল মধ্য পথে এসে। তাই সাহেবগঞ্জ ভাল লাগল!

বাসস্থান ঠিক হ'ল স্কুলের বোর্ডিং হাউস। এই বোর্ডিং হাউস সম্পর্কে আমার কোনো আনন্দের স্মৃতি নেই। খাওয়া-দাওয়া এবং পরিবেশ ভাল লাগেনি। কিন্তু আমার মধ্যকার সেই অসুখী বালকটি নীরবে সব মেনে নিল সাহেবগঞ্জে পাহাড় ছিল ব'লে।

দুধবার্লি ও প্রাতর্ভ্রমণ ছিল ব্যবস্থা, কিন্তু বার্লি বাদ দিয়ে চলতে হ'ল। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি যুক্তি ছিল, এবং জ্বরে খাওয়া বিষয়ে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও জন্মেছিল, আগে বলেছি। সে হচ্ছে জ্বর সত্ত্বেও খাওয়ার রুচি থাকলে খাওয়ায় ক্ষতি হয় না, কিংবা কি ক্ষতি হয় তা আমার অজ্ঞাত। অতএব প্রবোধের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা ব্যবস্থা করা গেল এই যে, সকালে উঠে তার সঙ্গে আমি আধ মাইল দূরে গোয়ালাপাড়ায় যাব এবং সেখানে গিয়ে শুধু দুধ খেয়ে ফিরে আসব। একসঙ্গে পথ্য এবং প্রাতর্ভ্রমণ।

কিন্তু এ ব্যবস্থা চার পাঁচ দিন পরে আর ভাল লাগল না। নিয়মিত বিধিপালন আমার কাছে সুখের ছিল না। কাছাকাছি খাবারের দোকান ছিল, সেখানে বেলা প্রায় ৮টায় গরম দুধ পাওয়া যেত। কিন্তু সকালে উঠে না খেয়ে বেলা ৮ টা বাজতে দেওয়া আমার পছন্দ হ'ল না। আমি সাড়ে সাতটার মধ্যে দোকানে চ'লে আসতাম। দুধ তখন মিলত না, গত দিনের রাবড়ি (মালাই) মিলত। দুধবার্লি থেকে আগেই বার্লি বাদ গিয়েছিল, এবারে দুধও বাদ গেল, রইল শুধু সর। দুধের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই হ'ল। কিন্তু কয়েকদিন পরে এটিও একঘেয়ে লাগাতে রসগোল্লা, সন্দেশ, পান্তুয়া অথবা পেঁড়া। ভেবে দেখলাম দুধ বাদ দিয়ে এর একটিও গড়া যায় না, অতএব আমার বিবেক বেশ সুখে দিন কাটাতে লাগল। সাহেবগঞ্জে প্রবোধের বন্ধু হিসেবে কয়েকজন বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে তখন পরিচয় ঘটেছিল, তার মধ্যে সুধাংশুশেখর মজুমদারকে সবচেয়ে বেশি মনে আছে। তিনি বটুদা নামে খ্যাত, তখন সম্ভবত কলেজে প্রথম ঢুকেছেন। এখন তিনি সমাজসেবী সন্ন্যাসী মানুষ। তিনি প্রবোধেরও বটুদা, তাই সবার শ্রদ্ধেয় ছিলেন, কারণ প্রবোধ নিজেও অনেক শিষ্য পরিবৃত ছিল, সেও ছিল তাদের প্রবোধ দা। সাহেবগঞ্জে পরে অনেকবার গিয়েছি এবং পরে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

শীতকাল, মনে আছে। ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাস। বোর্ডিং হাউস থেকে আমার চলে আসার সময় মনিহারীঘাট থেকে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মাইনর পাস ক'রে সাহেবগঞ্জে এসে ভর্তি হল, এবং ঐ বোর্ডিং হাউসে এসে উঠল। হয় তো একদিনের পরিচয় ঘটেছিল সে সময়। বলাইচাঁদের কবিতার খাতার নাম ছিল 'বনফুল'। সে সেই খাতার নাম নিজে গ্রহণ ক'রে খাতা ছেড়ে তখনই প্রকাশ্যে বেরিয়েছে কি না, মনে নেই। তখন আমরা কেউ জানি না পরবর্তী জীবনে আমরা পরস্পর এত কাছে এসে পড়ব।

সাহেবগঞ্জে এক মাস ছিলাম, কিন্তু কোনো পরিবর্তন হ'ল না স্বাস্থ্যের। জ্বর লেগেই রইল। তখন (সম্ভবত জীবনে এই দ্বিতীয় বার) নিজের পরিণাম চিন্তা করতে লাগলাম। বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদানপ্রদান হ'ত নিয়মিত। বেশ মনে আছে ফণী (সম্ভবত তখন কুষ্টিয়াতে) লিখেছিল,

তার ভাবার্থ—দার্জিলিঙের মতো স্বাস্থ্যকর স্থানে থেকে এসেও এত ভুগছ? চিঠি লেখা তখন ইংরেজীতেই চলত।

সাহেবগঞ্জে আর থাকা সম্ভব নয়, ক্লাস-নাইনে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে সোজা দার্জিলিঙ গিয়েছি, এবং তারপর ১৯১৪ সালের জানুয়ারি এসে গেছে, এখনও বাইরে বাইরে কাটাচ্ছি। তাই এবারে মন খারাপ হয়ে গেল। এবারে সিরীষাস। ফেরবার পথে কলকাতা থেকে নতুন ক'রে ওষুধ কিনলাম এবং ঐ সঙ্গে একটি 'প্রাইমাস-১০০' স্পিরিট, ও একটিন বিলিতি বার্লি কিনে নিয়ে রতনদিয়াতে এলাম। ঠিক করলাম এইখানে কিছুদিন থেকে শুধু সকালের দুধবার্লিটি নিজহাতে তৈরি ক'রে নেব, এবং অন্যান্য নিয়ম সবই পালন করব কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার অল্পদিনের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে গেল এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলাম। হয় তো বা এর পিছনে এতদিনের হাওয়া-বদল কিছু কাজ করেছে। এ সবের ঠিক ব্যাখ্যা কি, তা হয় তো কারোই জানা নেই, দেহ বড়ই খামখেয়ালি।

যাত্রা করলাম সাতবেড়ের উদ্দেশে। সঙ্গে ছিল হরেন্দ্রকুমার।

গোয়ালন্দ ঘাট থেকে স্টীমারে যাত্রা, হরেন্দ্রের আত্মীয় বাড়ি ছিল সাতবেড়েতে। আমরা বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা আন্দাজ সময়ে ওযান আপ প্যাসেঞ্জারে গোয়ালন্দে এসে পৌঁছলাম। স্টীমার যে কখন ছাড়বে তার স্থিরতা নেই, শুনলাম শেষরাত্রে ছাড়বে সমস্ত দিন কি করা যায় ভাবছিলাম, এমন সময় হরেন্দ্র বলল রান্না ক'রে সময় কাটানো যাক। বাজার থেকে মাটির হাঁড়ি চাল ডাল মশলা কিনে স্টোভে রান্না হ'ল পদ্মার ধারে। হাওয়াতে কিছু অসুবিধে হয়েছিল কিন্তু দমিনি। সন্ধ্যায় গিয়ে উঠলাম স্টীমারে এবং একটি গরম জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে রইলাম, যখন ইচ্ছে ছাড়ুক আর ভয় নেই। সকালে ব'সে ব'সে আব্রাহাম লিংকন বইখানা স্টীমারে পড়েছিলাম যতটা সম্ভব।

এই বছরেই গ্রীষ্মের ছুটিতে রতনদিয়াতে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লর সঙ্গে পরিচয় হয়। সে কাশীতে ম্যাট্রিকুলেশন পড়ত, অর্থাৎ আমার সমান সমান। সে আকর্ষক চরিত্র ছিল। তখনকার দিনের তরুণ সন্ত্রাসবাদীদের চালচলনে যে সব রহস্য এবং চরিত্রে যে সব গুণ থাকা দরকার, তা তার ছিল। ভাল স্বাস্থ্য, খেলাধুলায় অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং পটু,

সাঁতারের সকল কৌশল জানে, গাছের ডালে ডালে বেড়াতে পারে, দৌড়ে ওস্তাদ, পড়াশোনায় খুব গভীর এবং দুষ্টুমি বুদ্ধিতে মনোহর। আবরণ ভেদ করলে আদর্শবাদীকে দেখা যায়। পুলিসের সাস্‌পেক্ট হয়েছে তখন থেকেই। তার দৈনন্দিন ডায়ারি লেখা হচ্ছে পাংশা থানায় (এর পরে তার সঙ্গে সর্বদা পুলিস থাকত)। রতনদিয়া পাংশা থানার অধীন।

প্রফুল্ল বর্তমানে ঝাঁসি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানের বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে কাজের ভিতর দিয়ে সে সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। একবার সে কলকাতায় আগত হকি টীম ঝাঁসি ইলেভেনের নেতৃত্ব করেছিল।

প্রফুল্ল গ্রামে একটি নতুন হাওয়া বইয়ে দিল। সে এলে প্রবোধ প্রতিষ্ঠিত স্পোর্টিং ক্লাব খুব উৎসাহিত হয়ে উঠত, এবং রতনদিয়ার তরুণদের মধ্যে আধুনিক যুগের এক রোম্যান্টিক উদ্দীপনা এবং নবজাগরণের এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ জেগে উঠত। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, খেলা, হাতেলেখা কাগজ বার করা, এবং আধুনিক জগতের নানা বিষয়ের আলোচনায় সবার মধ্যে বেশ একটা সাড়া প'ড়ে যেত। বাইরে থেকে সবাই নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য বহন ক'রে এসে মিলত দীর্ঘ ছুটির মধ্যে। পুরো দেড়মাস ধ'রে সে কি উন্মাদনা। প্রফুল্লর কাছে ন্যাচর‍্যাল ফিলসফি নামক মোটা এবং সুচিত্রিত একখানা পদার্থবিদ্যার বই দেখি, এবং তা থেকে ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম প্রভৃতি বিষয়ে কৌতূহল চরিতার্থতার সুযোগ পাই।

সাঁতারের কিছু কৌশল শিখলাম প্রফুল্লর কাছ থেকেই। জলে দেহ সম্পূর্ণ শিথিল ক'রে, দুখানা হাত টান ক'রে সোজা উত্তর মেরুর দিকে ফিরিয়ে চিৎ হয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে জলে ভেসে থাকাও শিখলাম। চন্দনা নদীর বদ্ধ জলে নতুন জল পদ্মা থেকে আসে আষাঢ়ের মাঝামাঝি তার আগে নদী প্রায় শুকনো, স্রোতোহীন, অনেক সময় শ্যাওলায় ভরা। গ্রীষ্মের সূর্যে জল গরম হয়ে উঠত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে আমাদের সাঁতার খেলা চলত দু তিন ঘণ্টা। বর্ষায় চন্দনার আর এক রূপ। তখন সে খরস্রোতা, তার জল বর্ষায় পদ্মার মতো গেরুয়া রঙের। নিতান্তই ঘরোয়া পোষা নদীটি, বছরে একবার জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখন সে সবার আদরে

আদরে অস্থির। বর্ষায় একবার স্রোতের মুখে এক মাইল অবধি গিয়েছিলাম। মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়েছিল, তার পর থেকে দীর্ঘ সাঁতারের আর চেষ্টা করিনি।—রতনদিয়া থেকে পদ্মা নদী তখন দেড় মাইল দূরে। আমরা অনেক সময় বেড়াতে যেতাম সে দিকে। আবার সেই পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ। এমনি ভাবেই এক একটা দেশের সঙ্গে পরিচয়। তার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে এমনি ক'রে। তখন বোঝা যায় না, কিন্তু ছেড়ে এলে বোঝা যায় সে শুধু ছেড়ে আসা নয়, ছিঁড়ে আসা।

নানা বিষয়ে জানবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল স্কুল জীবনে। ক্ল্যাস-নাইনে থাকতে ডাকে সাহেবী দোকান থেকে বই আনিয়ে পড়তাম। ম্যাকমিলান কম্পানি থেকে অ্যাচীভমেন্টস ইন কেমিক্যাল সায়েন্স ও দি ওয়াণ্ডার্স অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স এ দু খানি বই আনিয়েছিলাম ভি. পি. তে। স্টুডেণ্ট নামক একখানি ইংরেজী মাসিক পত্র বেরোয়। ১৯১৩ কি ১৪ মনে পড়ছে না। প্রথমে এক সংখ্যা নমুনা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। আমার যত দূর স্মরণ হয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই কাগজের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, এবং তিনিই চিঠি লিখেছিলেন। 'পীপস অ্যাট মেনি ল্যাণ্ডস' পর্যায়ের কয়েকখানা বই পড়েছিলাম এ সময়ে। করসিকা ও জাপান মনে আছে। এই সময়েই একবার রাজবাড়ি স্টেশনে হকারের কাছ থেকে একখানা বই (দাম দু পয়সা বা চার পয়সা) কিনি, বইখানার নাম "দি ওয়াণ্ডারফুল হাউস উই লিভ ইন।" দেহের পরিচয়, পাতায় পাতায় ছবির সাহায্যে কঙ্কাল স্নায়ু রক্ত চলাচল প্রভৃতি দেহের রহস্য গল্পের ভঙ্গিতে উদ্‌ঘাটিত। মিশনারি বই। এই বইখানা আমাকে মুগ্ধ করল। দেহ-খাঁচার মূল পরিকল্পনা দেখে আত্মারাম উল্লসিত হ'ল।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল ১৯১৪ সালের অগস্ট মাসের গোড়ায়—সারায়েভো-হত্যাকাণ্ডের কিছু পরেই। সেখানে আর্চডিউক ফার্ডিনাণ্ড নিহত হলেন সস্ত্রীক। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, জার্মানি করল রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং তার পরেই ব্রিটেন করল জার্মানির বিরুদ্ধে। তার পর আরও অনেকে এলো।

এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের জনসাধারণের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। তারা

ব'সে ব'সে কেবল গুজব রটাত। যারা কাজের লোক তারা অবশ্য নীরব তৎপরতায় এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছিল। তার পর ১৯১৬ সালে যখন বাঙালী তরুণদের ডাক পড়ল যুদ্ধ ক্ষেত্রে, তখন বাঙালী জাতির যেন আরও একটা জাগরণের যুগ এলো। প্রথম বাঙালী দল ফরাসী চন্দননগর থেকে গেল যুদ্ধে, তার পর ব্রিটিশ বাংলার ডাবল কম্পানি, ফর্টিনাইনথ রেজিমেণ্ট। গ্রামে গ্রামে রিক্রুটমেণ্টের উৎসাহ, যুদ্ধের চাঁদার উত্তেজনা।

রতনদিয়ার কুমুদপ্রসন্ন রায়, পুলিসে চাকরি করত, কিন্তু এক মারামারি কেস-এ প'ড়ে অল্প মেয়াদি জেল হয়েছিল। জেল থেকে মুক্তি পাবার পরই সে চারুপ্রসন্ন রায় হয়ে যোগ দিল বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে। ল্যান্স নায়েক বেশে তাকে দেখেছি অনেকবার। রাজবাড়ির সাব-ডিভিশনাল অফিসার অ্যালফ্রেড বোস যুদ্ধোদ্যমে ভীষণ উৎসাহী ছিলেন, তিনি মাঝে মাঝে রতনদিয়াতে আসতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। কিন্তু এ আরও কিছু পরের কথা।

টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে পড়ায় মনোযোগী হলাম। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে পরীক্ষায় বসলাম পাবনা শহরে। আমাদের সময়ে ইংরেজি বা বাংলা কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্য ছিল না। নির্দিষ্ট বই ছিল সংস্কৃত। ক্লাস-নাইন ও টেন্-এ ইংরেজি পড়েছি লালবিহারী দের ফোক টেলস অফ বেঙ্গল, লেজেণ্ডস অব গ্রীস অ্যাণ্ড রোম, লাহিড়ি'স সিলেকট পোয়েমস। অতিরিক্ত নিয়েছিলাম সংস্কৃত ও ভূগোল। অঙ্ক জলের মতো সোজা ছিল তখন।

জুলাই মাসে এলাম রাজসাহী কলেজে ভর্তি হতে, যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে নাটোর থেকে মোটরে যেতে হ'ল। রাজসাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সেটি তাঁর শিষ্যালয়। অতএব ওখানে থাকার ব্যবস্থা হল। ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান পড়ব, কিন্তু অঙ্কে পিছিয়ে আছি, তাই আই. এ. তে একটি অন্তত বিজ্ঞানের বিষয় নেওয়া যায় কিনা চেষ্টা করলাম। কর্তৃপক্ষ বললেন আই. এসসি ছাত্রদের ভর্তি শেষ হওয়ার পর যদি জায়গা থাকে তা হলে কেমিস্ট্রিতে আমার নাম দিয়ে দেবেন, কিন্তু তার আগে ইতিহাস নিয়ে আই. এ তে ভর্তি হতে হবে। তাই হয়েছিলাম। কিন্তু এক মাস পড়ার পর জানা গেল জায়গা খালি নেই।

আমার রাজসাহীতে থাকা হ'ল না। এখানে সাগরপাড়ায় একটি

বাড়িতে আরও কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে থাকতাম। সকালে গোয়ালাদের ছেলেরা মাখন ফেরি ক'রে বিক্রি করত। ঘরে তৈরি, বলের মতো গড়া, চার পয়সায় একটি বল, ওজন অন্তত এক ছটাক হবে। ভোরে সবাই মিলে ঐ মাখন খেতাম চিনি দিয়ে। খাবার সর্বত্র খুব শস্তা। এ রকম পরিবেশে প্রবাসের দুঃখ কোথায়? আমরা কয়েকজন স্নান করলাম পদ্মা নদীতে। একটু দূর হওয়া সত্ত্বেও ভাল লাগত। বর্ষাকাল, তখন ভীষণ স্রোত। সাঁতার কাটতে গিয়ে একদিন প্রবল স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বিপদ আরও বেড়ে গেল। তখন বুদ্ধি ক'রে স্রোতের সঙ্গে ভেসে তীরের দিকে একটু একটু ক'রে এগিয়ে সিকি মাইল দূরে গিয়ে উঠেছিলাম। উঠে ভীষণ কেঁপেছিলাম মনে আছে।

রাজসাহী থাকা হ'ল না, কিন্তু ফেরবার সময় একটি বড় জিনিসের স্মৃতি বহন ক'রে আনলাম সঙ্গে। সে হচ্ছে কিশোরীমোহন চৌধুরীর স্মৃতি। তাঁর সম্পর্কে আমার আগে কিছুই জানা ছিল না। শুনেছিলাম তিনি ছাত্রদের অনেক সাহায্য করেন, এবং তাদের জন্য দেনাগ্রস্তও হয়েছেন। দানের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো হিসেব নেই। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র তাঁর বাড়িতে আশ্রিত। একটা লম্বা ঘরে দু সারিতে ব'সে ছাত্ররা খাচ্ছেন, তিনিও খেতেন প্রায় ঐ সময়। দু সারের মাথায় একটু দূরে বসতেন। আমি বসতাম তাঁর বাঁ পাশে। ঠাকুর পরিবেশন করছে। খাওয়া কিছু এগিয়েছে--ঠাকুর পুনরায় কিছু মাছ বা মাছের ডিম দিতে এলো কিশোরীমোহনের পাতে—তিনি হাত তুলে বলে উঠলেন—না না আমাকে আর নয় ওদের দাও। ছাত্রদের দিকে দেখিয়ে দিলেন। ঠাকুর এটি জানত। তবু বেশি থাকলে জিজ্ঞাসা করতে বাধা কি, এই রকম ভাব। একদিন আম দিতে এলেও ঠিক ঐ ভাবেই নিজে এক টুকরো অতিরিক্ত খেতে অস্বীকার করলেন। চোখে না দেখলে এমন একটি দুর্লভ জিনিস আমার অজানা থেকে যেত। ধনীর দান বা চ্যারিটি সম্পর্কে আমার যে ধারণা তার সঙ্গে এর আদৌ মিল ছিল না। এ ঘটনা আমাকে খুব বিচলিত করেছিল, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। শুভ্রকেশ কিশোরীমোহনের ছবিটি শুভ্র তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের ছবিটিকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল সে দিন।

গেলাম। শেষে আমার নামের সঙ্গে শুধু পাবনা জুড়ে দিলেই চলত। একটি জেলাশহরে নবাগত আমার এ বিষয়ে বেশ একটা গর্ব ছিল।

আমার দৃষ্টিশক্তি ছেলেবেলা থেকে ক্ষীণ ছিল, কম দেখতাম অনেক, কিন্তু তা নিয়ে ভাবনা করিনি কখনো। ছোট বেলায় স্টীমারের নাম পড়া নিয়ে আমি হেরে যেতাম। বন্ধুরা অনেক আগে পড়তে পারত, অনেক কাছে এলে তবে আমার পক্ষে পড়া সম্ভব হত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে এসে এক বন্ধুর চশমা হঠাৎ চোখে দিয়ে দেখি দুনিযা সুন্দরতর। তখন থেকে ইচ্ছা ছিল চশমা নিতে হবে। বাবা কখনো চশমা ব্যবহার করেন নি। দূরের জন্যও না, কাছের জন্যও না। আমরণ বিনা চশমায় পড়াশোনা করেছেন। তাই চশমার মর্যাদা বুঝিনি। এবারে পাবনায় এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান চশমাওয়ালা এসে বাসা বাঁধল কিছু দিনের জন্য। তাঁর কাছে গিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা নিলাম। '-১'৫' পাওয়ারের চশমা। নতুন আলো এলো জীবনে।

পাবনা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রাধিকানাথ বসু—আর. বোস নামে খ্যাত। ইংরেজী গদ্য পড়াতেন। ইংরেজী কাব্য পড়াতেন সুরেন্দ্রনাথ রায়। কেমিস্ট্রি পড়াতেন জগদীশচন্দ্র দাস। লজিক, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। সংস্কৃত, হেমচন্দ্র রায়। আর. বোসের ইংরেজী বলবার ভঙ্গি বেশ মনোহর ছিল। হেমচন্দ্র রায় সংস্কৃতকে খুব চিত্তাকর্ষক করতে পারতেন। শিশুর মতো সরল এবং আপন বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অধিকার ছিল। আমাদের ইংরেজী পাঠ্য ছিল কাভার্লি পেপার্স, (স্টীল, অ্যাডিসন) দি ক্লইস্টার অ্যাণ্ড দি হার্থ (চার্লস রীড), ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কতকগুলি কবিতা, কোলরিজের এনশেণ্ট মেরিনার, মিল্টনের সনেট, কুপারের টাস্ক (এক সর্গ) সংস্কৃত ভট্টিকাব্যম্, রঘুবংশম্, দশকুমারচরিতম্, সবই আংশিক। কেমিস্ট্রি পি. সি. রায়; লজিক এ. সি. মিত্র।

কলেজ বসত ছোট্ট একটি একতলা পুরনো বাড়ি ও তার সংলগ্ন একটি টিনের আটচালা ঘরে। তবু তো এডওয়ার্ডের স্মৃতি বুকে জড়িয়ে আছে। অল্পদিনের মধ্যেই এর পরিবেশের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে উঠল। মাইনর স্কুলে ছেড়ে-আসা বন্ধুদেরও দু এক জনের সঙ্গে দেখা হল।

পাবনা থেকে কুষ্টিয়া একখানা স্টীমার যাতায়াত করত। পথের দৈর্ঘ্য বারো

মাইল কিংবা ঐ রকম। পদ্মা থেকে বেরিয়ে একটি নদী কুষ্টিয়ার পাশ দিয়ে যশোর জেলায় গিয়ে প্রবেশ করেছে, সে নদীর নাম গড়াই বা মধুমতী। কুষ্টিয়া থেকে স্টীমারে চ'ড়ে সেই নদী পথে প্রথমে পদ্মায়, তারপর সেখান থেকে ডান দিকে ঘুরে পাবনার দিকে যাওয়া। গড়াই নদী কুষ্টিয়া স্টেশন থেকে দু মিনিটের পথ।

কলেজে আমার প্রথম পুজোর ছুটি, পাবনা থেকে রাত্রিবেলা সেই পথে কুষ্টিয়াতে এসে ঢাকা প্যাসেঞ্জার ধরব। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র আর অধ্যাপকে স্টীমার বোঝাই। আশ্বিন মাস। বর্ষার ভরা নদী, দুকূল হারা। স্টীমার ছাড়বার কিছু পরেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে এলো। অনেকক্ষণ ধ'রে একটা গুমোট ভাব। রাত তখন হয় তো দশটা হবে। কালো আকাশ, কালো জল। নদীর কোথায় আছি জানি না। মাঝারি সাইজের দোতলা স্টীমার। নিরন্ধ্র অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুক চিরে আঁকা বাঁকা বিদ্যুৎ ঝলকে লাগল মুহুমুহু। প্রবল গর্জন আকাশ কাঁপিয়ে তুলছে। খোলা নদীর মেঘে ঢাকা বুকে তার প্রতিধ্বনি অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ ক'রে তুলছে। বিদ্যুতের আলোতেও এপার ওপার ঠাহর হয় না।

ঝড় উঠে এলো অতি প্রবল বেগে। সঙ্গে তীরের মতো ঠাণ্ডা বৃষ্টির তীর। স্টীমার দুলে উঠল প্রথম ধাক্কাতেই। স্টীমারের উপরের ছাউনি মড় মড় ক'রে উঠল। একটার পর পর একটা উন্মত্ত ঢেউ এসে ভেঙে পড়তে লাগল একতলার ডেকে। বৃষ্টির ছাট বন্ধ করবার জন্য ঝড়ের দিকে চটের পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল দোতলায়, কিন্তু ঝড়ের যা বেগ তাতে পর্দা ঝোলানো থাকলে স্টীমার যে-কোন মুহূর্তে কাৎ হয়ে তলিয়ে যাবে। আমি স্তম্ভিতবৎ দাঁড়িয়ে আছি মাঝামাঝি জায়গায়, চিমনির জন্য ঘেরা জায়গা থেকে একটু দূরে। দেখছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই হিম-শীতল বৃষ্টির আঘাত সমস্ত দেহ জর্জরিত করছে। দেখছি, কিন্তু কিছুই করছি না। কয়েক পা স'রে গেলে চিমনি-ঘরের আড়ালে গিয়ে বাঁচতে পারি, কিন্তু এক পা সরবার প্রবৃত্তি নেই—পাথরের মতো অচল ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি! কানে আসছে—অধ্যাপক ছাত্রদের ভয়ার্ত কণ্ঠে বলছেন এই তো শেষ—বিদায় বন্ধুরা। সব কথা কানে আসছে, কিন্তু মর্মে প্রবেশ করছে না।

লাইফ বয় লাগানো আছে, স্টীমার ডুবলে তা ধ'রে ভাসা যায়, কিন্তু কোনো ইচ্ছেই নেই।

চিন্তার এমন একটি পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা সচেতন অবস্থায় যে সম্ভব তা জানতাম না। মন তার পাত্র থেকে যেন গড়িয়ে নিচে প'ড়ে গেছে। আমি তখন সকল সুখ দুঃখ সকল ভাল মন্দের ঊর্ধ্বে, জীবন মৃত্যুর ঊর্ধ্বে, ভয় ভাবনার ঊর্ধ্বে। প্রায় এক ঘণ্টা ঝড় চলেছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে থেকে এক পা নড়িনি, ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজেছি। শীতের কাঁপুনি আরম্ভ হয়েছিল ঝড় থেমে যাবার পর। পরে বুঝতে পেরেছি অনেকেই আমারই মতো চিন্তাশূন্য ছিল। উপায় নেই, এমনই হয়। যেখানে ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছার কোনো দাম নেই, সেখানে ইচ্ছা অসাড় হয়েই নিজের মান বাঁচায় এই ভাবে।

অনেকক্ষণ পরে মনে হয়েছিল সারেঙের কথা। এত বড় বিপদে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি স্টীমারকে তাঁর সমস্ত চালনা নৈপুণ্য দিয়ে ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। বিস্ময়ে মন ভরেছিল, কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়েছিল।

মৃত্যু সম্পর্কে এই উদাসীনতা সম্ভবত ভয়ের শেষ অবস্থা। একদিন অবহিত হলাম। ভয়ে এ রকম জীবন্মৃত হয়ে যাওয়াতে নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব এলো। একদিন সচেতন হলাম—মনের কোমলতা দূর করতে হবে। দেবদেবতা অপদেবতা প্রভৃতি আমার মনে কোনো দিনও স্থান পায় নি, ছেলেবেলা থেকেই এ বিষয়ে উদাসীন, এবং সবাই মানে ব'লে আমি স্বতন্ত্র ছিলাম। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব অনেক যুক্তি ছিল। এবারে এই ঝড়ের পর থেকে আবার আমার মনোযোগ এদিকে গেল।—ভয় ছাড়তে হবে। কিন্তু কি ভাবে? সব বিষয়ে, অন্তত নিজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত নয় এমন সব বিষয়ে, নিস্পৃহ না হ'তে পারলে অকারণ ভয় বা নার্ভাসনেস ছাড়া যাবে না। অতএব যে-কোনো ভয় পাবার মতো বিষয়ে আগে এগিয়ে যেতে হবে। বাড়ির কাছে নতুন রেল পথে এঞ্জিনে চাপা-পড়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মানুষকে দেখলাম পর পর তিন চারটি। খুব কাছে গিয়ে মাথার ভাঙা খুলির মধ্যকার মগজ কেমন দেখায়, তা আমার পড়া সেই শারীর-তত্ত্ব বিষয়ের ইংরেজী বইখানার সঙ্গে কতটা মেলে, দেখলাম। ছিন্ন

হাত পায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখলাম মনকে প্রস্তুত ক'রে। আগে এ রকম কল্পনায় মন বিদ্রোহ করত, কিন্তু মনস্থির করলাম যুক্তি দিয়ে। সে যুক্তি বৈজ্ঞানিকের চেয়ে দার্শনিকই বেশি ছিল। আজও সে দৃষ্টি আমি সম্পূর্ণ হারাইনি, যদিও মনের সে অবস্থা আর নেই।

মৃতদেহের খণ্ডিত অংশের সঙ্গে এমন চাক্ষুষ পরিচয়ে মনে বেশ একটা জোর অনুভব করতে লাগলাম। এর কিছুদিন পর এক দুর্দান্ত পাগল হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে গ্রামের প্রান্তে এক বুড়িকে বঁটি দিয়ে কেটে ফেলল। হৈ হৈ চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম। খুব কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম কি পরিমাণ কাটা। মনের এ রকম আশ্চর্য পরিবর্তন আমার ভাল লাগল। কালুখালি স্টেশন থেকে উঁচু রেলপথ ধ'রে একদিন শেষ রাত্রে একা ফিরলাম বাড়িতে (১৫ মিনিট হাঁটা পথ)। যে রেলের উপর রক্তাক্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মানুষকে দেখেছি দিনের বেলায়, সেই পথের উপর দিয়ে রাত দুটোর সময় একা চলেছি হেঁটে। মনে ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না। এর পর থেকে মৃতপ্রায় রোগীর বিছানায় গিয়ে বসতে আরম্ভ করলাম। থার্মোমিটারে তাপ দেখে তার সঙ্গে নাড়ীর গতির সম্পর্ক পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলাম। এ সবই নিজের মন থেকে। সবই কৌতূহল থেকে। অভিজ্ঞতা লাভের নিজস্ব উপায়। মুমূর্ষু রোগীর পাল্‌স্ ধ'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি ঘড়ি সামনে নিয়ে। ক্ষীণ পাল্‌স্ মিনিটে ১৩০ চলেছে, কিন্তু থার্মোমিটারের পারা এক ধাপও ওঠে না। হাত পা ঠাণ্ডা, নাড়ীর গতি এলোমেলো, পাওয়া যায় কি যায় না, তার পর সব থেমে গেল। গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজও ঐ সঙ্গে নীরব। তিনটি বৃদ্ধের ক্ষেত্রে এই একই ব্যাপার দেখলাম। শ্মশানে গিয়েছি ইচ্ছে ক'রে। পোড়ানো খুব কাছে ব'সে ব'সে দেখেছি। মনে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। জগতের সমস্ত স্বাভাবিক ঘটনার সঙ্গে এ সব মিলিয়ে দেখেছি। এ সব অবশ্য তখন থেকে পরবর্তী তিন বছর ব্যাপী প্রয়াসের কথা।

ভূতের ভয় নামক কোনো ভয়ের যে কোনো অস্তিত্ব নেই আমার মনে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। পাবনা থাকতে কালীচরণ সেনের বড় বাড়িতে আমাকে দু তিন রাত্রি সম্পূর্ণ একা থাকতে হয়েছিল এক সময়। কিছু মাত্র ভয় হয় নি। মজা ক'রে অন্যকে ভূতের ভয় দেখিয়েছি।

সামান্য সাজের কৌশলে যে-কোনো লোককে ভীষণ ভয় দেখানো যায় রাত্রে।

পূজোর ছুটির শেষে পাবনা রওনা হয়ে গেলাম, কুষ্টিয়ায় পৌঁছলাম সন্ধ্যা প্রায় ছটায়। কিন্তু আকাশে দেখি মেঘ ঘনাচ্ছে। স্টেশন থেকেই অনেক রাত্রে ঢাকা প্যাসেঞ্জারে ফিরে এলাম, পাবনা যাওয়া তখন আর হল না। এক মাস আগের ঝড়ের কথা মনে এলো। যে ভয়ের কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ খাটে না, সে ভয় জয় করা কঠিন।

কিছুদিন পরে ফিরলাম পাবনা এবং এবার হস্টেলে জায়গা পেলাম। এই আমার প্রথম হস্টেল জীবন। ভাল লাগল খুব। গঙ্গেশ চক্রবর্তী পাবনার বিশিষ্ট উকিল ছিলেন তিনি পাবনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে ছিল আমাদের হস্টেল। একতলা বাড়ি, বাড়ির সামনের উঠনের দু পাশে দু খানা বড় টিনের ঘর। ডান দিকের একখানা ঘরে সাত আট জন ছাত্রের সঙ্গে একটা সীট পেলাম।

বাড়ির পিছনে ইছামতী নদী, এই নদীতেই স্নান করতে ভাল লাগত। বাড়ির ভূতপূর্ব মালিকের দুই পুত্র প্রবোধানন্দ ও অতুলানন্দ চক্রবর্তী ঐ হস্টেলেই থাকত। আমাদের সবার বেশ একটা সজ্ঞ জীবন গ'ড়ে উঠেছিল এখানে। নানা চরিত্রের বিচিত্রতা বড়ই লোভনীয় ছিল। তারাপদ সান্যাল ছিল ভীষণ আমুদে লোক। চমৎকার গান গাইত, বাঁশি বাজাত। হৈ হৈ করা ছিল তার অভ্যাস। সে সমস্ত দিন অন্যদের পড়া নষ্ট ক'রে নিজে সমস্ত রাত জেগে পড়ত। দুষ্টুমি বুদ্ধিতে ভরা।

একবার হস্টেল সার্চ হল—রাজদ্রোহ এখানে কি পরিমাণ বাসা বেঁধেছে দেখার জন্য। শুধু সবার বাক্স খুলে চিঠিপত্রের সন্ধান। সার্চের ধরন দেখে মনে হয়েছিল কয়েকজন নির্দিষ্ট ছাত্রের প্রতি লক্ষ্য ছিল, কেননা তাদের দিকেই প্রথম এবং প্রধান মনোযোগ ছিল। আমাদের ঘরে আদৌ আসেনি। তারাপদদের ঘরে দুচার জনের বাক্স খোলা হয়েছিল। তারাপদ ছিল বিবাহিত, সে হুঁকোয় তামাক খেত। পুলিসের সঙ্গে সাক্ষী হিসেবে একজন অধ্যাপককেও থাকতে হয়েছিল। তারাপদ বিপদ অনুমান ক'রে তামাকের সরঞ্জাম বাইরে সরিয়ে রাখল। কিন্তু বাক্স খুলতে হল। তারপর পুলিস ও তারাপদ সান্যালের মধ্যে নিম্নলিখিত দৃশ্য অভিনীত হল :

"চিঠি আছে বাক্সে ?"

"আছে," ব'লে তারাপদ একটা চিঠির বাণ্ডিল বা'র ক'রে পুলিসের হাতে দিল। পুলিস তা খুলে একের পর এক তিন চার খানা চিঠিতে দেখলেন 'প্রিয়তমেষু' সম্বোধন এবং স্ত্রীলোকের লেখা। বয়স্ক অফিসার, একটু ঘোঁত ঘোঁত ক'রে বললেন, "এ চিঠি নয়, কোনো বন্ধুর চিঠি আছে ?"

তারাপদ আরও একটা বাণ্ডিল বার ক'রে পুলিসের হাতে দিতে দিতে বলল, "এগুলো বন্ধুর চিঠি।"

পুলিস অফিসার এবারেও বিপন্ন হলেন, বললেন "এও তো দেখছি মেয়ে-ছেলের লেখা, কোনো পুরুষ বন্ধুর চিঠি আছে ?"

তারাপদ খুব গম্ভীর ভাবে বলল, "আজ্ঞে পৃথিবীতে আমার এক শালী ভিন্ন আর কোনো বন্ধু নেই, ওগুলো তারই লেখা।"

পুলিস অফিসার বিরক্ত হয়ে বললেন, "না না, এ সব নয়,"—ব'লে উঠে এলেন সেখান থেকে। অধ্যাপক আগেই ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম তারাপদর কীর্তি।

পাবনায় তখন আহার্য বস্তুর দাম বেশ শস্তা। আমাদের সীটরেণ্ট সমেত দশ বারো টাকার মধ্যে চলে যেত যতদূর মনে পড়ে। হস্টেলে দিনকতক অতিরিক্ত ইলিস মাছ খেয়ে বিরক্ত হয়ে মাস তিনেক নিরামিষ খেয়েছিলাম। সকালে এক হিন্দুস্থানী প্রকাণ্ড কাঠের পরাতে সন্দেশ ও ক্ষীরের লুচি সাজিয়ে নিয়ে আসত হস্টেলে। খুব হাসিখুশি লোকটা, বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করত। আমাকে বলত 'প্রমলবাবু'। তার খাবারের স্বাদ পাওয়ার পর থেকে আমাদের হস্টেল জীবনে এক বিপর্যয় দেখা দিল। আমরা কয়েকজন মিষ্টান্নলোভী, খাবারওয়ালার গলা শুনতে পেলেই, ছুটে বেরিয়ে এসে কাড়াকাড়ি ক'রে সব খেয়ে ফেলতাম। সন্দেশ অনেক আনত, কিন্তু ক্ষীরের লুচি আনত কুড়ি পঁচিশ খানা, তার এক-খানাও অবশিষ্ট থাকত না। অনেক সময় কে কত খেল, কে তার হিসেব করে, বিক্রেতা খুব দিলদরিয়া ছিল, সে সূক্ষ্ম হিসেব গ্রাহ্যই করে না। যার যা খুশি দিলেই চলত। আমাদের দলে মিষ্টান্নপ্রিয়তার দিক দিয়ে অতুলানন্দ ছিল প্রথম শ্রেণীর প্রথম। আর তাকে নিয়ে কি মজাটাই না

করা হ'ত। তার পড়াশোনায় মনোযোগ ছিল বেশ, ভাল ছাত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল উগ্র, কিন্তু পাবনার মতো শহরে বাস ক'রে মিষ্টান্নদুর্বলতার মূলোচ্ছেদ না করতে পারলে সে বাসনা পূরণ হওয়া শক্ত ছিল। বয়সটা ছিল ক্ষীরের লুচির অনুকূল, এবং এর আকর্ষণ যে পাঠ আকর্ষণের চেয়ে বেশি ছিল, তার প্রমাণ প্রতিদিনই পাওয়া যেত।

এতে পড়ার ক্ষতিই শুধু নয়, পকেটের ক্ষতি এবং পাকস্থলীর ক্ষতিও কম হ'ত না। এত খাওয়ার পর আর পড়ায় মন বসত না। এ জন্য অতুলানন্দ একদিন প্রতিজ্ঞা ক'রে বসল—সে আর খাবে না। কিন্তু আমরা যারা প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব না জেনে প্রতিজ্ঞাই করতাম না, সেই আমরা তাকে ছাড়ব কেন। অতএব খাবারওয়ালা এলে ঘরখানাটি গার্ডেন অভ ইডেন কল্পনা ক'রে অতুলানন্দকে প্রলুব্ধ করতে লাগলাম ঈভের ভূমিকা নিয়ে। শয়তান তো আমাদের আগেই ভুলিয়েছে।

আমরা কয়েকজন মিলে অতুলানন্দের মুখের কাছে গিয়ে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সন্দেশ খেতে আরম্ভ করলাম। এক মিনিটের মধ্যেই অতুলানন্দের সংযম ভেঙে গেল, সে ছুটে বেরিয়ে এসে রুদ্ধ আবেগ মুক্ত ক'রে একটার পর একটা সন্দেশ খেতে আরম্ভ করল এবং তা স্বাভাবিক মাত্রা স্বভাবতই ছাড়িয়ে গেল। এ রকম অনেকবার হয়েছে। তার কঠিনতম প্রতিজ্ঞা বার বার ভেঙে গেছে। এই বয়সেই মিষ্টি সম্পর্কে তার এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার মূলে আমরা।

হস্টেল জীবনের বহু বিচিত্র দিক। এমন অনাবিল আর কোথাও পাইনি। পাইনি তার আর একটি বড় কারণ মনে হয় এই যে, এই বাল্যজীবন ছেড়ে যত এগিয়ে এসেছি, আন্তরিকতাও তত যেন এক এক মাত্রা ছেড়ে ছেড়ে গেছে। কলেজ বন্ধুদের সঙ্গে এমন ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ আত্মীয়তা পরবর্তী কলেজ জীবনে আর হয়নি। পাইনি এ রকম, দিইনি এ রকম। সবারই ঐ একই ইতিহাস, সবারই জীবনে বাল্যকালের স্মৃতিটিই সবচেয়ে মধুর। এ মাধুর্য অন্য হাজার রকম মাধুর্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই হস্টেলের স্মৃতিটি তাই মনের মধ্যে এমন ভাবে গুঞ্জন করছে। কেউ সমস্ত রাত জেগে লজিক মুখস্থ করছে, কেউ চিৎকার ক'রে কেমিস্ট্রি পড়ছে, কেউ গান করছে, কেউ গল্পের আড্ডা জমিয়েছে, কেউ নীরবে

অঙ্ক কষছে। একদিন ঠাকুর এলো না, গোপাল চক্রবর্তী এবং আরও কজন ওস্তাদ মিলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। পরিবেশনের সময় গোপাল হঠাৎ ব'লে উঠল, "গামছা প'রে এই ডালের গামলাতেই স্নানটা সেরে নিই।" তার মানে ডাল ও জলে মেলেনি, শুধু জল দেখা যাচ্ছে উপরে। কিন্তু তাতে তৃপ্তি কিছুমাত্র কম হয়নি। সব আহার্যের মধ্যেই যে পরম আত্মীয়তার স্বাদ।

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম চিত্র

মিষ্টান্নের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে আসতে অনেকগুলো দোকান নিরাপদে ডিঙিয়ে আসা সহজ ছিল না। দুই বেলা একই ভাবে বিপন্ন হয়ে শেষকালে একটি সহজ সমাধান আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম নতুন পথে। পাবনায় তখন চার পয়সায় এক সের দুধ। শহরে দাম বেশি স্বভাবতই। আমার সঙ্গে ছিল সেই পুরানো স্টোভ। এই দুয়ের যোগাযোগে বিকেলে একসের দুধ জ্বালিয়ে ক্ষীর ক'রে খেতে লাগলাম। চা খাওয়া তখন অজ্ঞাত ছিল। পাবনায় কোনো চায়ের দোকান দেখেছি কিনা মনে পড়ে না, সম্ভবত দেখিনি। ১৯১৫–১৬ সালের পাবনা শহর!

কিন্তু আমার ব্যবস্থিত জলযোগের সেই নববিধান দিন সাতেকের বেশি টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। নিজ হাতে প্রতিদিনের সংসার করা আমার ধাতে নেই। আমার সবই অব্যবস্থিত, এলোমেলো, বেহিসাবী। নিতান্ত দায়ে না পড়া অবধি হিসাবের খাতায় হাত দিইনি। অতএব গৃহস্থালীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বেঁচে গেলাম। মেস্ রীতিতে হস্টেল চলত। পালা ক'রে এক এক জনকে এক এক মাস মেস্ পরিচালনার ভার নিতে হ'ত। এ কাজটি আমার কাছে একটি বিভীষিকা ব'লে বোধ হওয়াতে এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

বিকেলে কয়েকজনে মিলে বেড়ানো হ'ত নিয়মিত। পদ্মার দিকেই বেশি, কখনো বাজিতপুর ঘাটে, কখনো সার্কিট হাউসের পথে সোজা পদ্মার ধারে, কখনো শহরের উত্তরের শড়কে। ইছামতী নদীর ওপারে রাধানগর গ্রামে তখন এডওয়ার্ড কলেজের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এক দিন সে কলেজ বাড়ির ভিত্তি স্থাপিত হতে দেখলাম। আমরা শেষ পরীক্ষা দিয়ে চলে আসা পর্যন্ত বাড়ি তৈরির কাজ অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল।

যতদূর মনে পড়ে, টাউন হলের অঙ্গনে একদিন গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক

দেখানোর আয়োজন হয়। উচ্চাঙ্গের ম্যাজিক সম্পর্কে তৎপূর্বে কোনো ধারণা ছিল না। বেদেনীদের ভোজবাজি দেখেছি শুধু। ম্যাজিকে আমার ভীষণ আকর্ষণ, অতএব গণপতির ম্যাজিকে টিকিট কিনে ঢুকে পড়লাম। ইলিউশন বক্সের খেলা দেখে বেশ ধাঁধায় প'ড়ে গিয়েছিলাম। অলৌকিকত্বে কোনো বিশ্বাস ছিলনা, অথচ নিজের বুদ্ধিতে কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা নেই, এ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা জাদুকরের রসসৃষ্টির ক্ষমতায় পুলকিত হয়েছিলাম। পর পর তিন দিন দেখলাম, তবু রহস্য রহস্যই থেকে গেল। শুধু এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করলাম যে কৌশল একটা আছেই, শুধু আমার তা জানা নেই। যারা আত্মিক ব্যাপার ব'লে বোঝাতে এসেছিল তাদের সঙ্গে কিছু বিরোধ হয়েছিল মনে আছে।

একটি খেলা খুব উপভোগ্য মনে হয়েছিল। জাদুকর ছোট টেবিলে ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স রেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা বক্তৃতা দিয়ে নিলেন। বললেন, "এর মধ্যে মারাত্মক এক সাপ আছে, এ খেলাটি তাই খুব বিপজ্জনক। দর্শকদের মধ্যে সাহসী যদি কে থাকেন তবে উঠে আসুন।"

একজন সাহসী উঠে গেলেন। একখানা লাঠি তার হাতে দিয়ে জাদুকর বলতে লাগলেন, "আমি ওয়ান, টু থ্রী, বলবার সঙ্গে সঙ্গে এই বাক্স খুলব, দেখবেন একটি প্রকাণ্ড সাপ মাথা তুলে আছে, আপনি বিদ্যুৎ গতিতে তার মাথায় এই লাঠির বাড়ি মারবেন।—একটু দেরি করলে সাপের হাতে মারা পড়তে পারেন—অতএব খুব সাবধান। মনে রাখবেন, সাপকে দেখামাত্র মারতে হবে।"—ব'লে জাদুকর সেই সাহসী লোকটির গায়ের চাদর তাঁর কোমড়ে জড়িয়ে বেঁধে তাঁকে লাঠি উঁচু ক'রে ধ'রে কেমন ক'রে দাঁড়াতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। লোকটি হাজার লোকের সামনে দু পা ফাঁক ক'রে লাঠি উঁচু ক'রে সেই বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে! সে এক অপরূপ দৃশ্য। সমস্ত দর্শক নীরবে, কি পরিণাম ঘটে দেখার জন্য দম বন্ধ ক'রে ব'সে আছে। জাদুকর আবার সাহসী লোকটিকে বললেন, "মনে রাখবেন, ভয় পেলে চলবে না,"—ব'লে তিনি আবার লোকটির উদ্যত ভঙ্গির দাঁড়ানোকে যথাযথ সংশোধন করে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললেন—"কাঁপবেন না—এইবার প্রস্তুত থাকুন—ওয়ান!"

ব'লে জাদুকর নিজেই কিছু কাঁপতে লাগলেন, এবং ভীত স্বরে বলতে লাগলেন, "কাঁপবেন না ভয় নেই—টু।" সাহসী লোকটি ততক্ষণে সত্যিই কাঁপতে আরম্ভ করেছেন। জাদুকরও কাঁপছেন। তিনিই যেন বেশি ভয় পেয়েছেন। এবার তিনি একটু দূরে স'রে ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন—"এইবার আমি থ্রী বলব, ভয় পাবেন না, কাঁপবেন না।"

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সাহসী লোকটির মাথার উপরে তোলা লাঠিসহ উদ্যত হাত দুখানি ভীষণ কাঁপতে আরম্ভ করছে। এইবার দম বন্ধকরা প্রতীক্ষার তীব্রতা চরমে তুলে জাদুকর ভীষণ চিৎকার ক'রে ভীষণ কেঁপে এবং পালিয়ে যাবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, বাক্সের ডালা এক ধাক্কায় খুলে "থ্রী" ব'লেই তিন লাফে স'রে গেলেন ওখান থেকে, লোকটি লাঠি মারতে মারতে হঠাৎ থেমে গেলেন। বাক্সের মধ্যে সাপ নেই, মারবেন কার মাথায়?

"অ্যাঁ, সাপ নেই? তা হলে আপনি ভয় পাওয়াতে সব গোলমাল হয়ে গেছে"—ব'লে জাদুকর এগিয়ে এসে লাঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে সাহসী লোকটিকে বললেন—"আপনার আসনে ফিরে যান।"

এই ব্যাপারটা আগাগোড়া একটি ধাপ্পা। সাপের ব্যাপারটা একটা ইণ্টারলিউড. বিশুদ্ধ আমোদ সৃষ্টিই ছিল তার উদ্দেশ্য। আসলে ঐ ছোট্ট বাক্স থেকে শেষে এত ফুল বেরোতে লাগল যে তিনখানা টেবিলে তার জায়গা হয় না।

ম্যাজিক নিয়ে এরপর অনেক চিন্তা করেছি, এবং নিজেও বাল্যকাল থেকে কিছু কিছু তাসের ম্যাজিক শিখে বন্ধুদের কতবার চমকিয়ে দিয়েছি। অনেক ম্যাজিকই এখন দেখলে তার রহস্যটা বুঝতে পারি, কিন্তু এটি নিশ্চিত বুঝেছি যে রহস্য উদঘাটনে কোনো আনন্দ নেই। সামান্য উপকরণকে সম্বল ক'রে জাদুকর যখন একটা কিছু গ'ড়ে তোলেন, তখন সেই গ'ড়ে তোলাতেই শিল্পীর পরিচয়, ভাঙাতে নয়। শিল্পীর সৃষ্টি, কবির কাব্য. সবই তো ভ্রান্তি। রঙ্গমঞ্চে যে নাটক দেখি সেও তো ভ্রান্তি। ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়ার বদলে যদি চেঁচিয়ে উঠে প্রচার করি, ধ'রে ফেলেছি। কাগজ, তুলি, আর রঙ দিয়ে এটি তৈরি হয়েছে; কাব্য প'ড়ে মুগ্ধ হওয়ার বদলে অনুরূপ ভাবে বলি, হু সব বুঝতে পেরেছি—ঐ শব্দ বাংলা অভিধান

থেকে সংগ্রহ ক'রে সাজানো হয়েছে—ফাঁকি ধ'রে ফেলেছি : তা হ'লে তাতে শিল্প বা কাব্য-ম্যাজিকের কি কিছুমাত্র ক্ষতি হয়? বরং যে ধ'রে ফেলল, সে নিজেই শুধু প্রতারিত হয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ি রাম সেজেছেন জেনেও কি সেই রামের দুঃখে আমরা দুঃখ পাইনি নাট্যমন্দিরে? সেই রামের গায়ে সাবান ঘ'ষে শিশিরকুমার ভাদুড়িকে ধ'রে ফেলার চেষ্টা ক'রেছি কি?

কিন্তু এই 'ধরে ফেলা'-ও সম্মানের জিনিষ হয় যদি মাথাটি নিচু ক'রে শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়ে ধরতে আসা যায়। বিজ্ঞানীদের মনোভাব হচ্ছে এটি। তাঁরাও ধ'রে ফেলার দলে, কিন্তু তা নিয়ে তাঁদের দম্ভ নেই, তার মধ্যে 'শো' নষ্ট করার দুষ্প্রবৃত্তি নেই, বিশ্ব-ম্যাজিকের অপরিসীম বিস্ময় খর্ব করার দুরভিসন্ধি নেই। বরং বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য এর বিপরীতই। তাঁরা রহস্য যত ভেদ করছেন রহস্য তত বাড়ছে।

কলেজে কেমিস্ট্রি পড়তে গিয়েই প্রথমে বিশ্ব-গঠন সম্পর্কে ধারণা কিছু স্পষ্টতর হয়, এবং এটি যে এক বিরাট ম্যাজিকের পর্যায়ে পড়ে এটি সহজেই মনে আসে। অ্যাটম তখনও অবিভাজ্য ছিল আক্ষরিক অর্থে। অ্যাটম ও মোলিকিউল—পরমাণু ও অণু—বস্তুসৃষ্টির পথের আদি এই দুটি ধাপ আমাকে সম্পূর্ণ নতুন এক ভাবরাজ্যে উত্তীর্ণ করল। বস্তুর আদিতে মাত্র একটি পরমাণু কণিকা, যাকে আর ভাগ করা যায় না, এই পর্যন্তই তখন আমরা জানি। রাদারফোর্ড তখনো প্রোটনে এসে পৌছান নি। রোয়েণ্টগেন-টমসন-বেকেরেল-ক্যুরি-গোল্ডস্টাইন এবং রাদারফোর্ড-সডির গবেষণা তখনো ফিজিক্সের পাতা ছেড়ে, ইণ্টারমীডিয়েট পাঠ্য সার পি. সি. রায় লিখিত, ইনঅরগ্যানিক কেমিস্ট্রির পাতায় আসেনি। সুতরাং অমোদের কাছে (বইতে এবং অধ্যাপকের বক্তৃতায়) তখন অ্যাটমই চরম। সবার উপরে অ্যাটম সত্য তাহার উপরে নাই।

কেমিস্ট্রি আমার জীবনে এলো একটি পরম আশীর্বাদ রূপে। আমার কল্পনা উধাও হয়ে গেল বস্তু-জগতের সীমাহীন রহস্য রাজ্যে। এত বড় ম্যাজিক আর নেই। কেমিস্ট্রির ফরমুলাগুলি আমার চোখে ছবির মতো ভাসতে লাগল। পি. সি. রায়ের একখানি মাত্র বই, তারই মধ্য দিয়ে বিশ্ব-ভ্রমণের পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে এলো লজিকের পথ।

সেও আমার কাছে এক নতুন জগৎ। সিলোজিসম্-এর ধাপ গুলোয় কোথায় ফ্যালাসি, সিদ্ধান্তে কোথায় ফ্যালাসি, এ সব লজিকের রীতিতে যাচাই করছি, মাঝে মাঝে বক্তের সাহায্য নিচ্ছি। মাঝে মাঝে কল্পনা রাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। যতটুকু চিন্তা করলে পরীক্ষায় ভাল ফল হয়, তা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না, পাঠের যে কোনো অংশ ভাল লাগলে তাকে আশ্রয় ক'রে কল্পনায় উড়ে যেতাম অনেক দূরে।

কলেজের পড়া অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার ছিল এখানে। ভাঙা পুরনো দরিদ্র পরিবেশে সবার সঙ্গে একটা গভীর আত্মীয়তা বোধ জেগেছিল, যা পরে আর কোথাও পেলাম না।

হস্টেলে আমাদের নানা বিষয়ে তর্ক প্রায় লেগে থাকত। রবীন্দ্র কাব্য তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয়। অতুলানন্দ ও আমি রবীন্দ্রনাথকে রক্ষার ভার নিয়েছিলাম। সে সব বালকোচিত তর্ক বিতর্ক, তার রেকর্ড থাকলে আজ নিশ্চিত বোঝা যেত যে রবীন্দ্রনাথ তার অপেক্ষায় ব'সে না থেকে নিজ কর্মগুণেই বড় হয়েছিলেন।

যাই হোক এই উপলক্ষে অতুলানন্দের সঙ্গে একটা বিশেষ অন্তরঙ্গতা গ'ড়ে উঠল এবং আজও সেই ১৯১৫-১৬ সালের কলেজে-পাওয়া বন্ধুদের মধ্যে সেই একমাত্র বন্ধু যাকে এখনও দেখতে পাই। তার নিজস্ব প্রতিভায় চলার পথে আমি এককালে বাধা সৃষ্টি ক'রে তাকে গ্রন্থকার হ'তে প্রলুব্ধ করেছিলাম, এবং সে পথের অনেক মজার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর, সে সেই দুষ্ট প্রভাব বর্তমানে অনেকখানি কাটিয়ে উঠে আত্মস্থ হয়েছে।

১৯১৬ সালে অনেক দিক বিবেচনা ক'রে আমাদের রতনদিয়াতেই বাস করা স্থির হ'ল। বিঘে দুই জমি নিয়ে তাতে বাড়ি উঠল। বাবা এ বিষয়ে নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁর মতে, কোথাও স্থায়ী বাস অর্থহীন। ভবিষ্যতে যার যেখানে খুশি থাকবে, কাউকে কোথাও বেঁধে রাখা ঠিক নয়। তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ের লোকের নগদ টাকার অভাব, তাই জমি কিনতে চাইলে যত ইচ্ছে পাওয়া যেত। ধানের জমি ওখানে খুব শস্তা ছিল। এমন অবস্থায় অনায়াসে প্রায় জমিদার হয়ে বসা যেত তখন। বংশ বংশ ধ'রে নিশ্চিন্ত। কিন্তু বাবা ঠিক এরই ঘোর বিরোধী ছিলেন। যাযাবরী বৃত্তি সম্ভবত সবারই মজ্জাগত ছিল। এখন ভাবি, তা না হ'লে আজ কি হ'ত? কোনো

জমিতেই মূল প্রবেশ করানো হয় নি ব'লেই আজ হয় তো অস্তিত্বটুকু বজায় আছে।

বাবা পড়াশোনায় ডুবে থাকতেন। নানা ভাষা শিক্ষা তাঁর একটি নেশা ছিল। উচ্চারণ শিক্ষায় একান্ত নিষ্ঠা। ইংরেজী সংস্কৃত ফার্সি—সব বিশুদ্ধ উচ্চারণ চাই। ম্যাট্রিক ক্লাসে তিনি আমাদের সংস্কৃত অনেক ছন্দ সূত্র সমেত শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এই সবই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান আনন্দ। ইংরেজী বলতেন খাঁটি ইংরেজের অনুকরণে।

টেস্ট পরীক্ষা শেষে বাড়ি এসেছিলাম, ফিরে যাবার সময় গেলাম হেঁটে কুষ্টিয়া থেকে। রাজবাড়ির দু জন ও পাংশার একজন সহপাঠী ছিল সঙ্গে। গড়াই নদী পার হয়ে সাত আট মাইল বা আরো বেশি হাঁটতে হবে। যত এগিয়ে চলেছি তত দেখছি মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু আগুন আর আগুন।—কুসুম ফলের আগুন; কুসুম ফল এক রকম ফুল, জানতাম না তার চাষ এখানে এমন ব্যাপক ভাবে হয়। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ শুধু এই কুসুম ফলে ছাওয়া, কিছু কিছু সরষের হলুদ ফুলেরও মিশ্রণ আছে। ঘন লালের সঙ্গে হলুদ মেশানো যেমন রং হয় কুসুম ফলের রং তেমনি। নীল আকাশের পাত্রটা থেকে সোনালি রোদ যেন নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে সেই রঙের সমুদ্রে। চোখ ঝলসে যায় এমন তার ঔজ্জ্বল্য।—কুসুম ফলের এমন ব্যাপক চাষ আগে দেখিনি, পরেও না। এরই মধ্যকার পায়ে চলার পথ ধ'রে এগিয়ে চলেছি। সে দিন ঝড়ের রাতে এরই কাছাকাছি স্থানে এই আকাশেরই নিচে মৃত্যুর ভ্রূকুটি দেখেছিলাম, আজ সেখানে সেই একই প্রকৃতির প্রসন্ন অভ্যর্থনা দেখছি।

কুষ্টিয়া থেকে বেলা সাড়ে ন টায় রওনা হয়ে বিকেলের দিকে গিয়ে পৌছলাম পাবনা শহরে। পদ্মা পার হয়েছিলাম খেয়া নৌকোয়।

এর পর কয়েক সপ্তাহ ধ'রে শুধু পড়ার পালা। আমরা কয়েক জনে মিলে বিকেলে বেড়াতে যেতাম পরীক্ষার পড়া ছেড়েও পথের দু ধারে আমগাছের নিচের জমি ঝরা-মুকুলে আচ্ছন্ন। তার মাদকতাপূর্ণ গন্ধে মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেত। হাজার হাজার মৌমাছির গুঞ্জন, অদৃশ্য কোকিলের গান, আর আমের বোলের সেই উগ্র গন্ধ—এই স্বপ্ন-মায়ায় আচ্ছন্ন

পটভূমিকে ঠেলে "Milton! thou shouldst be living at this hour!" পড়ছি চেঁচিয়ে! ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৮০২ সালে মিলটনকে ডেকেছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু তার শতাধিক বছর পরে সে দিনের সেই ১৯১৭ সালের পাবনা শহরে, এক আই. এ পরীক্ষার্থী বালকের কাছে, সে ডাকের সঙ্গে পরীক্ষা পাস ভিন্ন সুর মেলাবার আর কি সার্থকতা ছিল ভেবে দেখিনি। বসন্ত কালের সেই উন্মাদকরা পরিবেশে মিলটন কেন, অতীত কালের সকল দেশের সকল কবির বেঁচে থাকার দরকার ছিল; আর কোনো কারণে নয়, শুধু পাবনা শহরের বসন্ত কালের ঘ্রাণ নিতে আর কোকিলের গান শুনতে।

পরীক্ষা শেষে কত বড় মুক্তি! প্রথমে বিশ্বাসই হয় না যে রাত্রে আর পড়তে হবে না। হঠাৎ চমকে উঠি—এখনও ব'সে আছি, এখনও বই খুলিনি? অবশ্য বই আমি সামান্যই খুলেছি। নোট মুখস্থ করিনি কোনো দিন, সে ক্ষমতাও ছিল না। অন্যের ভাষা নিজের ব'লে চালানো ভাল লাগত না। নিজে যেটুকু বুঝেছি মাত্র সেইটুকু লিখতে পারতাম, না বুঝে কিছুই লিখতে পারিনি। কোনো রকমে পাস করার ব্যাপার।

হস্টেল থেকে চিরবিদায়। দুদিন ভীষণ হুল্লোড় চলল। তার পর বিদায়ের আয়োজন। তখনকার দিনে মফঃসল শহরে উপভোগের উপায় নিজেদেরই উদ্ভাবন ক'রে নিতে হত। তখন রিল্যাক্সেশন মানে ঘুম, লিবারেশন মানে হৈ হৈ চিৎকার। এখন যেমন সিনেমায় বসলে একই সঙ্গে দুটো প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, তখন তা ছিল না, কারণ তখন সিনেমা ছিল না। ঘোর সেকেলে ব্যাপার।

বিদায়ের আগের দিন তারাপদ সান্যালের মাথায় বায়ুর প্রকোপ দেখা দিল। সে ঘর থেকে থান দুই তক্তাপোষ টেনে বা'র ক'রে উঠনে গেটের কাছে রাখল। তার পর প্রত্যেকের পায়ের দু তিন জোড়া ক'রে জুতো এনে জড়ো করল তার উপর। লম্বা দড়ি টাঙিয়ে তাতে সবার জামাকাপড় ঝোলাল। তার পর একটি টিন বাজাতে বাজাতে 'নিলাম! নিলাম!' ব'লে চেঁচাতে লাগল। খদ্দের জুটে গেল কিছু। তারা সীরিয়াস। নিলামওয়ালার আপত্তি ছিল না বেচে দেওয়ায়।

আমরা চার পাঁচ জন যারা স্টীমারে গোয়ালন্দের দিকে যাব, পরদিন

সকালে রওনা হলাম। ঘোড়াগাড়ি এলো দুখানা। তারাপদ আমাদের সঙ্গী, তার বাড়ি বরখাপুর, তাকে নামতে হবে খলিলপুর (পাবনা), আমাকে নামতে হবে বেলগাছি (ফরিদপুর)। একটি স্টেশনের ব্যবধান। তারাপদ বলল, "আমি শহরের মধ্যে গাড়িতে উঠব না, তোমাদের গাড়ির সঙ্গে হেঁটে যাব এবং শহর ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠব।" কি তার উদ্দেশ্য তখন বুঝিনি, একটু পরেই বোঝা গেল। সে ফতুয়া গায়ে চাদর উপর কাপড় তুলে মাথায় পাগড়ি বেঁধে চলল হেঁটে তার লম্বা ও কোটি টানতে টানতে।

তার পর স্টীমার ঘাট। তারাপদ একাই জমিয়ে রাখল গল্প ক'রে, গান গেয়ে। কিন্তু তার আরও একটি প্রধান ভূমিকা তখনও বাকী ; এই খানেই তার শেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে সে বিদায় নিয়েছে, তার পর এখন সে কোথায় তা আর জানি না।

যতদূর মনে পড়ে সাতবেড়ে ছেড়ে কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর আমাদের স্টীমার গেল চড়ায় আটকে। মার্চ মাসের শেষ তখন, পদ্মার বুকে তখন কত চর জেগে উঠেছে। তাদের এড়িয়ে এড়িয়ে খুব সাবধানে চলছিল স্টীমার, কিন্তু এড়ানো গেল না ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যাব আশা করছিলাম, এমন সময় এই বিপদ। খাওয়ার চিন্তাই তখন বড় হয়ে দেখা দিল। তারাপদ বলল, কোনো চিন্তা নেই। - সে উঠে গেল ব্যবস্থা করতে।

ফিরে এলো মিনিট দশেক পরে। বলল, সব ঠিক আছে। ঠিক আছে, মানে, সারেঙের কাছে গিয়ে সে আমাদের কয়েক জনের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে এসেছে। স্টীমারে তখন রান্না হচ্ছিল। খালাসীদের জন্য এই রান্নার লোভনীয় গন্ধ স্টীমার যাত্রীর পরিচিত। ইতিপূর্বে সে গন্ধই পেয়েছি, এবারে স্বাদ পাওয়া গেল। খিচুড়ি, প্রচুর পেঁয়াজ সংযোগে রান্না। আরও শুনে অবাক হলাম, এ জন্য কোনো পয়সা লাগবে না।

এক বেলা চেষ্টার পর স্টীমার চড়ার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল। আমি বেলগাছি ঘাটে নামলাম বিকেলে। আমার সঙ্গে একটি বড় ট্রাঙ্ক ছিল, তাতে বই ছিল অনেক, বেশ ভারী সে বাক্স। বেলগাছি ঘাটে মুটে ছিল না একটি। যাত্রীদের সাহায্যে বাক্সটি নিচে নামিয়েছি, কিন্তু তার পর?

একটি স্কুলের ছাত্র, যতদূর মনে পড়ে ঐ স্টীমারেই ছিল কিংবা শূন্য থেকে আবির্ভূত হ'ল আমার প্রয়োজনে। সে কাছে এগিয়ে এসে বলল চলুন বাক্স আমি পৌঁছে দিচ্ছি। আমার অসহায় অবস্থা দেখেই সে সব বুঝতে পেরেছিল। মুখ খানা শান্ত এবং গম্ভীর। বলল, বাক্স আমার মাথায় তুলে দিন। আমি বললাম "সে কি ক'রে হবে, বাক্স ভারী এবং রেল স্টেশন মাইল খানেক।" সে শুধু বলল, "আমার কষ্ট হবে না, তুলে দিন।"

না দিয়ে উপায় ছিল না।

ছেলেটি সেই প্রায় আধমণ ভারী ট্রাঙ্কটি মাথায় বয়ে বেলগাছি স্টেশনে এনে নামিয়ে দিল। ধন্যবাদ জানাবার রীতি তখন পল্লীতে প্রচলিত হয় নি। কৃতজ্ঞতা জানাবার আর কোনোই উপায় ছিল না। তার হাতটি ধ'রে চেপে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। হয় তো পেল কিছু, হয় তো পেল না, কিন্তু সে দিকে কিছু মাত্র মনোযোগ না দিয়ে সে চলে গেল। অপরিচিত শত শত অতি সাধারণ স্কুলের ছেলেদের সে একজন, কিন্তু কি অসাধারণ। কোথায় তার বাড়ি, কি তার নাম, কিছুই মনে নেই এখন। জানবার অবকাশ পেয়েছিলাম কিনা তাও আর মনে পড়ে না। অথচ কি আশ্চর্য, সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও সে আজ আমার মনের এক কোণে, কত বড় একটা স্থান অধিকার ক'রে আছে।

কলেজ জীবনের গোড়াতেই সম্ভবত সঞ্জীবনী কাগজে কিছু কিছু লিখছি মনে পড়ে। সমাজের অসঙ্গতি বিষয়ে মন বেশ সচেতন হয়েছিল জাতিভেদ প'ড়ে। লেখার বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব ছিল না, কিন্তু তাতে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস যোগ হয়েছে। "স্থানীয় সংবাদ"-এর পর, এই প্রথম আমার নিজস্ব মত লেখার সঙ্গে যুক্ত হল।

গল্প বা উপন্যাস পাঠে আমার আকর্ষণ ছিল না, আমার শুধু প্রবন্ধ পড়তে ভাল লাগত। ভারতবর্ষে প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখা প্রথম থেকেই পড়ছিলাম। এই প্রবন্ধগুলি আমার কাছে খুব ভাল লাগত। প্রাণময় জগৎ বাঙময় জগৎ-এর বক্তব্য বুঝতে চেষ্টা করতাম খুব মন দিয়ে। কলেজেও পাঠ্য উপন্যাসখানায় খুব মনোযোগ দিইনি, আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল স্টীল অ্যাডিসনের রচনাগুলি। গল্প বা উপন্যাস বিষয়ে আমার এই

মনোভাব আমি বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি। গল্প উপন্যাসে বর্ণিত কোনো বেদনা বা আবেগময় মুহূর্ত আমাকে একটু বেশি পরিমাণে বিচলিত করত, তাই দুঃখ বেদনার কাহিনী আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। ১৯২১-২২ সালে যখন আমার ছোট বোন মঞ্জুর বয়স প্রায় চার, সেই সময়ের একটি দৃশ্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বাবা তাকে 'পুরাতন ভৃত্য' শোনাতেন রোজ। ঐ গল্পটির প্রতি মঞ্জুর ভীষণ লোভ ছিল, অথচ পুরো কাহিনীটিকে সে সহ্য করতে পারত না, কেঁদে ফেলত। শেষে সে নিজেই আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিল, কেঁদে ফেলার জায়গাটায়, অর্থাৎ যেখানে আছে—

> "[illegible] কাদের আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে
> নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ পরে।"

এইখান থেকে শেষ ছত্র—"তাকে সঙ্গে নেই ফিরে সাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।"—পর্যন্ত যদি সে না শোনে, তা হলে আর তাকে কাঁদতে হয় না। তাই সে, "যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানিরে দেখিতে পাইবে পুন" অবধি শুনেই বাবার মুখ চেপে ধরত। দিনে দু তিনবার এটি শুনতে হবে, এবং প্রত্যেকবার শেষ দৃশ্যে মুখ চেপে ধরা চাই।

আরও একটি কবিতা সম্পর্কে এই কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। বাবা মঞ্জুকে একদিন বধূ কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। শুনে সে গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর এক সময় দেখা যায় সে বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। অনেক জেরা ক'রে জানা গেল বধূর দুঃখে সে মর্মাহত। 'একটা আলোও দেয় না তাকে ?— কেন দেয় না ?' ব'লে আবার কাঁদতে লাগল।

বধূর দুঃখ শিশু মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। আমার নিজের মনের কিছু প্রতিবিম্ব দেখেছিলাম এই দুইটি ঘটনার মধ্যে। কিন্তু এ তো অনেক পরের কথা। আমি যথাসময়ে নিজের সম্পর্কে অনেকখানি সতর্ক হবার চেষ্টা করেছিলাম বেশ যত্নের সঙ্গে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আদর্শবাদ ঢুকেছিল মনে। বিছানায় তোষক বাদ পড়েছিল, চুল খাটো ক'রে ছাঁটা, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। এ সবই প্রফুল্লর প্রভাব। প্রফুল্লর উপর বিবেকানন্দের প্রভাব। মাস দুই কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলাম ঠিকই।

মনোজগতে ভাঙাগড়ার কাজ চলছে অবিরাম।

পাবনা থেকে রতনদিয়া আসার পর এক মাসের জন্য রতনদিয়া মাইনর

স্কুলের হেডমাস্টারের পদে নিযুক্ত হলাম। তথাকার স্থায়ী হেডমাস্টার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ছুটি নিয়েছিল, তারই স্থানে। পড়াতে আমার খুব ভাল লাগত এবং কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি হত না। এই আমার প্রথম চাকরি—বেতন পেলাম ত্রিশ টাকা।

তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেই আই. এ. বা আই. এসসি। সেটি পাস করলে ডিগ্রীর জন্য পড়া, এবং তার পরেও সামর্থ্য থাকলে আইন পড়া অথবা এম. এ. বা এম. এসসি। এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন ছিল না, একেবারে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, কেননা তখন ছাত্রদের জন্য আর কোনো পথ খোলা ছিল না। অতএব ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল তখনকার দিনের শেষ লক্ষ্য। সাহিত্যে যার কিছু মাত্র আকর্ষণ নেই, তাকে বিশ্ব সাহিত্যের রস পান করতে হচ্ছে, অনিচ্ছুক রোগী যেমন ভাবে পাঁচন পান করে, তেমনি ভাবে। জীবনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, যেমন ক'রে হোক কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করা। আর এই জন্যই পড়া অনেকের কাছে বিভীষিকা ছিল। একজন ছাত্র ডাক্তারি পড়তে আরম্ভ করল, কিন্তু বছর তিনেক পরে পুলিসের চাকরি পেয়ে চলে গেল। পড়ার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক ছিল না, শিক্ষার লক্ষ্য সাধারণের পক্ষে ছিল শুধু একখানি ডিপ্লোমা। এ অবস্থা এখনও কাটে নি।

নিজের কথাও ঐ একই, জীবনের লক্ষ্য কিছুই স্থির নেই, পাঠ শেষে সেটি ভাবা যাবে, তার আগে ভাবার কোনো প্রশ্নই নেই। কারোই ছিল না। অতএব বি. এ. পড়তে এলাম কলকাতায়।— সেটি ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম। এবং এইখান থেকে আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হ'ল ব'লে আমার বিশ্বাস।

ভর্তি হ'তে এলাম মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। কিছু দিনের মধ্যেই এর নাম বিদ্যাসাগর কলেজ হয়। এই কলেজটিকেই বেছে নিয়েছিলাম কেন তা এখন আর মনে পড়ে না, এসে কোথায় উঠেছিলাম তাও মনে পড়ে না। এ রকম ছোট খাটো দু একটি ঘটনা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। মনে করিয়ে দিলে হয় তো আবার সব জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা বলি, এটি মনোবিজ্ঞানীদের কাজে লাগতে পারে। পাবনা কলেজের দক্ষিণ দিকের অনেক খানি অংশ

আমার স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল। বড় রাস্তাটি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, পাবনা ইনস্টিটিউশনটি ঠিক কোন্ জায়গায়, পথ বেয়ে কল্পনায় কলেজ পর্যন্ত এসে আর এগোতে পারি না। অথচ দুটি বছর এইখানে ঘোরা ফেরা করেছি, এর প্রত্যেকটি ইঞ্চি আমার পরিচিত ছিল। এই এলাকাটা মনে আনতে কিছুদিন ধ'রে কি চেষ্টাই না করেছি, এবং না পেরে ছটফট করেছি। নিজের স্মৃতির কাছে এমন পরাজয়, এর কোনো অর্থ হয় না। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হ'ল অতুলানন্দ চক্রবর্তী ছিল পাবনার স্থায়ী বাসিন্দা, তাকে জিজ্ঞাসা করি না কেন। পাবনা পর্যায় লেখার আগে আমার অনুরোধে অতুলানন্দ পাবনার বড় রাস্তাটির একটি ম্যাপ আঁকতে আরম্ভ করতেই একটি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো সবখানি বিস্মৃত এলাকা আমার মনের চোখে দপ ক'রে জ্বলে উঠল। তার মধ্যে পাবনার প্রকাণ্ড খেলার মাঠটি ছিল। এই মাঠে ব'সে ফুটবল খেলার মরশুমে বড় বড় ম্যাচ খেলা দেখেছি, পাবনা কলেজের হয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েছি। এ মাঠের সঙ্গে অন্তরের যোগ ছিল। অথচ এমন ক'রে ভুলে গিয়েছিলাম সব। শুধু মনে পড়েনি তাই নয়, এ রকম যে একটি প্রিয় স্থান ছিল, যে খানের প্রত্যেকটি গাছ আমার পরিচিত ছিল, তার অস্পষ্ট কোনো আভাসও মনে পড়ে নি। সে দিন একটি মুহূর্তে সব ফিরে পেলাম। হয় তো আপনা থেকেই কোনো এক শুভ মুহূর্তে এই বিস্মৃত জায়গাটির অতি প্রিয় মাঠ, পথ গাছপালা, ডাকঘর, এমব্যাঙ্কমেণ্ট, পাবনা ইনস্টিটিউশন, ইছামতী নদী, তার উপরকার ব্রিজ, সমস্ত স্মৃতিতে জেগে উঠত, কিংবা হয়তো কোনো দিনই আর এদের ফিরে পেতাম না। স্মৃতির এই শূন্যতা এখন বহু জায়গায় ঘটেছে সে সব জায়গার আলো নিবে গেছে। কখন কোন্টা জ্বল'ব ঠিক নেই, কোনোটা জ্বলবে কিনা তাও ঠিক নেই। তবে সেদিন একটু ছোঁয়া লেগে যখন সব দপ ক'রে জ্বলে উঠল, তখন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মধুর স্মৃতি বিজড়িত একটি হারিয়ে যাওয়া উচ্ছেদ প্রাপ্ত জমিতে আমার পুনর্বাসন ঘটল যেন।

এই যে বিস্মৃতি বিদীর্ণ ক'রে হঠাৎ এক একটি ভুলে যাওয়া মুহূর্তকে ফিরে পাওয়া, এরই কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বার বার শুনিয়েছেন তাঁর নানা কবিতায়। "They flash upon that inward eye"—এই কথাটির

মধ্যে পাওয়া যায় এর মাধুর্য, ভুলে যাওয়া মহূর্তগুলিকে ফিরে পাওয়ার মাধুর্য।

কলেজে ভর্তি হওয়ার দিনটি পরিষ্কার মনে আছে; ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে দেখি রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি দরকার হয়, এবং আরও শুনলাম খেলাধুলায় ভাল হলে তার আবেদন অগ্রাহ্য করা হয় না।

ফর্মে খেলার জায়গায় লিখলাম বিশেষভাবে জানি ফুটবল ক্রিকেট ও হকি। ফুটবল শেষ খেলেছি সম্ভবত ১৯০৯ সালে, সে সময়ে ডান পায়ের হাড়ে (টিবিয়াতে) চোট লেগে ভেঙে যাওয়ার মতো হয়েছিল। আঘাত লাগা জায়গায় হাড় খানিকটা উঁচু হয়ে ছিল। ক্রিকেট খেলাটি ঐ সময়েই গ্রাম্য ব্যাট এবং বল দিয়ে, হকি খেলা তখনও দেখিনি। ভাবলাম যদি কখনো ডাক পড়ে, বলব, জানি কিন্তু খেলব না।

রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি নিয়ে হল মুশকিল, ওটি সঙ্গে আনি নি। দরকার হয় খেয়াল ছিল না, অথচ দেরি হ'লে ভর্তি অনিশ্চিত। বুদ্ধি খুলে গেল। ভাবলাম এখন আর তো কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না, এখন যে কোনো একটি নম্বর বসিয়ে দিই, পরে জানালেই হবে ভুল হয়েছিল। একটি কাল্পনিক নম্বর বসিয়ে দিলাম। সে নম্বর আজও বদলের দরকার হয় নি।

৩০নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর তলায় ছিল কলেজের মেস। এই মেস এর দোতলায় বড় ঘর যেটি পথের ঠিক উপরে, সেইখানে আরো চার জন ছাত্রের সঙ্গে পেলাম একটি সীট। আমার সীটটি একেবারে পথের ধারে—ছাত্রের পক্ষে খারাপ, কিন্তু আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল মনে হ'ল। তার কারণ আমি খাটি ছাত্র ছিলাম না। তা ছাড়া এত দিন থেকেছি খোলা জায়গায়, এখন হঠাৎ তার সম্পূর্ণ বিপরীতকে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। তাই পথের উপরের বাসস্থানটি আমার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ বোধ হ'ল। নদীর ধারে ব'সে বালক কাল কেটেছে, আবার এসে বসলাম আর এক নদীর ধারে। এখানে দিনরাত বয়ে চলেছে জীবনের স্রোত। বিছানায় ব'সে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কেটে যেত স্রোতের মতোই বেগে। আমি জানতাম আমার গৃহবাসীরা তাঁদের পছন্দ মতো সীট গুলো আগেই নিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁদের অসুবিধাজনক সীটটিই আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু

তাঁরা জানতেন না এই সীটটি না পেলে আমার পক্ষে সে ঘরটি জেলখানা মনে হ'ত।

ব'সে ব'সে চলমান জীবন স্রোত দেখায় আমার ক্লান্তি ছিল না। দেখতে দেখতে হঠাৎ চেতনা হ'ত, পথের স্রোতের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া মনকে ফিরিয়ে আনতে হ'ত কষ্ট ক'রে। মনের এমন এক একটি অবস্থা আসা সম্ভব। যখন মন প্রফুল্ল থাকে, সব ভাল লাগে। খুব কাছের দৃষ্টিতে স্বার্থের সংঘাতে বা অপ্রয়োজনের উদাসীনতায় যে মানুষটি অত্যন্ত বিরক্তিকর, যার সংস্পর্শ এড়াতে পারলে আরাম, সেই লোকটিকেও তখন অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়। 'বিশেষ' থেকে মনকে এভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া অসম্ভব নয়। সমস্ত মানুষের মিলনে যে অখণ্ড একটি মানবতার সত্তা, তাকে দেখতে পেলে তখন প্রত্যেকটি বিশেষ মানুষকে তার এক একটি অপরিহার্য উপাদান ব'লে চেনা যায়।

৩০নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে ব'সে আমি প্রত্যেকটি মানুষকে সুন্দর দেখেছি। কখনো এমন কল্পনা করেছি যে আমি অন্য গ্রহ থেকে এসে সম্পূর্ণ নতুন চোখে যদি এই সব বাড়ি ঘর মানুষকে দেখতাম তা হলে এদের কেমন লাগত। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এ কল্পনার পথে অনেকদূর এগিয়ে শেষে ভয়ে ফিরে এসেছি। চেতনা ফিরে এলে নিজেকে ফিরে পেতে দেরি হ'ত। আমি কোথায় আছি তা বুঝতে দশ পনেরো সেকেণ্ড কেটে যেত।

এ রকম চেষ্টা আর করিনি।

তখন মোটর গাড়ি খুব বেশি চলত না, মাঝে মাঝে দু একখানা। পথের ভিড়ও আজকের মতো নয়। কিন্তু তখনকার দিনের সেই ভিড়কেই যথেষ্ট মনে করা হ'ত। ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের কাছে একটি মজার গল্প শুনেছিলাম। তাঁর সঙ্গে একবার পাড়াগাঁয়ের একটি লোক কলকাতা এসেছিল। সে শিয়ালদ স্টেশনের বাইরে এসে পথের ভিড় দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল 'আজ কলকাতার হাট না কি?' বেচারা হাট ভিন্ন এত লোক একসঙ্গে কখনো দেখেনি।

লক্ষ্য করলে কত বৈচিত্র্য। নটার পর থেকে তখন যে কেরানিকুল ডালহৌসি স্কয়ারের দিকে ছুটত, তাদের পোষাক অন্য রকম ছিল। পায়ে

চকচকে জুতো, ক'ষে ফিতে বাঁধা। গায়ে শার্টের উপরে ওপনব্রেস্ট কোট, বোতাম আঁটা নয়। ধুতিতে মালকোঁচা মারা। এই ছিল তাদের সাধারণ সাজ। বেশ একটা স্বকীয়তা। পোষাকের এই চরিত্রের এখন বদল হয়েছে। তখনকার পথের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা ছিল প্রায় নারীবর্জিত। আধুনিকাদের দেখা মিলত না আদৌ। একেবারে দুর্লভদর্শনা। ট্রামে নয়, দোকানে নয় কলেজে নয়, ইউনিভার্সিটিতে নয়। দৈনিক একটি দেখলেই যথেষ্ট মনে হ'ত। কলেজের ছাত্রীরা তো শকটগ্রস্তা ছিল, তখনকার মেয়ে-স্কুলের নাম 'পর্দা' স্কুল, নইলে ছাত্রী হ'ত না। তখন যুবকদের প্রেম করতে হত বিয়ে করার পর, আপন স্ত্রীর সঙ্গে। বাংলা কথা সাহিত্য তাই দুর্বল ছিল, স্বাধীন প্রেমের কথা উঠলে বয়স্ক পাঠকমহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ত।

আমাদের মেস্-এ কয়েকজন ওড়িয়া ছাত্র ছিলেন। তাঁদের নাম মনে নেই, তাঁদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ জমেছিল। আমি তাঁদের কাছে ওড়িয়া পড়তে শিখলাম, এবং তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তাঁদের তখনকার মাসিক পত্র 'উৎকল সাহিত্য' নিয়মিত পড়তাম। ওড়িয়া সমসাময়িক সাহিত্যে তখন অগ্রগতি বিশেষ কিছু হয়নি, পত্রিকাখানাও বোধ হয় পঁচিশ ত্রিশ পৃষ্ঠার ছিল। ছেলেদের উপযুক্ত গল্প, সেও আবার অনুবাদ, তাতে ছাপা হ'তে দেখেছি। তখন যুদ্ধের সময়, অতএব রাজভক্তিমূলক কবিতাও থাকত। নমুনা হিসেবে একটি কবিতা আমি মুখস্থ করেছিলাম, তার কয়েক ছত্র এখনও মনে আছে।

"সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা দেখ রক্তবর্ণে লিখা
সে ধ্বজার কোলে আস্কি লভ হে আশ্রয়,
দেখু বিশ্ব ব্রিটনর কি শক্তি অক্ষয়।"

বাংলা ভাষা ও অক্ষরের সঙ্গে ওড়িয়ার অনেক মিল। আজকের দিনের ওড়িয়া সাহিত্য অনেক এগিয়েছে, উৎকৃষ্ট ছোট গল্প ওড়িয়া ভাষায় লেখা হচ্ছে।

বেশ ভাল লাগল ৩০ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। মেস্ জীবনের আরম্ভেই এতবড় একটা রাজপথের দখল পাওয়া কম কথা নয়। যতদূর মনে পড়ে

এই ১৯১৭ সালেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনি। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আমার ধর্ম'। তিনি বলতে চেয়েছিলেন তাঁর যে জীবন চলেছে, যার সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়নি, সে জীবনের মর্মকথা আগেই আবিষ্কার ক'রে লেবেল মেরে জাদুঘরে পাঠানো ঠিক নয়। বক্তৃতাটি সমসাময়িক সমালোচনার জবাব। রবীন্দ্রনাথ আরামের কবি, বিলাসের কবি ইত্যাদি কথা তখন খুব শোনা যেত। এখনও বোধ হয় শোনা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর কবিতা ও নাটক থেকে পরপর অনেক অংশ আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলেন। কবিরূপে কোন্ তত্ত্বটি তাঁর ভিতরে ভিতরে রূপায়িত হচ্ছে তারই চিহ্ন তিনি তাঁর নানা রচনা থেকে উদ্ধৃত ক'রে অনেকটা নিজেরই মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলেন। সমাজ মন্দিরে মারাত্মক ভিড় হয়নি। এটি বড় আশ্চর্য লাগে।

কবিকণ্ঠে সে কি তেজোদৃপ্ত আবৃত্তি। শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলাম। আজও সে ধ্বনি কানে বিঁধে আছে। কি এক অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ দেখেছিলাম কবির সমস্ত সত্তায়ঃ

"অয়ে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে
করো মোরে সম্মানিত নব-বীর বেশে,
দুরূহ কর্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার!"

কিংবা

"হবে হবে, হবে জয় হে দেবী, করিনে ভয়
হব আমি জয়ী
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমাময়ী।"

তারপর বর্ষ শেষ থেকে, তারপর মরণমিলন থেকে। এই কবিতাটি আবৃত্তির সময় সমস্ত ঘর যেন কেঁপে উঠল—

"কহ মিলনের একি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গল ছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে-কি আগে-পিছে কেহ ববে না?
তব মশাল আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ও গো মরণ হে মোর মরণ।"...

আবৃত্তি শুনতে শুনতে সহসা সম্মুখস্থ সমস্ত দৃশ্য কোথায় মিলিয়ে গেল। ভুল হয়ে গেল হলঘরে ব'সে বক্তৃতা শুনছি। একটা অশরীরী কণ্ঠস্বর যেন বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো সমস্ত দেহের ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। হৃৎপিণ্ড উত্তেজনায় লাফাচ্ছে; অনুভব করতে পারছি, সেই মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি—যদি আহ্বান আসে। হল-ঘরে শ্মশানের স্তব্ধতা। কারো মুখ থেকে একটি শব্দ নেই, শুধু তীব্র কবি কণ্ঠ ঘরের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ফিরছে।

একই সঙ্গে অনেক বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথকে দেখা আমার সেই প্রথম। তাঁর চুলে দাড়িতে তখন কালোর প্রাধান্য। ঠোঁটের চারধারে কিছু বেশি পাকা। দেহ সম্পূর্ণ ঋজু, তার প্রায় চার বছর আগে কবি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তাঁকে দেখার বিস্ময় কাটতেই তো অনেক সময় লাগার কথা; সে সময় কোথায়? একই সঙ্গে দেখা এবং বক্তৃতা শোনা চলছে। এ যেন মনের উপর অত্যাচার। তাঁর প্রত্যেকটি কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। এক এক সময় চমকে উঠি, খেয়াল হয়, কথা তো কানে যাচ্ছে না! রবীন্দ্রনাথ-রূপ স্বপ্ন জীবনে এই প্রথম মূর্তি ধ'রে সম্মুখে এসেছে, সেই বিস্ময় কাটিয়ে উঠব কি ক'রে? স্তম্ভিতবৎ শুধু সেই বিরাট ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছি, এই সেই কবি, এই সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর ভাষা ও ছন্দ আমার রক্তের সঙ্গে মিশেছে। যাঁর ছবি এঁকেছি পেন্সিলে, তুলিতে। সকল কথা এক সঙ্গে জেগে ওঠে, শুধু সবিস্ময়ে চেয়ে থাকি, কথা কদাচিৎ মর্মে প্রবেশ করে। এই দেখা এবং এই প্রথম তাঁর কণ্ঠস্বর শোনার স্মৃতি আমার জীবনের একটি বড় সঞ্চয় হয়ে আছে। এরই কাছাকাছি সময়ে, কখন ঠিক মনে নেই, আবার রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা শুনি রামমোহন লাইব্রেরিতে। বক্তৃতার বিষয় ছিল সঙ্গীত,

নাম ছিল সঙ্গীতের সঙ্গতি। পরে ছাপার সময় এর নাম হয় সঙ্গীতের মুক্তি। কথার সঙ্গে গান গেয়ে বক্তব্যকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ বক্তৃতাতেও ভিড় খুব মারাত্মক রকমের হয় নি। এই দুটি জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখিত-বক্তৃতা পাঠ করেছিলেন।

বক্তৃতা তখন একটিও বাদ দিলাম না। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা এর আগেই শুনেছিলাম কলেজ স্কয়ারে। এ সময়েও অনেকবার শুনেছি। আশুতোষ চৌধুরী ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা অনেকবার শুনেছি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনেছি আরও পরে। একবার মাত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনেছি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে।

এই মেস-এ থাকতে সাহেবগঞ্জ-বাসী প্রবোধ প্রায়ই আমার কাছে আসত এবং তার সঙ্গে আসত বলাইচাঁদের অনুজ ভোলানাথ। সে তখন স্কুলে পড়ত। এই ভোলানাথ কিছুদিন পরেই গল্প লেখক হয়েছিল এবং প্রবাসীর একটি গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল। আরও কিছুদিন অভ্যাসটি বজায় রেখে তারপর ছেড়ে দিয়েছে। ভাল লিখত।

আমাদের মেস-এ একটি ছাত্র কলেজের মেয়েদের গাড়ি দেখে এসে একদিন খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, সে মফঃসল থেকে এসেছে, এই প্রথম কলেজের গাড়ি দেখল। এই ঘটনা থেকে তখনকার দিনের পথের অবস্থা অনুমান করা যাবে। প্রবোধের সঙ্গে বেরিয়ে একদিন একটি মজার জিনিস দেখেছিলাম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের মেস-এর কাছে ছিল ইকনমিক জুয়েলারি, দুজনে সেখানে গিয়েছিলাম বাইরের কারো অর্ডারি জিনিস কিনতে। খুব কমিক শোনাবে, কিন্তু তবু বলা দরকার যে সেই ১৯১৭ সালে সেই দোকানে একটি মহিলাকে দেখেছিলাম যিনি স্বাধীন ভাবে একা সেইখানে এসেছিলেন। দ্বিবিধ কারণে এটি মনে আছে। প্রথমতঃ দুর্লভ ব'লে, দ্বিতীয়তঃ (এবং প্রধানতঃ) তাঁর অঙ্গে দুটি ঘড়ি ছিল ব'লে। এ রকম কখনো দেখিনি। একটি ঘড়ি হাতে, অন্যটি বুকে, আঁচলের পিনের সঙ্গে ঝোলানো। বুকেরটি আমরা দেখছি, হাতেরটি তিনি নিজে। এর উদ্দেশ্য কি ভাবতে পারিনি। শুধু অলঙ্করণের জন্য কি কেউ দুটি ঘড়ি ব্যবহার করে?

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন সারদারঞ্জন রায় (এস. রায় নামে খ্যাত) সংস্কৃতের নোট লিখতেন এবং ক্রিকেট খেলতেন। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (জে. আর. ব্যানার্জি)। অধ্যাপকবৃন্দ সবাই আদ্যাক্ষরে পরিচিত ছিলেন, সেজন্য কোনো কোনো নাম এখন ভুল হয়ে গেছে। এ-ডি—অচ্যুত দত্ত, এস-বি—শিশিরকুমার ভাদুড়ি; এম-এস—মণি সেন; কে-বি—কালাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; কে-এন—কুঞ্জলাল নাগ; ইউ-এন—উপেন্দ্র নাগ; আর-কে-ভি—রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ; পি-আর—পূর্ণ রায়; কে-জি—ক্ষীরোদ গুপ্ত; আই-বি-এস—ইন্দ্রভূষণ সেনগুপ্ত: আর-ভি—রাধারমণ বিদ্যাভূষণ; এম-সি—মাধবদাস চক্রবর্তী।

আমার কম্বিনেশন ছিল সংস্কৃত ও দর্শন। কয়েকজন অধ্যাপকের শিক্ষণ রীতি স্পষ্ট মনে আছে। জ্ঞানরঞ্জন ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিদে মানুষ। তিনি অবিরাম বক্তৃতা দিতে পারতেন। ইংরেজী বার্ক পড়াতেন ও দর্শন বিভাগে সাইকোলজি পড়াতেন। পড়াতে পড়াতে কখনো কোনো উপলক্ষে নিজের কথা তুলতেন। কি ভাবে তিনি গ্রীক ল্যাটিন শিখেছিলেন, সংস্কৃত শিখেছিলেন, বলতেন। প্যারাডাইস লস্ট প্রায় সব মুখস্থ করেছিলেন। তিনি বলতেন, আমি স্বভাবতঃ কবি, 'কিন্তু দার্শনিক হয়েছি ঘটনাক্রমে। জার্মান ফরাসী ভাষা সম্পর্কে বলতেন 'Only a smattering of German and French.' সাইকোলজি পড়াতে পড়াতে একটি গল্প বললেন একদিন। তাঁর বাড়িতে রাত্রে চোর ঢুকেছিল। শব্দে জেগে উঠে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে পিস্তলটা নিয়ে আয়, চোর এসেছে। আসলে পিস্তল তাঁর কোনো দিনই ছিল না, কিন্তু চোরকে ভয় দেখানো দরকার, নইলে অনিষ্ট করবে, তাই এই উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়েছিলেন এবং তাতে সফল হয়েছিলেন। চোর পিস্তলের কথা শোনামাত্র পালিয়ে গিয়েছিল। পড়াবার সময় তিনি বার বার বলতেন, 'to take recourse to' কখনো লিখো না, ওটি ইংরেজী নয়—ওটি বাঙালী-ইংরেজী। ইংরেজরা বলে 'to have recourse to'—। আরও একটা বাঙালী-ইংরেজী তোমরা কখনো লিখবে না—অর্থাৎ 'class friend' লিখবে না, বলবে না। ইংরেজরা ঐ কথাটি জানে না, তাদের ভাষায় সহপাঠীকে class-mate বা class-fellow বলে। মগজে হাতুড়ি পিটিয়ে এই কথাগুলি তিনি ছাত্রদের মনে গেঁথে দিতেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি যেমন ছিলেন চেহারায়, তেমনি ছিলেন পোষাকে। প্রায় প্রতিদিন নতুন পোষাকে আসতেন। সর্বদা বেশ একটা হাসিখুশি ভাব। উচ্চারণ এবং বলবার ভঙ্গি ছিল চমৎকার। ভাষাতত্ত্ব পড়াতেন। ক্লাসে একদিন বক্তৃতা দেবার সময় দেখেন একটি ছেলে ঘুমোচ্ছে। তিনি মাথা উঁচু ক'রে বার বার তার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন। তখন তার পাশের ছাত্র তাকে জাগিয়ে দিলে শিশিরকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "Were you sleeping ?" ছেলেটি উত্তর দিল "No, sir." শিশিরকুমার আবার হেসে বললেন "Oh, I beg your pardon". কথাটি এমন ভঙ্গিতে বললেন যাতে ক্লাসের সবাই একসঙ্গে হেসে উঠেছিল। এই ভাষাতত্ত্বের ক্লাসেই একদিন এক ছাত্র একটি অপ্রচলিত ইংরেজী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে শিশিরকুমার তৎক্ষণাৎ "Do I look like a dictionary ?" ব'লেই যেমন পড়াচ্ছিলেন তেমনি পড়িয়ে যেতে লাগলেন গম্ভীরভাবে।

ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাসও নিতেন তিনি মাঝে মাঝে, কিন্তু তাঁর ইংরেজী রচনালেখা শেখানোর রীতি ছিল তাঁরই নিজস্ব। এক দিন 'শাহজাহান' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন আগাগোড়া। তারপর বললেন যা শুনলে তা সংক্ষেপে ইংরেজীতে লেখ। আরও এক দিন 'মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে' ইত্যাদি সবটাই আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির নাম কলিকা। বললেন 'যা শুনলে তার ভাবার্থ ইংরেজীতে লেখ।' শিশিরকুমারের আবৃত্তি আমার এই প্রথম শোনা।

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় চিত্র

ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি, এবং তারপর বলা—'এর ভাবার্থ ইংরেজীতে লেখ," শিশিরকুমার ভাদুড়ির এ শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব এবং মনোহর। যাঁরা ইংরেজী কবিতা পড়াতেন তাঁরাও যদি ক্লাসে বার বার শুধু কবিতা এই ভাবে আবৃত্তি করতেন, কবিতার ছন্দ এবং শব্দ ঝঙ্কার আমাদের কানে বার বার ধ্বনিত করতেন, তা হ'লে ইংরেজী কাব্য গোড়া থেকেই হয় তো সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু পড়বার রীতি তা নয়। রীতি হচ্ছে ক্লাসে এসেই কবিতার প্রথম লাইন প'ড়ে তার ব্যাখ্যা শোনানো। ৪৫ মিনিটে হয় তো ৬ লাইন পড়া হল। অংশ জুড়ে জুড়ে বহুদিন ধ'রে মোট চেহারার পরিচয়। সামগ্রিক রূপ তাতে ধরা পড়ে না, সে সামগ্রিক রূপ অনেকগুলি অংশের যোগফলে তৈরি হয় না।

শিশিরকুমার ইংরেজী পাঠ্যের নোট লিখতেন, যতদূর মনে পড়ে নোট বইতে তাঁর নাম ছাপা হ'ত না। সেন রায় ছিলেন তার প্রকাশক। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে পাশাপাশি কয়েকটি প্রকাশক ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বভাবতই প্রতিযোগিতা ছিল। একদিন এক ইংরেজী প্যাম্ফলেট নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রমহলে খুব হৈচৈ শুরু হ'ল। এই প্যাম্ফলেটের লেখক ছিলেন জে. এল. ব্যানার্জি। তিনিও ছিলেন অন্য প্রকাশকের নোট লেখক। তিনি সেন রায়ের প্রকাশিত ইংরেজী নোটের ভুল দেখিয়ে সেই ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। শিশিরকুমারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে আমরা ম্রিয়মাণ। কিন্তু বেশি দিন অপেক্ষা করতে হ'ল না। পাল্টা প্যাম্ফলেট বেরোল। শিশিরকুমার দেখালেন (ইংরেজী-পণ্ডিতদের প্রচুর প্রমাণ সহ) যে তাঁর শব্দপ্রয়োগ কোথাও ভুল হয়নি, জে. এল. ব্যানার্জিই ভুল করেছেন। তখন আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, যেন একটা বড় যুদ্ধে আমরা জিতে গেলাম। একটি মাত্র 'ভুল' প্রয়োগের কথা মনে আছে।

জে. এল. ব্যানার্জি বলেছিলেন sweet-scented flower ভুল প্রয়োগ, হবে sweet-smelling flower। শিশিরকুমার প্রমাণসহ দেখিয়েছিলেন sweet-scented flower অতি নির্ভুল ইংরেজী, ইংরেজ-সমর্থিত ইংরেজী।

পি. রায় চেহারায় ছিলেন প্রায় ইউরোপীয়। শাদা চুল, গৌরকান্তি, গালে গোলাপী আভা। শাদা স্যুট প'রে এলে বেশ দেখাত। পড়াতেন ঠিক সাহেবী ধরনেই। ল্যানডরের 'ইমেজেনারি কন্‌ভারসেশনস' পড়াতেন তিনি। কুঞ্জলাল নাগ পড়াতেন শেক্সপীয়ারের নাটক। চেহারায় কিছু শীর্ণ ছিলেন, চোখা নাক, হ্রস্বদেহ। তিনি ছিলেন গোড়া শেক্সপীয়ার ভক্ত। অঙ্গভঙ্গি সহ অভিনয় করতেন মাঝে মাঝে। একদিন চাদরে মাথা ঢেকে ম্যাকবেথের উইচ সেজে চেস্টনাট চিবোলেন শব্দ ক'রে (অর্থাৎ যেন উইচ চিবোচ্ছে)। টীকাকার ভেরিটির উপর তিনি মহা খাপ্পা ছিলেন। ভেরিটির নোট-সহ মুদ্রিত এডিশনগুলিই আমরা পড়তাম। তিনি মাঝে মাঝে ভেরিটির ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর মতভেদ জানিয়ে বিদ্রূপপূর্ণ সুরে বলতেন, "ভেরিটি নয়, যেন বেড়িটি।--শেক্সপীয়ারের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে!"

ডাক্তার বিমলাচরণ ঘোষ (বি. সি. ঘোষ নামে প্রসিদ্ধ) পড়াতেন ইংরেজী 'ডিস্কাভারি' নামক একখানি বই। এই বইখানার কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি, পিঁপড়ে-দর্শন প্রসঙ্গে। এর লেখক আর. এ. গ্রেগরি। এ রকম রোমাঞ্চকর বই আমি আর পড়িনি। যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা কি ভাবে নিরহঙ্কারের মনোভাব নিয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সেবা ক'রে গেছেন তার কাহিনী। এমন চমৎকার ভাষায় লেখা, বিজ্ঞানীদের জীবনের মর্মস্পর্শী আত্মত্যাগের ঘটনাগুলি এমন অদ্ভুতভাবে সঙ্কলিত এবং বিন্যস্ত যে পড়তে বসলে মন আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। বি. সি. ঘোষ এক একটি কাহিনী পড়াতে পড়াতে নিজেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতেন। তিনি ছিলেন খুব সংযতবাক, মধুরভাষী এবং নিরহঙ্কার, আর বইতে ছিল মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শনের কথা। তাই তাঁর ক্লাসে ব'সে কখনো মনে হ'ত যেন কোনো দার্শনিকের বক্তৃতা শুনছি, কখনো মনে হ'ত বিজ্ঞানের ক্লাসে বিজ্ঞান পড়ছি।

আর. কে. ভি. ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। সংস্কৃত ও বাংলা পড়াতেন। তাঁর মতো রসিক ব্যক্তি অধ্যাপকদের মধ্যে আর দেখিনি। বিদ্যাসাগরের আমলের লোক। তাঁর কাছে ছাত্ররা একেবারে স্বাধীন। তিনি নিজেই সবাইকে খুব প্রশ্রয় দিতেন, নিজে খুব গম্ভীর থেকেও আর সবাইকে হাসাতেন। একদিন ক্লাসে ঢুকে দেখি রোল-কল আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আমার নম্বরটি পার হয়ে গেছে। আমি এসে আর. কে. ভি.র সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম ডেস্কের সামনে ঝুঁকে। উদ্দেশ্য—সবার রোল নম্বর ডাকা শেষ হয়ে গেলে আমারটিতে 'প্রেজেন্ট' লিখিয়ে নেব। ডাকা শেষ হ'ল, আর. কে. ভি. কে আমার নম্বরটি বললাম। তিনি আমার মুখের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে মাথাটি আমার প্রায় মুখের কাছে এগিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ির পাশে বাড়ি না এক গলিতে বাড়ি ?' এ প্রশ্নের ইঙ্গিত এই যে আমি নিশ্চয় অন্যের প্রক্সি দিচ্ছি, কিন্তু যার জন্য আমি এতটা কষ্ট স্বীকার করছি, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি ভাবে গ'ড়ে উঠেছে, পাশাপাশি বাড়ি থাকার দরুন, না এক গলিতে বাড়ি হওয়ার দরুন।—অর্থাৎ বন্ধুত্বটা খুব গভীর না শুধু মুখের আলাপ।

একদিন ক্লাসের মধ্য থেকে কে একজন খুব গম্ভীর ভাবে ব'লে উঠল, "সার, এই বুড়ো বয়সে আর পারি না।" এর উত্তরে আর. কে. ভি. অম্লান বদনে বললেন, "বিয়েটা হয়ে যাক আর কি, তারপর সব ছেড়ে দিও।" আর একদিন এক জন জিজ্ঞাসা করল, "লিখতে এত ভুল হয়, কি করি বলুন তো, সার ?" আর. কে. ভি. বললেন, "তবে একটি গল্প শোন : বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটি ছাত্র জিজ্ঞাসা করেছিল, 'নির্ভুল লেখা শেখা যায় কি ক'রে ?' তার উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন 'খুব সহজ একটি উপায় আছে, সেটি অনুসরণ করলে কখনো ভুল হবে না।' ছেলেটি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল 'বলুন সে কি উপায়, আমি পরীক্ষা ক'রে দেখব।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বললেন, 'কখনো লিখো না'।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই গম্ভীর অর্থপূর্ণ উপদেশটি আর কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না, তবে আর. কে. ভি. বলেছিলেন কথাটি তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছিলেন।

কলেজের নতুন হস্টেলে এলাম ১৯১৮তে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর

চার তলা বাড়ি, বাড়ির নম্বর ১৭। টাটকা-নতুন বাড়িতে বেশ একটা তৃপ্তি। এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই ডেঙ্গুজ্বর সংক্রামক ভাবে আরম্ভ হল পৃথিবী জুড়ে—তার নাম হল war-fever বা যুদ্ধ-জ্বর। সেই জ্বরে আক্রান্ত হলাম আমি। অত্যন্ত কষ্টদায়ক জ্বর, সমস্ত গায়ে হাত পায়ে তীব্র যন্ত্রণা, পাশ ফিরতে লোকের সাহায্য দরকার হয় এমান অবস্থা। আমি অসহায় ভাবে প'ড়ে ছটফট করছি চারতলার ঘরে শুয়ে।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যা একই সঙ্গে ট্র্যাজিক এবং কমিক। আমার সেই অত্যন্ত অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিকেলের দিকে প্রবল ভূমিকম্প আরম্ভ হ'ল, অন্তত চার তলার ঘরে তার ঝাঁকুনি খুব জোরেই চলছিল। এমন অবস্থায় কিভাবে যে কি ঘটে গেল আমি তার জন্য মোটেই দায়ী নই, কিন্তু যখন কিঞ্চিৎ সম্বিত ফিরে এলো তখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম হস্টেলের বাইরে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর অত্যন্ত অসম্বৃত অবস্থায়। আত্মরক্ষার সহজাত প্রেরণা থেকে এ কার্য করেছি, এবং চারতলা থেকে আর সবার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ছুটে এসেছি, বুঝতেই পারিনি যে আমি অসুস্থ, আমি যন্ত্রণায় কাতর, পাশ ফিরতে পারি না, বিছানায় উঠে বসতে পারি না। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! নিচে নামতে এক মিনিটের বেশি লাগেনি, অথচ উঠতে হ'ল সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রে, প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে, এবং অন্যের সাহায্যে।

দেহ আর মনের সম্পর্ক বিষয়ে অল্প জানা ছিল, কিন্তু মন বিশেষ সময়ে দেহের সর্বময় কর্তৃত্ব নিতে পারে, এবং আপন গরজে একটি অসমর্থ দেহকে সুস্থ দেহের মতো চালনা করতে পারে, এ অভিজ্ঞতা নতুন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পড়েছি তিনি একবার বিছের কামড়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, এমন সময় তিনি মনকে বোঝালেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক এক ব্যক্তিকে বিছে কামড়িয়েছে, তাতে তাঁর কষ্ট হবে কেন। এই ভাবে সত্যিই তিনি দংশন-বেদনাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পেরেছিলেন। সতীদাহ সম্পর্কে পড়েছি, অনেক সতীই দাহযন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারতেন এইভাবে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। সবই চিত্তনিয়ন্ত্রণের ব্যাপার। কিন্তু আমার ঘটনাটি সজ্ঞান নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন নেই। আমার মন আপন গরজে এবং আপন বিচার-বুদ্ধির অপেক্ষা না ক'রে, বেতাল যেমন মৃতদেহকে আশ্রয় ক'রে তাকে

জীবিত ক'রে তোলে, তেমনি ভাবে একটি অপটু দেহকে সাময়িকভাবে পটু ক'রে নিয়েছিল। তার যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে কার্যোদ্ধার ক'রে নিয়েছিল। এবং প্রয়োজন শেষ হতেই যথাপূর্বং। তবু মনকে ধন্যবাদ জানিয়েছি এ জন্য।

নতুন হস্টেলে কয়েকটি চরিত্র স্মরণীয় হয়ে আছে। হরিপদ সান্যালের কথা আগেই বলেছি। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য চরিত্র সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন দ্বিতলবাসী। তাঁর বইয়ের শেলফ পরিচ্ছন্ন, একখানি বই নেই। টেবিলের ড্রয়ারে একখানা মাত্র খাতা, উপরে আয়না চিরুনি এবং একটি ক্ল্যারিওনেটের বাক্স। দেখে খুবই অভিনব মনে হয়েছিল। খুব একটা জোরালো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চেহারা। কলেজের এক নাটকে খুব ভাল অভিনয় করেছিলেন, কোচ করেছিলেন শিশিরকুমার। একদিন বিকেলে হৈ হৈ কাণ্ড। দোতলার কয়েক জন ছাত্র সুধাংশুর বিরুদ্ধে প্রিফেক্টের কাছে অভিযোগ করলেন, "সুধাংশুবাবু ক্লারিওনেট বাজাচ্ছেন, এতে আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে, আমরা পড়তে পারছি না।"

বেলা তখন সাড়ে চারটে। অপরাধীর ডাক পড়ল। দেখলাম তিনি অত্যন্ত বিরক্তভাবে এগিয়ে আসছেন, অপরাধীর চেহারা আদৌ নয়। তাঁকে ছাত্রদের অসুবিধার কথা বলা হল। তিনি সব শুনে প্রিফেক্টের দিকে খুব একটা দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "এঁরা বললেন অসুবিধে হচ্ছে, আর আপনি সে কথা শুনলেন? এখন বেলা সাড়ে চারটে, এটা পড়বার সময় নয়, খেলার সময়। এখন যদি এরা বলেন আমরা পড়ছি, আর আপনি এঁদের প্রশ্রয় দেন, তা হলে অপরাধ হবে আপনার। এ সময়ে প'ড়ে এঁরা স্বাস্থ্য নষ্ট করছেন, এই পাপ কাজে আপনি এঁদের প্রশ্রয় দেবেন না, দিলে এঁদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, এবং তার জন্য দায়ী হবেন আপনি। এঁদের ব'লে দিন, ঘরে ব'সে থাকার সময় এটি নয়, এখন কেউ পড়ে না।"

খুব জোরের সঙ্গে কথাগুলো ব'লে অপরাধী অভিজাত ভঙ্গিতে ঘরে ফিরে গেলেন। বিচারক স্তম্ভিত। তাঁর বলবার কিছুই ছিল না। সুধাংশুর প্রত্যেকটি কথা সত্যি। ছেলেরা স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে পড়ছে এটি সত্যিই অন্যায়। খেলার সময় পড়বে কেন? বিকেলে ঘরে বন্ধ থাকবে কেন?

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুধাংশুর ঘরে ক্লারিওনেট বেজে উঠল।

সুধাংশুর সব কথাই যুক্তিসঙ্গত, শুধু তাঁর লজিকে একটি ত্রুটি ছিল। তিনি নিজেই সাড়ে চারটেয় ঘরে ব'সে স্বাস্থ্য নষ্ট করছিলেন।

এঁর সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছিল, বেশ মধুর চরিত্র। এবং একটি যোগাযোগও আবিষ্কার হয়েছিল—ইনি বনফুলের ভগিনীপতি।

ক্ষিতীশচন্দ্র সর্বাধিকারী আর এক চিত্তাকর্ষক চরিত্র। মেদিনীপুরের ডাক্তার শচীন্দ্র সর্বাধিকারীর পুত্র, আই. এসসি'র ছাত্র। ক্ষিতীশ অল্পদিনের মধ্যেই অতুলানন্দ ও আমাকে একেবারে প্রিয়তম বন্ধু বানিয়ে ফেলল। এ রকম দুর্দান্ত প্রাণোচ্ছল ছেলে হস্টেলে আর ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তার বিরামহীন কল্লোল প্রবৃত্তি, আমাদের পাঠের মনোযোগিতাপ্রসূত অস্বস্তিকে ভেঙেচুরে একাকার ক'রে দিত। এর মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগত তার বাচিক পরিচ্ছন্নতা। যে সব সময় বক্তৃতা দিত, এবং সে বক্তৃতা কাব্য না হলেও তার প্রত্যেকটি বাক্য ছিল রসাত্মক। এক দিন থিয়েটার থেকে ফিরতে তার একটু রাত হয়েছিল, সে আগে হস্টেলে জানিয়ে যেতে পারেনি, সেজন্য গেট বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। অগত্যা ক্ষিতীশকে গেট টপকে ভিতরে আসতে হল, কিন্তু ধরা প'ড়ে গেল। গুরুতর কিছু নয়, কিন্তু ক্ষিতীশ পরদিন এই উপলক্ষে একটি গল্প ফেঁদে বসল। বক্তৃতার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে—"একদা যে হস্টেল ছিল, সেই হস্টেলের গেট টপকে শ্রীকৃষ্ণ ভিতরে লাফিয়ে পড়লেন। হস্টেলে আয়ান ঘোষ বাস করতেন সপরিবারে, কৃষ্ণকে ধ'রে ফেলে বললেন, 'বাট. হোয়াট ডু ইউ মীন'?" ইত্যাদি ক'রে দীর্ঘ এক কাহিনী, সবই উপভোগ্য হয়েছিল এটি।

খাবার ঘরেও ক্ষিতীশ নিষ্ক্রিয় থাকত না। হস্টেলের চেহারা যেমন ঝকঝকে তকতকে, তেমনি তার খাবার ঘরের বাসনপত্র। ভারী কাঁসার থালা বাটি গেলাস, সব নতুন। সব মিলিয়ে বেশ তৃপ্তিকর। একসঙ্গে অনেকে খেতে বসতাম। সংখ্যা মনে নেই। পঞ্চাশ ষাট কিংবা বেশি। ক্ষিতীশ আমি প্রায় একসঙ্গে পাশাপাশি বসতাম। মণি মুখুজ্জে ক্ষিতীশের সহপাঠী, সেও বসত আমাদের সঙ্গে। সপ্তাহে এক দিন মাংস হ'ত,

সকালের ও বিকেলের খাবার ঘরে ঘরে দিয়ে যেত। থাকা ও খাওয়া মিলিয়ে ১৮ টাকা মাসে বাঁধা রেট।

মাংস হত দু রকম, পেঁয়াজযুক্ত ও পেঁয়াজহীন—নাম যথাক্রমে আমিষ ও নিরামিষ মাংস। মাছ বা মাংস, অথবা ডাল, পৃথক বাটিতে পরিবেশন করা হ'ত। একদিন মাংস পরিবেশন করা হচ্ছিল। ঠাকুর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছিল—আমিষ চাই কি নিরামিষ চাই। ক্ষিতীশের কাছে এলে সে এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল যে সে যেন আর এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাবছেই না কিছু, যা-হোক একটা দিলেই হল—এই রকম ভাবটা। অথচ সবই সে লক্ষ্য করছে, জানে তাকে পেঁয়াজযুক্ত মাংস দেওয়া হয়েছে। দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাটিসুদ্ধ ঝোল থালায় ঢেলে একটু মুখে দিয়েই ঠাকুরকে ডেকে বলল, "আমিষ মাংস দিয়েছ আমাকে? ছি! ছি!—এ আমি খাই না"—ব'লে সে সবটা মাংস ও ঝোল ঠেলে ঠেলে থালার একপাশে সরিয়ে দিল। ঠাকুর মহা অপরাধীর মতো নিরামিষ মাংস এক বাটি রেখে গেল থালার পাশে। ক্ষিতীশ তখন সে মাংসও ঢেলে নিয়ে দুটিতে মিশিয়ে ভোজন সমাধা করল।

আরও একদিনের ঘটনা। গলদা চিংড়ি রান্না হয়েছিল। ক্ষিতীশ মাছটি মুখে দিয়েই মাটিতে ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল, "ঠাকুর পচা চিংড়িটাই আমাকে দিলে?" ঠাকুর দেখল কথাটা মিথ্যা নয়, মাছ মাটিতে প'ড়ে আছে। সে তখন আর এক বাটি থেকে নতুন একটা মাছ ও ঝোল ক্ষিতীশের পাতে ঢেলে দিল। ক্ষিতীশ তখন ফেলে দেওয়া মাছটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে খেতে লাগল। দুষ্টুমি বুদ্ধির অন্ত নেই। একদিন মাছ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতীশ দূরে দরজার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল "আরে! জে. আর. ব্যানার্জি খাবার ঘরে!" পাশে মণি মুখুজ্জে বসেছিল, সবাই দরজার দিকে তাকাতেই ক্ষিতীশ মণির বাটি থেকে তার মাছের খণ্ডটি তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে। পরে একদিন ক্ষিতীশেরই কৌশলে ক্ষিতীশকেই জব্দ করতে চেয়েছিল মণি, কিন্তু পারে নি। "আরে শিশির ভাদুড়ি এসেছেন খাবার ঘরে!" বলতেই ক্ষিতীশ নিজের মাছের বাটিটি ডান হাতে ঢেকে বলল, "কোথায়?"

ক্ষিতীশই কি কেপমারী কৌশলের প্রথম উদ্ভাবক?

আরও কয়েক বছর পরের একটি ঘটনা বলি। বলাইচাঁদ (বনফুল) তখন সম্ভবত মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে। ক্ষিতীশও মেডিকেল কলেজে পড়ত একই সঙ্গে, কিন্তু ওদের পরস্পর পরিচয় ছিল না। আমার কাছে বলাই সম্পর্কে অনেক কথা শুনে ক্ষিতীশের প্রবল আগ্রহ হয় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে। সেটি অত্যন্ত সাধারণ এবং স্বভাবিক ভাবেই হ'তে পারত, কিন্তু ক্ষিতীশের পথ আলাদা। সে তখনই আমাকে বলল, ভাই, বনফুলের কোনো একটা কবিতা যোগাড় ক'রে দিতে পার? সেটি সম্ভবত ১৯২৩ সাল। সে সময়ে তার অনেক কবিতা নানা কাগজে বেরিয়েছে, একটি যোগাড় ক'রে দেওয়া গেল। ক্ষিতীশ সেই দিনই বলাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। সে ঐ কবিতায় যে-কোন একটি সুর লাগিয়ে বলাইয়ের পিছনের একটি আসনে বসে আপন মনে গাইতে লাগল। এইটিই আলাপের প্রথম সূত্রপাত।

ক্ষিতীশ বর্তমানে মেদিনীপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি! আরম্ভের সঙ্গে শেষ দিকের অবশ্যই একটি যোগ সূত্র আছে—দীর্ঘকালের দূরত্বে ব'সে সেটি অনুসরণ করা আমার সাধ্য নয়।

এই হস্টেলে দেখা হল রাজেন সেনের সঙ্গে। ১৯১১ সালের বিজয়ী মোহনবাগান দলের যে লোভনীয় ফোটোগ্রাফ ক্ল্যাস-সেভেনে পড়তে নানা কাগজে দেখেছিলাম, তার মধ্যেকার প্রত্যেকের চেহারা মনে গাথা ছিল। তার পর কোন্ সালে মনে নেই, বিজয় ভাদুড়ির খেলা আমি দেখেছিলাম। আমার ১৯১১ সালের সেই রোমাঞ্চকর বিজয়-স্মৃতিতে শ্রদ্ধার গর্বের এবং বিস্ময়ের আসনে এঁরা সবাই ছিলেন উজ্জ্বল। সেই ফোটোগ্রাফ থেকে যেন রাজেন সেন জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন সামনে। আর তাঁরই সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ছি, এক হস্টেলে বাস করছি! এ ঘটনা আমার কাছে খুবই আশ্চর্য মনে হয়েছিল।

রাজেন সেনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হল। আমি সেই বেঁটে লোকটির লোহার মতো শক্ত পেশী দেখে অবাক হতাম, এবং তিনি আমার হাড়ের উপরকার চামড়ার আবরণ দেখে অবাক হতেন। খুব মিষ্টভাষী ছিলেন এবং খুব মরালিস্ট ছিলেন। একদিন আরও অবাক হলাম দেখে শ্রীশিশির-

কুমার ভাদুড়ি তাঁকে রাজেনদা ব'লে ডাকছেন। পড়বার সময় অবশ্য শিশিরকুমারই দাদা হতেন ক্লাসের মধ্যে। বিদ্যাসাগর কলেজের আর এক বিখ্যাত খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। তিনি হস্টেলে থাকতেন না। তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল। কলেজের কোনো খেলাই কখনো দেখতে যাইনি, শুধু খেলোয়াড় দেখেই খুশি।

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাওয়া প্রায় নিয়মিত ছিল। অতুলানন্দের সঙ্গে একত্র যাওয়া হ'ত বেশি। অবশ্য এই সময় আমায় আবার ম্যালেরিয়ায় বড়ই কষ্ট দিতে লাগল, সে জন্য মাঝে মাঝে শুয়ে থাকতে হ'ত। আমাদের ভ্রমণ সীমা এ সময় গোলদীঘির বেশী বিস্তৃত ছিল না। এখানে এলে নানা চিত্তাকর্ষক জিনিসে মানসিক হাওয়া পরিবর্তন ঘটত সহজে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভা প্রায় লেগেই থাকত। সেখানে স্যর আশুতোষ চৌধুরী অথবা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকবার সভাপতির পদে দেখেছি। কলেজ স্কোয়ারে খোলা জায়গায় সভা প্রায় লেগেই থাকত। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা ছিল আকর্ষক জিনিস। তিনি তাঁর বক্তব্য শ্রোতার মর্মে গেঁথে দিতে পারতেন। তখন মাইক্রোফোন লাউডস্পীকার ছিল না, কিন্তু তখনকার বক্তাদের এসব দরকার হ'ত না। শ্রোতার সংখ্যাও সীমাবদ্ধ ছিল সব সময়। ইনস্টিটিউটে যত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাই হোক, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু ভিড়ে গণ্ডগোল হ'তে দেখিনি।

বিপিন পালের গলা ছিল খুব জোরালো। তিনি কোনো কথাই দ্রুত বলতেন না, সব দিকে ঘুরে ঘুরে সব দিকের শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য ক'রে বলতেন একই কথা। এ রকম বক্তৃতা আর কাউকে দিতে দেখিনি।

সন্ধ্যাবেলা কলেজ স্কোয়ারে উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতেন। হিন্দুর শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করতেন যুক্তি দিয়ে। কিন্তু সে ব্যাখ্যা সাধারণ শ্রোতার মনঃপূত হ'ত না, সভায় ভীষণ প্রতিবাদ উঠত। অতুলানন্দ ও আমি তাঁর ব্যাখ্যার নতুনত্বে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁকে কলেজ স্কোয়ারে দেখলেই শ্রোতার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতাম। রামায়ণ মহাভারত বেদ উপনিষদ তিনি এমন মুখস্থ করেছিলেন যে তাঁর সংগৃহীত সংস্করণগুলির যে-কোনো পাতা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন, পাতার নম্বর এবং শ্লোকের

নম্বর সমেত। লম্বা দাড়ি চুল, প্রায় সবটাই পাকা, বেঁটে মানুষ, গায়ে গেরুয়া রঙের ঢিলে লম্বা জামা, গেরুয়া রঙের ধুতি।

একদিন সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতা শুনছি, তিনি কোনো একটি শ্লোকের লৌকিক ব্যাখ্যা করছিলেন, শ্লোকটি এখন আর মনে নেই। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে হিংস্র প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল, এবং তাঁর গায়ে কে যেন ঢিল ছুড়তে লাগল। বিপজ্জনক অবস্থা, কেউ কেউ মারবে ব'লে এগিয়ে এলো। অতুলানন্দ ও আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে, এবং তাঁকে উদ্ধার ক'রে বাইরে নিয়ে এলাম জনতার মাঝখান থেকে।

উমেশচন্দ্র আমাদের ছাড়লেন না, নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে, এবং কত গল্প করলেন। গল্প করতে করতে বই খুলছিলেন মাঝে মাঝে আমাদের দেখাবার জন্য। কয়েকটি আলমারি বোঝাই বই আলমারিরও অদ্ভুত সব নাম ছিল। একটির নাম ছিল 'নৈমিষারণ্য'। নামগুলি আলমারির গায়ে লেখা। তাঁর কোনো পুত্র তখন অ্যামেরিকায় ছিলেন, তাঁর ফোটো দেখালেন—এই রকম মনে পড়ে।

পাবনা হস্টেলে থাকতে অ কৃমণের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি, কলকাতার হস্টেলে এসে উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম। উভয়ত্রই 'হীরো' সেই একই আমরা দু জন—অতুলানন্দ ও আমি। সৌভাগ্যের বিষয়, এর পর থেকে আর একদিনও অন্য কাউকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিতে হয়নি, কেননা পরবর্তী ত্রিশ চল্লিশ বছর ধ'রে আমরা শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'রে আসছি।

কাছাকাছি সময়ে (১৯১৮ কি ১৯১৯ মনে পড়ছে না)—বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা শুনলাম টিকিট কিনে। জগদীশচন্দ্র তাঁর ক্রেস্কোগ্রাফের ক্রিয়া দেখালেন—অন্ধকার দেয়ালে একটি আলোর গোলক প্রতিফলিত ক'রে। গাছ উত্তেজক খাদ্যে কি ভাবে সাড়া দেয় এবং বিষ দিলে কি রকম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তার ছবি দেখা গেল এর সাহায্যে। সোজাসুজি দেখবার উপায় নেই, গাছের উত্তেজনা বা নিষ্ক্রিয়তা এক লাখ গুণ বর্ধিত ক'রে একটি বলের মতো আলোর প্রতিফলনের সাহায্যে দেখানো। এই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র নিজের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বলেছিলেন সে দিন। পদার্থ বিদ্যায় এবং বিশেষ ক'রে বেতার বিজ্ঞানে তাঁর

দানের কথা উল্লেখ করেছিলেন মনে আছে। 'My galena receiver' কথাটি বার বার বলেছিলেন, এখনও কানে বাজছে। জগদীশচন্দ্রকে দেখে সেদিন ধন্য হয়েছিলাম। বক্তৃতা শেষে তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপও করেছিলাম।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, শোভন সংস্করণ তার নাম। একই সঙ্গে পুরনো সংস্করণের কাব্যগ্রন্থ সমূহ (যৌবনস্বপ্ন, প্রেম, কল্পনা, যাত্রা, প্রভৃতি নামে বিভক্ত) ও ক্ষণিকা (পকেট এডিশন) ও গদ্যগ্রন্থ--চারিত্র পূজা, লোকসাহিত্য, পথে ৵ আনা ক'রে বিক্রি হ'ত—আমি অনেক কিনেছিলাম, এখনও কিছু আছে।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। দেখলাম সবাই প্রকাশ্যে বই খুলে নকল করছে। এই ব্যাপারটি আমার মফঃসলীয় দৃষ্টিতে খব ভয়াবহ বোধ হয়েছিল। কল্পনার বাইরে ছিল। পাবনা শহরে ম্যাট্রিকলেশন পরীক্ষা দিয়েছি নিস্তব্ধ ঘরে। কোথায়ও কারো মুখে একটি শব্দ নেই। পরীক্ষা একটি পবিত্র এবং নিষ্ঠার ব্যাপার ব'লে মনে হয়েছে এ জন্য। ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষাও পাবনা শহরে দিয়েছি, সেও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনে। তাই এ পরীক্ষায় প্রথমত মনে আঘাত লাগল, এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই সে আঘাত কাটিয়ে উঠতে বেশি দেরি হ'ল না। পরদিন থেকে আমিও পাশের খোলা-বইয়ের দিকে চাইলাম।

শুনলাম পরীক্ষার খাতা দেখা হয় না, অতএব টোকা না টোকা সমান। পরীক্ষাটা লোক দেখানো। উদ্দেশ্য গোড়ায় ভাল ছিল সন্দেহ নেই, কারণ, পরীক্ষার নামে কিছু পড়া পড়বে ছেলেরা, এবং উত্তর লেখা অভ্যাস করবে। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা এত যে এই উদ্দেশ্যে তাদের নিয়োগ করা সম্ভব হয় নি। আজকের দিনে এর পরিবর্তন হয়েছে সম্ভবত; কিন্তু তখন শুনেছি বিদ্যাসাগর কলেজের এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পরীক্ষায় টোকা এখানে 'বার্থ রাইট' বিবেচিত হ'ত। আধ্যাপকেরা বাধা দিতেন না।

ক্ষীরোদ গুপ্ত দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন; অতি সদাশয় ব্যক্তি, শিশুর মতো সরল, ছেলেদের খুব ভাল বাসতেন। মেটাফিজিক্সের ক্লাস হচ্ছিল, এমন সময় পাশের মেট্রোপলিটান স্কুলের টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শ পাঁচেক ছাত্র এক সঙ্গে চিৎকার ক'রে ক্লাস থেকে বাইরে

বেরিয়ে এলো। রোজ হয় এ রকম। তখন সে চিৎকার সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি ক্ষীরোদ গুপ্ত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে হেসে বলছেন আহা, এতক্ষণের রুদ্ধ শক্তি এক সঙ্গে মুক্তি পেল। তিনি পড়ানো ভুলে এই চিৎকার উপভোগ করতে লাগলেন চোখ বুজে,—মুখে মৃদু হাসি। একটা পরীক্ষার দিন তিনি গার্ড হিসেবে এলেন এবং এসে চেয়ারখানা উল্টো ক'রে ঘুরিয়ে দরজার দিকে মুখ ক'রে বসলেন। যতক্ষণ পরীক্ষা চলল, ততক্ষণ তিনি একখানা খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। নকলে বাধা দেবেন না জেনেই তিনি বিপরীতমুখী হয়েছিলেন গোড়া থেকে। বুঝলাম টোকা এখানে একটি বনেদি অভ্যাস।

ম্যালেরিয়ার জন্য নিয়মিত ক্লাসে যাওয়া হয়নি, নিয়মিত পড়ার উৎসাহও পাইনি, ধারাবাহিকতার মধ্যে বার বার ছেদ পড়েছে। শেষে এমন হ'ল যে টেস্ট পরীক্ষাই দেওয়া হ'ল না। পরীক্ষা দিলেই পাস, অথচ বসাই হ'ল না। আশা ছিল ফাইনাল পরীক্ষার আগে যদি ভাল থাকি তবে এরই মধ্যে বেশি প'ড়ে এতদিনের ক্ষতিপূরণ ক'রে নেব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হ'ল না। হস্টেলের একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি কুইনিন সহ অন্যান্য দুএকটি সহযোগী ওষুধের বড়ি ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক, তাতে জ্বর বন্ধ হ'ল না। অবশেষে গেলাম হ্যারিসন রোডে চারুচন্দ্র সান্যালের কাছে। তিনি অতুলানন্দের পরিচিত ছিলেন। তিনিও কুইনিন দিলেন, কিন্তু বড়ি নয়, মিক্শ্চার। এই মিক্শ্চারে কাজ হ'ল, কিন্তু নিয়মিত চালানো সম্ভব হ'ল না। বাল্যকাল থেকে ডি. গুপ্তের ওষুধ, এডওয়ার্ডস টনিক খেয়ে খেয়ে তিতো ওষুধ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই এক শিশির আটটি মাত্রাও শেষ করলাম না। জ্বর আবার দেখা দিল এবং মাঝে মাঝে বাড়তে লাগল। তখন হয় তো আবার দুতিন মাত্রা খেয়ে তাকে দমিয়ে রাখতাম।

অতুলানন্দ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কবিরাজ গণনাথ সেনকে আশ্রয় করল, নানা মগজপুষ্টিকর ওষুধ খেতে লাগল, মাথায় তেল মালিশ করতে লাগল, আর পড়তে লাগল। সেণ্টস্‌বেরির প্রকাণ্ড 'লিটারেচর' খানা প্রায় মুখস্থ ক'রে ফেলল। তার এক হাত মাথায় কবিরাজী তেল মালিশে ব্যস্ত, অন্য হাতে বই। আমার দুখানা হাতই পানের উপর! কোনো

বইই পরীক্ষার আগে প'ড়ে শেষ করা গেল না। অতুলানন্দ সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেল। অর্থাৎ যতটুকু কম পড়লে সে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেতে পাবত, তার চেয়ে অনেক বেশি প'ড়ে সে ঠকে গেল, আর আমার মাত্রা প্রয়োজনীয় কম পড়ার ধাপ পর্যন্তও উঠল না ব'লে আমার পাস করাই হ'ল না।

পর বছর ইংরেজী ছটি পেপার ছেড়ে দিয়ে তিনটি পেপার নিলাম। এবারেও স্বাস্থ্য প্রতিকূল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা হাল্কা হওয়াতে পার হয়ে যাওয়ায় কোনো অসুবিধে হয়নি। পরীক্ষা হয়েছিল সায়েন্স কলেজে। ১৯১৯-এর দ্বারভাঙ্গার বাড়ির অভিজ্ঞতার সঙ্গে ১৯২০-র অভিজ্ঞতা মিলল না। এবারের কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে স্তম্ভিত। পরীক্ষার হল, না বাজার! যার যেমন খুশি স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা ক'রে লিখছে। ইনভিজিলেটররা পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব নিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে এই কাণ্ড দেখে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত।

আমার খুব তাড়াতাড়ি লেখা অভ্যাস। ম্যাট্রিকুলেশনে কিংবা ইণ্টারমীডিয়েটে প্রত্যেকটি পেপার—কোনোটি আধ ঘণ্টা, কোনোটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শেষ। এক ঘণ্টার আগে হল্-থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় না—সেজন্য বড়ই অসুবিধে হ'ত। আমি যেটুকু বুঝি, শুধু সেটুকুই লিখি এবং তার পরিমাণ সব সময়েই কম।

বি. এ. পরীক্ষাতেও আমাকে লেখা শেষ ক'রে ব'সে থাকতে দেখে শুধু পাশের বন্ধুরা নয়, পাঁচ ছ জনের দূরত্বেরও অনেকে জোড়হাত ক'রে বলতে আরম্ভ করলেন, "দাদা দু-নম্বরটা একটু"—কিংবা "চার নম্বরের পয়েণ্টগুলো যদি একটু সংক্ষেপে লিখে জানান"—। সাইকোলজি পরীক্ষার দিন এটি সব চেয়ে বেশি হয়েছিল। দূরের বন্ধুদের লিখে জানাতে হ'ল, ইনভিজিলেটর তা ব'য়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেন। কখনো বললেন নিচে ফেলে দিন। নিচে ফেলে দিলে পা দিয়ে ঠেলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন।

পরীক্ষার এই কমিক দিকটি কলকাতার অভিজ্ঞতাতেই আমার কাছে প্রকট হয়। এ নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছি। পরীক্ষার যে রীতি তাতে এই টোকার ব্যাপারটাও অনিবার্য। এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি এবং

ব্যঙ্গ গল্প লিখেছি। একটি গল্পের নাম 'বাতিল পরীক্ষার কাহিনী'—প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল বছর দশেক আগে। গল্পটি "মারকে লেঙ্গে" বইতে স্থান পেয়েছে।

১৯১৯ সালে আমার সঙ্গে পাংশা-কালিকাপুরের যতীন্দ্রনাথ বাগচীর কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়। অভিভাবক-নির্দিষ্ট বিবাহ। বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এতে পণ বা কোনো রকম দান গ্রহণ করা হয় নি—বিবাহের যাবতীয় খরচ বাবা বহন করেছিলেন।

এই বছরে আমি প্রথম ক্যামেরা কিনি। ক্যামেরা সম্পর্কে আমার মনে মনে একটা অতি প্রবল আকর্ষণ ছিল বাল্যকাল থেকে। প্রথম ফোটোগ্রাফ দেখি বাবার। তাঁর অনেক ফোটোগ্রাফ। আমিও ক্লাস-টুতে পড়তে প্রথম ফোটো তোলাই। সেটি ক্লাসের ছেলেরা ও একজন টীচার মিলে গ্রুপ ফোটো। কতদিন ধ'রে চেয়ে চেয়ে দেখেছি—জলছবির পরেই এমন বিস্ময় আর অনুভব করিনি। ফোটোগ্রাফের রহস্যের কথা ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাইনি। যখনই সুযোগ পেয়েছি ফোটো তুলিয়েছি, কিন্তু কি ক'রে ছবি ওঠে তার রহস্য ভেদ করার উপায় কি? হাই স্কুলে পড়তে, ১৯১২-তেই সম্ভবত একখানা ছোট ক্যামেরার ক্যাটালগ আনাই কলকাতার হাউটন-বুচারের কাছ থেকে। বইখানি ৫ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি হবে, মোটা কাগজে বাঁধানো। তাতে ছোট ক্যামেরার বিজ্ঞাপন ছিল। নানা আকারের ছবির জন্য নানা আকারের মিনিয়েচার ক্যামেরা। ক্যামেরার ছবির পাশে পাশে সেই ক্যামেরায় তোলা ছবিও একটি ক'রে ছাপা ছিল—কি আকারের ছবি ওঠে তার ধারণা জন্মানোর জন্য। তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে ক্যামেরা—তার নাম Ticca Watch Camera (টিকা পকেটঘড়ি ক্যামেরা), দেখতে পকেট ঘড়ির মতো, তার ছবির আকার ডাক টিকিটের আকার।

এই বইখানা ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। অনেক বছর ধ'রে তাকে রক্ষা করেছিলাম। তার এক একটি পৃষ্ঠা চোখের সামনে ধ'রে মনে মনে ক্যামেরা বাছাই করেছি, কোন্‌টি আমার কেনা উচিত মনে মনে হিসেব করেছি, কিন্তু ফোটো তোলা শিখিয়ে দেবার মতো তখন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

বড় একটি ফিল্ড ক্যামেরা প্রথম স্পর্শ করি দার্জিলিঙে, ১৯১৩ সালে আমার সেই প্রথম দার্জিলিঙ দেখার চোখেই বড় ক্যামেরায় কি ক'রে ফোকাস্ করা হয় তা দেখার সুযোগ পেলাম। যেখানে উঠেছিলাম সেখানে কোনো এক ভদ্রলোকের একটি ক্যামেরা ছিল, তিনি সেটিকে বাইরে ট্রাইপডে দাঁড় করিয়ে কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে নিকটবর্তী একটি অতিকায় গোলাপ ফুলকে ফোকাস ক'রে দেখছিলেন। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাকে ফোকাস করার কৌশল দেখালেন। দার্জিলিঙের প্রকাণ্ড একটি গোলাপ ফুলের ছবি দেখলাম ফোকাসিং স্ক্রীনের উপর। উল্টো ছবি, ফুলের উঁচু মাথা নিচু দিকে। ঘষা কাঁচের উপর সবুজ পাতার সঙ্গে গোলাপফুলের রঙ কি অদ্ভুত সুন্দর যে দেখাচ্ছিল। একটি অনাবিষ্কৃত রহস্য-রাজ্যের এই প্রথম স্বাদ। জীবন ধন্য হ'ল। তারপর রাজবাড়ির লালবিহারী চক্রবর্তীকে ডেকে এনে বহুবার ফোটো তুলিয়েছি। রাজবাড়ি গিয়ে ফোটো তুলিয়েছি। ওতে একটা অপরিসীম বিস্ময় ছিল।

১৯১৭ সালে যখন ৩০নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের কলেজ মেসে থাকি, সে সময় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন আমার সহপাঠী। জ্ঞানেন্দ্রনাথ পরে ছোটদের জন্য কবিতা গল্প ইত্যাদি লিখে খ্যাত হয়েছিলেন। এঁর ফোটো তোলানোর শখ ছিল বেশ। তিনি একদিন আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন কাছাকাছি কোনো গলির মধ্যে এম. দত্ত ফোটোগ্রাফারের দোকানে। এম. দত্তের কোনো স্টুডিও ছিল না বাইরের আলোতে তুলতেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের চুল ছিল ঝাঁকড়া এবং ঢেউখেলানো। তাঁর শখ হয়েছিল সাহেবী পোষাকে ছবি তোলাবেন। সেজন্য তিনি কলার নেকটাই এবং একটি কোট কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন। দোকানে গিয়ে সেজে নিলেন এবং ঘাড় পর্যন্ত ফোটো তোলালেন। পুরো ছবি হ'ল না, ধুতির সঙ্গে কোট কলার নেকটাই আর চলবে কি ক'রে। (মাদ্রাজে চলে, ছবিতে দেখেছি।)

তাঁর তোলা হ'লে বললেন, আপনিও কলার টাই প'রে নিন। প্রস্তাবটি মনোহর। সাহেব সাজা গেল ধারকরা পোশাকে। ফোটো তোলার পর এম. দত্ত (মনোমোহন দত্ত)-কে বললাম প্লেটে কি ক'রে ছবি ওঠে দেখিয়ে দিন। মনোমোহন বাবু খুব অমায়িক লোক ছিলেন, আমাকে ডার্ক রুমে নিয়ে

গেলেন এবং ডেভেলপ করা দেখালেন। তখন প্যানক্রোমেটিসম্-এর জন্ম হয়নি, তখন সাধারণ প্লেটে ছবি তোলা হ'ত এবং সব প্লেটেই কড়া লাল আলোতে নিরাপদে ডেভেলপ করা চলত।

জীবনে এই প্রথম প্লেট ডেভেলপ করা দেখলাম। প্রত্যেকটি ধাপ খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখলাম। ডেভেলপিং ফিক্সিং ও তার পরে জলে অনেকক্ষণ ধোয়া। ডার্ক রুমের কাজ দেখা যাবে এই আশায় মনোমোহন দত্তের কাছে আমি নিজে অনেকবার ছবি তুলিয়েছি এবং বন্ধুদের নিয়ে গিয়েছি ছবি তোলাতে। এই উপলক্ষে অনেকবার ঢোকা হ'ল ডার্ক রুমে। তখন পাইরো-সোডা ডেভেলপিং খুব চলত। এতে প্লেট ডেভেলপ করলে প্লেটে চেহারার যে ছাপ উঠত, তার বাইরের লাইন অর্থাৎ চোখ কান নাক ও মুখের লাইন প্লেটে গভীর দাগ কেটে যেত। তখন পি-ও-পি (প্রিন্টিং-আউট পেপার) ও ডেভেলপিং-আউট পেপার বা ব্রোমাইড পেপার—দুইই চলত, ক্রেতার পছন্দ যেটি। অনেকের ধারণা ছিল ব্রোমাইড কাগজে ছবি বেশি দিন স্থায়ী হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পি-ও-পি প্রিন্টই দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবশ্য ব্রোমাইড প্রিন্ট পরে সেপিয়া করলে তা প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

যাই হোক, মনোমোহন দত্তের সংস্পর্শে এসে আমার ক্যামেরার আকর্ষণ ক্রমে বেড়ে গেল, এবং তাঁরই সাহায্যে ১০২৯ সালে হস্পিটাল স্ট্রীটের গোপীনাথ দত্তের দোকান থেকে একটি কোয়ার্টার-প্লেট ক্যামেরা কিনলাম। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ক্যামেরা, ট্রাইপড সহ দাম দিলাম ২৫ টাকা। ক্যামেরায় ছিল অলাডস র‍্যাপিড রেকটিলীনিয়ার (সংক্ষেপে আর-আর) ৭'৭ লেন্স ও ধাতুনির্মিত শাটার। এ ক্যামেরায় রোল ফিল্ম ও প্লেট দুইই চলত।

ডার্ক রুমের কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও ক্যামেরায় আলোর তারতম্য হিসেব ক'রে এক্সপোজার দেওয়া দুএক দিন মাত্র শিখলেই হয় না। কিন্তু উৎসাহ এমনই অদম্য ছিল যে অবিরাম ভুলের পথে গিয়েও দমিনি কখনো। ক্যামেরা কিনে নিয়েই দেশে গিয়েছিলাম, তাই দেখিয়ে দেবার কেউ ছিল না। 'ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর' নীতিতে চলা ভিন্ন আর কোনো উপায় ছিল না। বাথগেট থেকে প্লেট কেমিক্যাল ইত্যাদি রেল পার্সেলে আনিয়ে নিতাম। তখন অধৈর্য ছিল বেশি, তাই অর্ডার দেবার

তৃতীয় দিনেই সব পাওয়া যেত ব'লে ঐ খানে অর্ডার দিতাম, যদিও দাম অনেক বেশি পড়ত।

নিজহাতে ছবি তুলেছি, এবং এত সহজে ছবি উঠছে এই ব্যাপারটি আমাকে অতিমাত্রায় উৎসাহিত ক'রে তুলল। দিনরাত প্রায় ফোটো তোলাতেই মেতে রইলাম। কয়েকটি বিশেষ বাঁধা আলোয় অতি চমৎকার ফোটো উঠত। সেই বিশেষ আলোয় এক্সপোজার আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিলাম। ফোটো সব সময়েই রোদে ভাল হ'ত, ছায়াতে তোলার এক্সপোজার তখনও সঠিক খুঁজে পাইনি ছায়াতে বেশি বা কম হত। প্লেট ছিল তখন কম দ্রুত। সবই ইলফোর্ড প্লেট। দুরকম পাওয়া যেত অর্ডিনারি ও স্পেশাল র‍্যাপিড। এই স্পেশাল র‍্যাপিডেই তুলতাম, সংক্ষেপে এর নাম ছিল এস. আর। কোডাক ফিল্মেও তুলতাম। বারোজ ওয়েলকামের 'ট্যাবলয়েড' মার্কা কেমিক্যাল বেশি ব্যবহার করতাম। প্লেট ও কাগজ দুইয়েতেই 'অ্যামিডল' ব্যবহার করা হ'ত।

পি-ও-পি নামক কাগজও অনেক ব্যবহার করেছি। দিনের আলোয় ছাপা হ'ত, একটু একটু খুলে দেখা যেত কতদূর এগোচ্ছে। তারপর গোল্ড ক্লোরাইড সলিউশনে 'টোন' ক'রে হাইপোতে দিতে হ'ত. ছাপার পরেই হাইপোতে দেওয়া চলত সেলফ-টোনিং পেপার। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে প্রিয় ছিল আমার এই কাগজটি। দুঃখের বিষয় এ কাগজ এখন আর পাওয়া যায় না।

বিদ্যাসাগর হস্টেলে থাকতে এ ক্যামেরায় বন্ধুদের ছবি তুলে দিয়েছি। ঘরেই অনেক সময় ডেভেলপ করতাম; কখনো দিনের বেলায় দরজা জানালা বন্ধ ক'রে লেপের ভিতর ব'সে, কখনো একটা হাঁড়ির মুখে লাল কাগজ জড়িয়ে, উপরে একটি ফুটো ক'রে, ভিতরে মোমবাতি জ্বেলে সেই আলোয়। যে কোনো ঘরকে ফোটোগ্রাফিক ডার্ক রুমে পরিণত করতাম প্রায় জোর ক'রে।

একদিন ইচ্ছে হ'ল হস্টেলের একখানা ছবি তুলব। তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির থেকে হস্টেলের ভাল ছবি তোলা সম্ভব ছিল। দুতিন জনে গিয়ে অনুমতি চাইলাম। কিন্তু যাঁদের কাছে চাইলাম তাঁরা হয় তো অনুমতি দেবার অধিকারী নন, তাই তাঁদের মনে সন্দেহ ঢুকল, ভাবলেন সাংঘাতিক

কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বললেন, না সে কি ক'রে হয়, ইত্যাদি। অবস্থা সুবিধাজনক নয় দেখে আমি তর্করত বন্ধুদের দিকে পিছন ফিরে একখানা ফোটো তুললাম, কাউকে জানতে দিলাম না।

ছবিখানা অতি সুন্দর হয়েছিল; তার অনেক কপি করতে হয়েছিল! এখন আমার কাছে নেই সে ছবি, যাঁরা কপি নিয়েছিলেন তাঁদের কারো কাছে থাকতেও পারে।

দুটি নতুন আকর্ষণের মাঝখানের সংকীর্ণ খাতের ভিতর দিয়ে চলা, সেজন্যই পাঠ্যের বোঝা কিছু কমিয়ে নিতে হয়েছিল—যাকে বলে jettison করা তাই। ১৯২০ সালে পরীক্ষা দিয়ে চলে গেলাম সাহেবগঞ্জ, বন্ধু প্রবোধচন্দ্রের কাছে। আগে থাকতেই আমাদের আয়োজন পাকা ছিল, আমরা ওখান থেকে সক্রিগলি-মনিহারীঘাট-কাটিহার-পার্বতীপুরের পথে দার্জিলিঙ রওনা হয়ে গেলাম।

সাত বছর পরে আবার দার্জিলিঙ!

সঙ্গে ছিল সাহেবগঞ্জের গৌর মজুমদার আর সম্ভবত ইন্দু মখুজ্জে। মনে করতে পারছি না ঠিক। গ্রীষ্মকালে বাংলা বা বিহারে ব'সে দার্জিলিঙের শীত কল্পনা করা দুঃসাধ্য। প্রবোধকে এক রকম জোর ক'রেই শীতের পোষাক সঙ্গে নিতে রাজি করিয়েছিলাম। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙের গাড়িতে উপরে উঠতে উত্তাপের তারতম্য গাড়ির মধ্যে ব'সে অনেক সময় বোঝা যায় না, বিশেষ ক'রে আগে যদি এক বা একাধিক দিন ট্রেনে কাটিয়ে আসা যায়। ক্লান্ত অবস্থায় শীত কিছু কম লাগে। তাই কার্সিয়ং ছেড়ে যত উপরে উঠছি, তত প্রবোধ জিজ্ঞাসা করছে শীত কোথায়।

আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল ঘুম। দার্জিলিঙের আগের স্টেশন এটি, এবং দার্জিলিঙ থেকে এক হাজার ফুট বেশি উঁচু। তাই সব সময়েই এখানে দার্জিলিঙ থেকে শীত একটু বেশি বোধ হয়। প্রবোধচন্দ্র অনুতাপ করছিল আমার কথায় এত সব ভারি জামা ব'য়ে আনার জন্য। ঘুম স্টেশনে নেমেও মনে হচ্ছিল শীত কিছুই নেই। কিন্তু দুচার পা হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ঠাণ্ডা প্রবাহ বয়ে গেল যাতে আমাদের হাড়শুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলল। সে এক অতি বিশ্রী রকমের কড়া ঠাণ্ডা। আমি প্রবোধকে প্রশ্ন করলাম কেমন

বোধ হচ্ছে? প্রবোধ ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আঃ! কি আরাম।

এখানে উঠলাম গৌরের ভগিনীপতির বাড়িতে। খুব ফাঁকা জায়গায় বাড়িটি—সর্বদা তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা হাওয়া, বাইরে এলেই। আমার এবারের আসার অতিরিক্ত আকর্ষণ হচ্ছে নতুন কেনা ক্যামেরাটি। দার্জিলিঙের স্বপ্নের মতো কোমল এবং স্পর্শাতীত সুন্দর রূপটি ক্যামেরায় ধরব। এ রূপটিকে কোমল বলছি অন্য অর্থে। দার্জিলিঙ আমার কাছে একটি বিশেষ শহর নয়। যেখান থেকে তরাইয়ের জঙ্গল শুরু হ'ল সেইখান থেকে আরম্ভ ক'রে আলোছায়ার সঙ্গে, কখনো অরণ্য কখনো খোলা পাহাড়ের সঙ্গে, লুকোচুরি খেলতে খেলতে রেলগাড়ি যতদূর এসে শেষ হয়েছে, ততখানি পথ ও তার সঙ্গে তুষার ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা মিলিয়ে যতটা হয়, ততটা। তা আমার কাছে কখনো স্পর্শযোগ্য বোধ হয়নি, একটা অদ্ভুত অ্যাবস্ট্রাক্ট ধ্যানরূপেই তা আমার চেতনার মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। নীহারিকা পুঞ্জের মতো একটি অধরা রূপ, তাই কোমল।

আমার ধারণা ছিল এ রূপের কিছু অন্তত ক্যামেরার ধরা পড়বে। কিন্তু পড়ল না। প্রথমত সে আমার প্রথম চেষ্টা, দ্বিতীয়ত ক্যামেরার শক্তিসীমা তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এক্সপোজার দিয়েছি, উৎকৃষ্ট ছবি হয়েছে, কিন্তু সে শুধুই পাথর, শুধুই আউটলাইন! সমস্ত আলোছায়া, কুয়াসা ও মেঘে গড়া অভিনবত্বের আবেগময় অনুভূতি ক্যামেরার ছবিতে ওঠেনি।

১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ। সম্ভবত সেটি জুলাই মাস। আমহার্স্ট স্ট্রীটে যেখানে কুন্তলীনের এইচ. বোসের বাড়ি তার পাশ দিয়ে ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট। সেইখানে একটি মেস্ ছিল, তার পরিচালক ছিলেন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ে, তিনিও তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। এই মেসের সন্ধান আমাকে কে দিয়েছিল তা আর এখন মনে পড়ে না, তবে এ মেসের পরিবেশটি বেশ ভালই লেগেছিল, যদিও বেশিদিন এখানে আমি থাকিনি। থাকিনি তার কারণ কিছুদিনের মধ্যেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হ'ল এবং এই আন্দোলনে আমার স্বাস্থ্যও যোগ দিল।

একদিন স্টার থিয়েটারে সভা। চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি এবং গান্ধীজি বক্তা। বিজ্ঞপ্তি প'ড়ে স্টার থিয়েটারে আসন দখল করেছিলাম। চিত্তরঞ্জন দাশ আসতে দেরি করছেন, গান্ধীজির তো কোনো খবরই নেই, আমরা অধীর হয়ে উঠছি, এমন সময় সভার উদ্যোক্তারা একটি নতুন জিনিস করলেন। তাঁরা ছাত্র সমাজ থেকে একজনকে সভাপতি ক'রে দিলেন। এই ছাত্র শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

সাবিত্রীপ্রসন্ন তখন ফকিরচাদ মিত্র স্ট্রীটের মেসে 'ভাবের অভিব্যক্তি' অনুশীলনে বিশেষ মনোযোগী, আমি তাঁর নানা মুখভঙ্গির ফোটোগ্রাফ তুলে দিচ্ছি। থিয়েটার করায় তার পটুত্ব আছে শুনেছি, অতএব মঞ্চভীতি বা স্টেজ-ফ্রাইট তাঁর স্বভাবতই ছিল না। তিনি স্টার মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বীররসে আহ্বান জানালেন—তোমরা সব বেরিয়ে এসো স্কুল-কলেজ ছেড়ে। তাঁর বক্তৃতা চলার মাঝখানে চিত্তরঞ্জন দাশ এসে পৌঁছলেন সভায়। গান্ধীজির তখনও কোনো খবর নেই। অথচ দর্শকদের প্রধান উদ্দেশ্য গান্ধীজিকে দেখা। অবশেষে 'ঐ এসেছেন ঐ এসেছেন' রূপ উত্তেজক ধ্বনিটি স্রোতের মতো প্রবাহিত হ'য়ে গেল প্রেক্ষাগৃহের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত।

গান্ধীজির পিঠে এক ভারী চটের থলে, তার ভারে তিনি নুয়ে পড়েছেন। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন, তার থলের রয়েছে বাঙালী মহিলাদের অলঙ্কারের দান। মহিলাদের এক সভায় তিনি এতক্ষণ বক্তৃতা করছিলেন, তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য কামনায় সবাই নিজ নিজ অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন গান্ধীজির হাতে। গান্ধীজি মঞ্চে প্রবেশমাত্র তাঁর মুখে স্পটলাইট নিক্ষেপ করা হ'ল নাটকীয় ভঙ্গিতে। সব মিলে বেশ একটা উত্তেজনা। হাততালি আর জয়ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে।—যেন সত্যি সত্যি একটি নাটকের দৃশ্য।

আমি পাশের বন্ধুকে চুপে চুপে বলছি—"আসলে গান্ধীজি বাংলাদেশে এসে ডাকাতি ক'রে গেলেন।" অবশ্য এই জাতীয় ডাকাতিতে গান্ধীজি ছিলেন ওস্তাদ। পরে শুনেছি অনেকেই গয়না প'রে গান্ধীজির সভায় মেয়েদের যেতে দিতেন না।

ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের মেসে সাহিত্যিকদের আনাগোনা ছিল।

'উপাসনা' সম্পাদনা করতেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। উপাসনার কাজ এই মেসেই অনেকটা চলত। এখানকার বাসিন্দা আর দুজন, প্রবোধ মজুমদার ও চারুচন্দ্র সরকার প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। প্রবোধ মজুমদার শুভযাত্রা নাটকের লেখক, চারুবাবু ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক।

এই মেস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব কম নয়। আমি অধিকাংশ সময় নরসিং লেন নরেন্দ্র সেন স্কয়ার হয়ে যেতাম। ইংরেজী 'এ'-গ্রুপে ভর্তি হয়েছিলাম। তখনকার দিনের একখানা খাতা আবিষ্কার করেছি কিছু দিন হ'ল, তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি।—(আমার রোল-নম্বর ছিল ১০৪, সেকশন-টু, ১৯২০):

প্রোফেসর এন. চ্যাটার্জি—ল্যাঙ্গুয়েজ
,, এম. ঘোষ—অ্যারিস্টোফোনিস (দি ক্লাউডস)
,, এইচ. মৈত্র—ওয়ার্ডসওয়ার্থ
,, পি সি. ঘোষ—চসার
,, স্ক্রিমজ্যর—শেক্সপীয়ার
,, জে. জি. ব্যানার্জি—স্পেশাল পীরিয়ড অফ পোয়েট্রি
,, এস. রায়—লিটারেচর, অ্যাংলো-স্যাক্সন পীরিয়ড
,, স্টিফেন—সিলেকটেড পীরিয়ড অফ প্রোস
(এসেজ অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম)
,, কে. বি. রায়—গিবন
,, এস. সেন—প্রোজ পীরিয়ড (ফিকশন)
,, জে. ঘোষ—লিটারেচর—রেস্টোরেশন পীরিয়ড
,, আর. পি. মুখার্জি—মিলটন

এম. ঘোষ—মনোমোহন ঘোষ (অরবিন্দ ঘোষের অগ্রজ), তখন বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, মাথায় খুব হাল্কা শাদা চুল, হাওয়ায় সর্বদা উড়ছে, কণ্ঠস্বর নিস্তেজ, খুব কাছে না বসলে সব কথা ভাল শোনা যেত না। স্ক্রিমজ্যর ছিলেন ক্ষীণদেহ, দেখে রুগ্ন ব'লে বোধ হত। স্টিফেন ছিলেন খুব স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘ। তিনি যত্ন ক'রে নোট লিখিয়ে দিতেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ খুব উৎসাহী শিক্ষক ছিলেন, শুধু বক্তৃতা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না, প্রত্যেককে পড়া জিজ্ঞাসা করতেন ঠিক স্কুলের শিক্ষকের মতো, কারো ফাঁকে দেবার

উপায় ছিল না। তখনকার দিনের এই অধ্যাপকদের প্রায় সবার চেহারা আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে সুহাস রায় সুদর্শন যুবক ছিলেন, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও তখন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক, এবং গৌরাঙ্গ। উপরের ঐ কটিনে দুটি নাম একসঙ্গে আছে, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুহাস রায়।—গত ডিসেম্বর ১৯৫৬, এরা দুজন একদিনের ব্যবধানে পরলোকগমন করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় চিত্র

ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের মেসেই প্রথম কাজি নজরুল ইসলামকে দেখলাম। যুবক নজরুল, প্রাণোচ্ছলতায় ফেটে পড়ছেন, তাঁর কল্পনার হাউই তখন আকাশচুম্বী। কবিতা আবৃত্তি করলেন, বল বীর, বল উন্নত মম শির। উদ্দীপনা জাগায় ভীরু মনে। গালভানির মতো, তিনি যেন বাংলার যে-যুব-শক্তি মৃত ব্যাঙের মতো পড়ে আছে, তার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করতে এসেছেন তাঁর বিদ্যুজ্জনন যন্ত্র নিয়ে।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। আবৃত্তির পর তিনি কীর্তন গান গাইলেন একখানা। তাঁর কণ্ঠের উচ্চগ্রাম মেস্‌-ঘর অতিক্রম করে আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িঘর গুলোকে ধাক্কা মারতে লাগল। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম দু জনের দিকে।

সদা বন্ধুবৎসল কবিশেখর কালিদাস রায় আসতেন লেখার ফাইল নিয়ে, বাইরে থেকে। তিনি তখন উপাসনা কাগজে মাসিকপত্র সমালোচনা করছেন, তাঁর জন্য ঐ কাগজে একটি পৃথক বিভাগ ছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন ছিলেন সহকারী সম্পাদক। আরও একজন সহকারী, কুষ্টিয়ার কিরণকুমার রায়। ১৯২০ সালে কিরণ থার্ড ইয়ারে পড়ত ইংরাজীতে অনার্স সহ।

কিরণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল তখন থেকেই, আজও তা অক্ষুন্ন আছে। কিরণ-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—অধিকাংশ বিষয়েই নিজস্ব মত প্রকাশ করা, এবং সে মতটি একটি মাত্র ইংরেজী শব্দ—trash! ভীষণ খুঁতখুঁতে ছিল সাহিত্য বিষয়ে।

একটি কবিতা লিখেছিলাম, সসঙ্কোচে সেটি কবিশেখরের হাতে দিলাম। তিনি সেটি উপাসনাতে ছেপেছিলেন। কবিত্ব ছিল মনে মনে, নীরব এবং অদৃশ্য। নীরব কবিকে সংসারে কবি ব'লে স্বীকার করা হয় না। অবশ্য কবিরূপে তারা স্বীকৃতি না পেলেও মুখর কবিদের প্রধান অনুরাগী তারাই। পৃথিবীতে কবিদের কাব্যে এ যাবৎ যারা মুগ্ধ হয়েছে এবং কাব্যকে জনপ্রিয় করেছে তারা সবাই নীরব কবি।

উপাসনায় এ সময় আমার একটি প্রবন্ধও ছাপা হয়, (মাঘ, ১৩২৭)। প্রবন্ধের নাম 'আমাদের চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা'।—প্রবন্ধটি আজ (১৯৫৭) থেকে ৩৭ বছর আগের লেখা। ঐ প্রবন্ধে লিখছিলাম—

"কোনো একটি বস্তুর রূপ বর্ণনা করিতে গেলে আমরা ভাষার আশ্রয় লই, কিংবা রেখায় ও বর্ণে তাহা ফুটাইয়া তুলি। চোখে যেটুক দেখি শুধু সেই টুকুই যদি প্রকাশ করি তাহা হইলে সে প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে রূপটুকু চোখের নিকট অব্যক্ত অথচ হৃদয়ের মধ্যে ব্যক্ত সেটুকুর প্রকাশ না করা পর্যন্ত আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এখন কথা উঠিয়াছে চিত্রশিল্পে আমরা প্রকৃতিপন্থী হইব কি কল্পনাপন্থী হইব, যাহা চোখে দেখিতে পাই কেবল তাহাই আঁকিব, না কল্পনার রং ফলাইয়া তাহাকে ভিন্ন পথে চালাইব। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—সমস্যাটি মোটেই জটিল নহে। চিত্রশিল্পে প্রকৃতিকে অনুসরণ করার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে আমাদের অঙ্কিত চিত্র একটি বাস্তব চিত্র তো হইবেই, তাহা ছাড়াও কিছু বেশি হইবে। বস্তু বিশুদ্ধ অবস্থায় শুধু দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা যখন মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে চাই তখন আমরা তাহার বিশুদ্ধতা বজায় রাখিতে পারি না ; সঙ্গে কিছু বাহুল্য কিছু অবান্তর এবং কিছু অলঙ্কার যোগ করিয়াই থাকি।...চোখে দেখা রূপের বর্ণনা বেশি করিতে হয় না, কারণ চোখে আমরা সামান্য অংশই দেখিতে পাই ; কিন্তু অন্তরের চোখে যাহা দেখি তাহা অতি বৃহৎ। তাই শব্দ চিত্রেই হউক, বর্ণ বা রেখা চিত্রেই হউক, কল্পনার রূপ যত বেশি দিতে পারিব ততই সেগুলি বেশি সুন্দর হইবে।"

চিত্রশিল্প নিয়ে এখনও মাঝে মাঝে লিখি। আজ বুঝতে পারি, যে অর্থে একথা লিখেছিলাম আমার মনের মধ্যে সে অর্থের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সে কথা পরে বলছি।

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ভট্ট আসতেন এই মেসে। তাঁর একখানা ফোটোগ্রাফ তুলে দিয়েছিলাম, আজও মনে আছে সে ছবিখানার কথা। দেখে বলেছিলেন 'এ কোন্ ভদ্দরলোকের ছবি ?' আরও একখানি ছবি তুলেছিলাম যার কপি থাকলে আজ তার বড়ই আদর হত। সেনেট হাউসের সিঁড়িতে ছাত্ররা শুয়ে আছে, ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না কাউকে। প্রবেশ করতে হলে তাদের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। ছবি তুলতে ক্যামেরা নিয়ে পাশের একটি ফটকের উপরে উঠতে হয়েছিল। আশুতোষ বিলডিং তখন ছিল না। ফোটোগ্রাফখানা নির্ভুল এক্সপোজারে চমৎকার হয়েছিল।

এই মেসে থাকতে আর একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে। আমি এক দিন

একখানা ছবি আঁকি ছবিটি রবীন্দ্রনাথের মূর্তিকে আশ্রয় ক'রে আঁকা। একখানা প্রোফিল ফোটোগ্রাফ থেকে কপাল ও নাক মুখের রেখাটি নিয়ে সেই রেখাটি শাদা রেখে বাকী অংশ সব কালো ক'রে দেওয়া। মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকারে মুখের ঐ অংশে শুধু আলো পড়েছে। যেন অন্ধকার ভেদ ক'রে কবি জ্যোতির্ময়ের দিকে মাথা তুলেছেন। ভাবটি তাঁর কবিতা থেকেই নেওয়া।

কবি জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় তখন প্রভাতী নামক ছোট্ট একখানা মাসিক পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে পত্রিকায় আমার একটি রচনাও ছাপা হয়েছিল, কি এখন আর মনে নেই। এই পত্রিকায় জ্ঞানেন্দ্রনাথের ব্রিং অভ সাইন্ কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়। তিনি এই মেসে আসতেন। সে দিন ছবিখানা আঁকি তার পর দিন তিনি এসেছিলেন। তিনি ছবিখানা দেখে বললেন ওখানা প্রভাতীতে ছাপবেন। মোটা কাগজে আঁকা ছবি, জড়িয়ে মোটা বোর্ডের চোঙায় ঢুকিয়ে তাঁকে দিয়ে দিলাম। তখন বেলা ন টা কি দশটা। আধঘণ্টা পরে জ্ঞানবাবু হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন আমার কাছে এবং এসে প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি। তিনি সোজাসুজি কিছুতেই বলতে চান না, শেষে লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত ভাবে বললেন, "ঘরে গিয়ে দেখি প্যাকিঙের চোঙাটা হাতে আছে, ভিতরে ছবি নেই, চোঙা থেকে পথে কোথায় পড়ে গেছে।" শেষে আমিই তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলাম।

বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে খাবার ঘরে কয়েকজন 'সহোদর'-এর কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করছিলাম। শক্তিপদ নামক এক বন্ধু বললেন মেসের চাকর এক ওড়িয়ার দোকান থেকে তাঁর জন্য পান কিনে এনেছে, সেই পান জড়ানো আছে রবি ঠাকুরের একখানা ছবি দিয়ে। খাওয়া শেষে দেখি— ঘটনা সত্য। পানের রং মাথা সেই কাগজ খানায় আমারই আঁকা ছবি। তবে পান উল্টো পিঠে জড়ানো ছিল, তাই সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি। ছবিখানা দুমড়ে গিয়েছিল, কিন্তু অনেক কৌশলে তাকে চেপে চেপে ঠিক ক'রে তার উপর আবার তুলি বুলিয়ে ঠিক ক'রে ফেললাম।

কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল, এবং সে ছবি অবশেষে সবাই দেখলেন। যেন জীবন্ত কবি একটি দুর্ঘটনা থেকে সম্প্রতি কোনো রকমে উদ্ধার পেয়েছেন।

কিরণকুমার বলল ও ছবি উপাসনায় ছাপা হবে। এই সব ঘটনায় ছবির দাম বেড়ে গিয়েছিল। উপাসনাতেই অবশেষে সে ছবি ছাপা হ'ল। পৃথক প্লেট, ছবির নিচে ক্যাপশন রইল "সমস্ত তিমির ভেদ করি দেখিতে হইবে উর্ধ্বশির- এক পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে অনন্ত ভুবনে।"

জ্ঞান বাবু একদিন বিস্মিত হয়ে দেখে গেলেন সে ছবি এবং পুনরায় অনুতাপ ক'রে চলে গেলেন।

কিন্তু এ ছবির কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এ ছবির যে কি দাম তা রবীন্দ্রনাথই একদিন ফাঁস ক'রে দিয়েছিলেন। সে কথা পরে বলছি।

এই মেসে থাকতে এক বিশিষ্ট বন্ধুর জন্য কনে-দেখার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম। বাইরে থেকে হঠাৎ গিয়ে কোনো মেয়েকে দেখে পছন্দ হ'ল বা পছন্দ হ'ল না বলা আমার পক্ষে সঙ্কোচজনক। আমার মতে গৌণভাবে জেনেশুনে শুধু বিয়ের কথা পাকা করলেই যাওয়া ভাল। বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ অপছন্দ দুটি কথা প্রায় কেনাবেচার ভাষায় পরিণত হয়েছে, ওতে মেয়েদের অপমান করা হয় এই আমার ধারণা। যাই হোক তবু আমাকে যেতে হ'ল নানা কারণে। যেতে হল সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত। সঙ্গে কিরণকুমার, সাবিত্রীপ্রসন্ন এবং আরও একজন কে ছিলেন মনে নেই। দুটি বোন একত্র সেজে এসে বসল, সম্ভাবিত খদ্দেরদের কাছে। দুজনে এক সঙ্গে ব'সে একই গৎ বাজাল সেতারে। কত খাতির পেলাম। কলকাতা ফিরে এসে অভিযানের নেতা বললেন বড় মেয়েটির সম্পর্কে মত দিতে হবে। ফুল মার্ক ১০০। দশটি ভাগে ভাগ করা হল মেয়েটিকে। চুল ১০, মুখ ১০, দেহসৌষ্ঠব ১০, কণ্ঠস্বর ১০, ইত্যাদি। আমরা যারা যারা দেখেছি সবারই পৃথকভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে হবে মার্ক দিয়ে। আমার হাতে মোট মার্ক উঠেছিল ৮০। কিন্তু অন্যেরা মার্ক কম দিলেন, ভোটের জোর হল তাঁদের। তাঁরা যে কেন কম দিলেন তা আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেস ছেড়ে গেলাম দেশে। স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপের দিকে। এর উপর দেশে ব্যাপকভাবে মহামারী দেখা দিল। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই চ'লে গেলাম ভাগলপুরে ১৯২১ সালে। প্রবোধ ছিল সেখানে, তার সাহায্যে আগেই বাড়ি ভাড়া ক'রে রাখা হয়েছিল।

ভাগলপুরের সেই আগুনে হাওয়াতেও আমরা নানা জায়গায় ঘুরেছি তখন।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তখন সর্বত্র ভেঙে পড়ছে। খুব একটা উত্তেজনার ভাব। আমার স্বাস্থ্য কোনোদিনই কোনো আন্দোলনের উপযুক্ত ছিল না, সেজন্য আমি এ বিষয়ে ছিলাম অনেকখানি উদাসীন। ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজির 'চরকায় স্বরাজ' প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে ভিন্ন মত প্রচার করেছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি আমার যুক্তিবাদী মনে খুব সাড়া দিয়েছিল।

আমার বোন সরলা, তখন ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী ঊর্মিলা দেবীর নারী কর্মমন্দির নামক শিক্ষায়তনে। বাড়িটি ছিল রূপচাঁদ মুখুজ্জে স্ট্রীটে। এখানে ইংরেজী, হিন্দি, অঙ্ক, ও চরকায় সুতো কাটা শেখানো হ'ত। সুপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে মুখর্জি ও সিনেমা শিল্পী) ও চারুলতা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে রায়চৌধুরী, শিল্পী দেবীপ্রসাদের সহধর্মিণী) এখানে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ভাগলপুর থেকে দেশে ফেরার পথে আমরা সবাই মিলে এক বেলার জন্য এখানে এসে উঠলাম। আসবার সময় সরলা কর্মমন্দিরের এক চরকা আমাদের কাছে বিক্রি করল। এই সম্পূর্ণ স্বদেশী জিনিসটি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেছিল ঠিকই, কিন্তু সঙ্গের একটি বিদেশী জিনিস গাড়ির ভিতর থেকে চুরি হয়ে গেল।

চুরি হ'ল আমার ক্যামেরাটি। একটি অ্যাটাশে কেস-এ ক্যামেরা ও অনেকগুলো চিঠি ছিল, সবসুদ্ধ গেল। বিদ্যাসাগর হস্টেলে থাকতে রবীন্দ্রনাথকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। অকারণ চিঠি। শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তখন কিছু ভেবেছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। কি লিখেছিলাম ঠিক মনে পড়ে না, এবং সে চিঠির কোনো উত্তর আমি আদৌ আশা করিনি এবং উত্তর পাওয়া যে আদৌ সম্ভব তাও কল্পনা করিনি, অথচ লেখার কয়েক দিনের মধ্যেই তার এক উত্তর এলো, খামে লেখা মাত্র তিন লাইন। চিঠিখানা মুখস্থ আছে।

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দ লাভ করেছি। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে বাংলা দেশ থেকে আমি কোনো সাহায্য বা সহানুভূতি পাইনি।

ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১৮ সালে লেখা, কিন্তু তারিখটি আমার মনে নেই। এই চিঠিখানাও ক্যামেরার সঙ্গে চুরি হয়ে গেল। চিঠিখানিতে একটি বেদনার সুর আছে। চিঠি লেখার মুহূর্তে মনে হয় তো কোনো প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল; কবি মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়তেন সাময়িকভাবে। তারই কিছু ছায়া পড়েছে এ চিঠিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার সামান্য একখানা চিঠির উত্তরে তিনি আমার প্রতি অনেকখানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, এ আমার কাছে একেবারে কল্পনাতীত ছিল। এতে কবির মানসিক ঔদার্যের একটি পরিচয় আমার কাছে উদঘাটিত হল, যা আমি ভুলতে পারিনি কখনো।

এ চিঠিখানা হারিয়ে যাওয়াতে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল।

মূল্যবান জিনিসগুলো হারিয়ে শুধু চরকা নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম। চরকা কিছুদিন আমিও কেটেছিলাম. শুধু মেয়েদের দেখাতে যে ও কাজটা ছেলেরাই ভাল পারে। আধ সের পরিমাণ সুতো আমার হাতে বেরিয়েছিল। সে সুতো কোনো তাঁত পর্যন্ত পৌঁছয়নি। পৌঁছতে হলে সম্ভবত আমাকে আবার কলকাতা আসতে হ'ত ফিরে। ১৯২১ সালের ঘটনা। এর ২৬ বছর পরে যে স্বাধীনতা এলো তারই কি সেটি প্রথম সূত্রপাত?

আসল অর্থে চরকা কেটেছিলাম কয়েক বছর পরে, উনুনে পাঠাবার আগে। যাই হোক বাড়িতে চুপচাপ ব'সে থাকতে থাকতে মানসিক অধৈর্য বাড়তে লাগল। পড়াশোনা হোক বা অন্য কোনো বিদ্যা হোক, তার সাহায্যে উপার্জন করতে হবে এ চিন্তা মনে এলেও ভাল লাগত না। অন্তত এ সময়ে বা এর পরেও অনেক দিন এ দিক দিয়ে কিছু ভাবিনি। একটা দায়িত্বহীন অলসপন্থিতা, যার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ক্রমে নবগঠিত বিশ্বভারতার দিকে আকর্ষণটা বেশি অনুভব করতে লাগলাম। সেখানে থেকে, চিত্রাঙ্কন শিখব, এইভাবে চিঠি লিখে সব আয়োজন পাকা ক'রে ফেললাম, টাকাও আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। রওনা হবার আগে একখানা চিঠি পেলাম নৈহাটি রেলপুলিসের কাছ থেকে। আমার ব্যাগটি সেখানে জমা আছে, পুলিসে সেটি কুড়িয়ে পেয়েছে রেলের ধারে। শান্তিনিকেতনে যাবার পথে সেটি উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেলাম নৈহাটি রেল-পুলিসের ঘর থেকে। তার ভিতরে কিছুই ছিল না। পরে হঠাৎ খেয়াল

হ'ল পুলিস জানল কি ক'রে যে ওটি আমার ব্যাগ। নিশ্চয় ওর ভিতরের চিঠি থেকে! কিন্তু আমি যখন ব্যাগ পেয়েছি তখন তাতে একখানিও চিঠি ছিল না। অপ্রয়োজনীয় বোধে চিঠিগুলো সব ফেলে দিয়ে থাকবে, কিন্তু কেন? শুধু একটি ভাঙা কেস্ সংগ্রহের জন্য আমার ডাক পড়ল, অথচ যা আমার কাছে যথার্থরূপে মূল্যবান তা ফেলে দেওয়া হ'ল। পরে এ সব উল্লেখ ক'রে রেলপুলিসকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে, কিন্তু তার কোনো জবাবই পাইনি।

শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যাবেলা। আশ্রয় পেলাম লাইব্রেরির ঘরের দোতলায় আরও অনেকের সঙ্গে। এখানকার খোলা আবহাওয়ায় এবং নতুন পরিবেশে স্বাস্থ্যলাভ করব এই রকম একটা আশা জাগল মনে। কিন্তু ঘটল বিপরীত। ভোর বেলা ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে সর্দিকাসি আরম্ভ হয়ে গেল এবং শুধু আলুর তরকারি আর ডাল খেয়ে পাকস্থলীর দুর্দশা ঘটল। চেহারা দাঁড়াল যক্ষ্মা রোগীর মতো, এবং সপ্তাহে দুতিন দিন অন্তত হাসপাতালের বিশেষ পথ্য খেতে লাগলাম ডাক্তারের ব্যবস্থায়। মাঝে মাঝে কাসি এত বেশি হতে লাগল যে নিজেরই সঙ্কোচ হ'ত কারো সঙ্গে মন খুলে আলাপ করতে।

আমি যে ঘরে ছিলাম সেখানে আজকের স্মরণীয়দের মধ্যে আমার নিকটতম শয্যায় রাত কাটাতেন সৈয়দ মুজতবা আলী ও অনিলকুমার চন্দ। দুজনেই আজ কথাশিল্পীরূপে প্রসিদ্ধ। তখনও তাই ছিলেন। ক্রমাগত কথা ব'লে আসর জমিয়ে রাখতেন। কথাশিল্পী আজ অবশ্য বিশেষ অর্থে। একজনের প্রকাশ কাগজে কলমে, আর একজনের প্রকাশ রাষ্ট্রীয় আসরে। আর ছিলেন অনাদিকুমার দস্তিদার, শিল্পী হরিপদ রায় ও মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।

শান্তিনিকেতনে যাবার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক। দেখলাম তাঁর সেই প্রসিদ্ধ বাক্সের খেলা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ছোটখাটো সব খেলা। এই আসরে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন কিছুক্ষণ। এক জাদুকর আর এক জাদুকরের সামনে ব'সে আছেন। সমস্ত পরিবেশটি বেশ উপভোগ্য মনে হয়েছিল। ইলিউশন বক্সের খেলা আরম্ভ হবার আগে বাক্সটি সন্তোষ মজুমদার রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও অনেকে বেশ ভালভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন।

এই খেলাটির একটু বর্ণনা আবশ্যক। এটি বড় একটি কাঠের বাক্স। গণপতি চক্রবর্তীর দুখানা হাত পিছমোড়া ক'রে বাঁধা হ'ল। দুখানা পাও কষে বাঁধা হ'ল। তারপর তাঁকে একটি থলেতে পুরে, থলের মুখ বেঁধে সেই বাক্সে পোরা হ'ল। তারপর সেই বাক্সটি দড়ি দিয়ে চারদিক থেকে বাঁধা হ'ল এবং তালা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। তারপর সামনে একটি কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিতে না দিতে যাদুকরের দুখানা হাত পর্দা ভেদ ক'রে বেরিয়ে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। হাত দুখানা স'রে গেল, পর্দাও সরিয়ে দেওয়া হ'ল, দেখা গেল বাক্স আগের মতোই বন্ধ আছে। তারপর বাক্সের উপরে তবলা রাখা হ'ল এবং পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। ব'লে দেওয়া হ'ল যাঁর যে তাল শুনতে ইচ্ছে আদেশ করুন। কেউ বললেন চৌতাল, কেউ বললেন ধামার। পরপর দুটি তালই তবলায় বাজল। পর্দা স'রে গেল, বাক্স পূর্ববৎ। আবার পর্দা ঢেকে দেওয়া হ'ল, এবারে যাদুকর নিজে বেরিয়ে এলেন পর্দার আড়াল থেকে। বলা হ'ল আপনারা কেউ কোনো চিহ্ন লাগিয়ে দিন এঁর গায়ে। কেউ আংটি পরিয়ে দিল, কেউ চশমা পরিয়ে দিল। যাদুকর পর্দার আড়ালে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হল এবং দর্শকদের মধ্য থেকে উৎসাহীরা গিয়ে দড়ি খুলে, তালা খুলে, বাক্সের ঢাকনা তুলে মুখ বাঁধা থলেটি বাইরে তুলে আনলেন। সেটি খুলে দেখা গেল যাদুকর দর্শকদের দেওয়া চশমা ও আংটি পরা অবস্থায়, এবং পূর্ববৎ পিছমোড়া ও পা বাঁধা অবস্থায়, থলের মধ্যে রয়েছেন।

তখনকার দিনে এই খেলাটির খুব প্রসিদ্ধি ছিল। এর পর স্টেজে আমি বিখ্যাত কারো ম্যাজিক বেশি দেখিনি। অতএব এ দেখার উপভোগ্য স্মৃতিটি আজও আছে।

প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে তখন কিছু দূরত্ব ছিল, কাছাকাছি ছিলেন তাঁর ভাই, প্রফুল্লনাথ বিশী, বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরের পি. এ., তিনি খুব সহৃদয়তার সঙ্গে আমাকে ওখানকার ভূগোলের সঙ্গে যথাসাধ্য পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শান্তিনিকেতনে কিঞ্চিৎ দূরত্ব প্রায় সবার সঙ্গেই ছিল এবং প্রধানত তা স্বাস্থ্যের জন্য। সৈয়দ মুজতবা আলী (তখন ছিলেন মুজতাবা) ও অনিল-কুমার চন্দ অবিরাম কথা বলতে পারতেন ব'লে এবং তাঁদের সঙ্গে প্রায়

পাশাপাশি রাত কাটাতে হ'ত ব'লে, তাঁদের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচে গিয়েছিল। আলী হিন্দি এবং উর্দু দ্রুত লিখতে পারতেন। সোজা দিক থেকে এবং বিপরীত দিক থেকে। আমার একখানা খাতায় তাঁর হাতে আমার নাম ইংরেজী, বাংলা, নাগরী, এবং উর্দুতে সোজা এবং উল্টো ক'রে লেখা, এখনও রয়ে গেছে।

কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ক্লাসগুলো নিতেন তার কোনটিই বাদ দিইনি। ওখানে গিয়ে এক দিন বিকেলের দিকে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি একা ছিলেন সেই মুহূর্তে। আমার পরিচয় দিলাম। তিনি খুশি হলেন যে আমি এখানে কলাভবনে ভর্তি হয়েছি। তাঁর সঙ্গে আলাপে সকল সঙ্কোচ কেটে গেল। তাঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম কথা বলা। তিনি এমন আশ্চর্য সহানুভূতি এবং স্নেহের সঙ্গে আলাপ করলেন যাতে শুধু সঙ্কোচ কাটা নয়, কিঞ্চিৎ সাহসীও হয়ে উঠলাম এবং আমার আঁকা উপাসনায় প্রকাশিত সেই ছবিখানি, (যা আমি চাদরের নিচে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম) তাঁকে দেখালাম।

মনে হ'ল ছবিখানা দেখে তাঁর যেন কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঞ্চন ঘটল। তিনি তাঁর উপরে চোখ বুলিয়েই সেখানা আমাকে ফেরৎ দিলেন এবং কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে বলতে লাগলেন, তুমি যে ছবি এঁকেছ তার প্রধান লক্ষ্য আমার চেহারা, অর্থাৎ ছবিতে কতখানি আমার চেহারার সঙ্গে মেলাতে পার, এবং তার পর নিচে একটি নাম বসিয়ে দিয়েছ। একে আমি ছবি বলব না। কবিতার যে কথা দিয়ে ছবির ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছ, সেই ভাবটা যদি তোমাকে প্রেরণা দিত তা হ'লে চেহারার সঙ্গে ছবি মেলাবার ইচ্ছেটা অবান্তর হ'ত তোমার উচিত ছিল কল্পনার আশ্রয় নেওয়া, ফোটোগ্রাফের আশ্রয় নয়। ছবির যেটি মূল প্রেরণা সেটি হচ্ছে একটি ইমোশন। সেই ইমোশনের সঙ্গে যদি আমাকেই এক ক'রে দেখার কথা মনে হয়ে থাকে তা হ'লে তোমার ছবির চেহারা অন্য রকম হ'ত। তোমার সকল চেষ্টা এ ছবিতে শেষ হয়েছে চেহারা মেলাবার কাজে। তাই এটি তুমি যা দেখাতে চেয়েছ তা হয়নি। হয়েছে স্পট-লাইট ফেলা একখানি ফোটোগ্রাফ। তার অর্থ এই যে ক্যামেরায়, ঠিক এই রকম একখানা ছবি তৈরি করা কঠিন হ'ত না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা হ'লে আপনার চেহারার সঙ্গে মেলাবার কোনো দরকারই ছিল না ?

না।—যদি দৈবাৎ মিলত, ক্ষতি হত না, কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে মেলাবার জন্য আঁকলে তা ক্রিয়েশন হয় না।

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলাম। আমি উপাসনা কাগজের প্রবন্ধে আর্টের যে অর্থ বোঝাতে চেয়েছি—তা কি আমার মনে সবখানি ধরা পড়ে নি ? স্পষ্টই বোঝা গেল, পড়ে নি। যা লিখেছি, বাস্তবকে আশ্রয় ক'রে কল্পনার বিস্তারের কথা, আমার মনে তার একটি সীমাবদ্ধ অর্থমাত্র প্রকাশিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। আমার আত্মগৌরব ধূলিসাৎ হ'ল। তিনি আমার মনে আর্টের এমন একটি ব্যাখ্যা স্পষ্ট ক'রে তুললেন যা আমার রচনায় কল্পিত হয় নি। তিনি প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে আর্ট সম্পর্কে বলেছিলেন, এবং আমার কাছে তখন তা সম্পূর্ণ নতুন মনে হয়েছিল। কথাগুলো আমাকে অনেক চিন্তা ক'রে আত্মস্থ করতে হয়েছিল, কারণ আর্ট সম্পর্কে এ রকম বৈপ্লবিক ধারণা আমার ছিল না। আর্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছে পেলাম প্রথম দীক্ষা, এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর পর বিচিত্রা মাসিকে (চৈত্র ১৩৩৮, ইং ১৯৩১) 'আর্টের অর্থ' নামে যে প্রবন্ধটি লিখি তা সে দিন রবীন্দ্রনাথ আমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তারই উপর ভিত্তি ক'রে লেখা। এই প্রবন্ধে আর্টের অর্থের (অর্থাৎ আমার পাওয়া নতুন অর্থের) পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পকেই বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে চিত্রশিল্পী হয়েছেন। অতএব আমার এই কার্যটিকে সম্ভবত গুরুমারা বিদ্যা বলা চলে।

নবাগত আমাকে রবীন্দ্রনাথ এমন অদ্ভুত সহানুভূতির সঙ্গে এত কথা বললেন, এ আমার কাছে তখন আশাতীত বোধ হয়েছিল, এবং শুধু তাই নয়, মনে হয়েছিল এতটা যেন আমার প্রাপ্য নয়, যেন তাঁর মূল্যবান সময়ের ও সহৃদয়তার উপর আমি মূঢ়তা বশত অত্যাচার করলাম। রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছের দৃষ্টিতে দেখায় অভ্যস্ত না হ'লে এ রকম হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যে বহু বিচিত্র দায়িত্ব এক সঙ্গে পালন ক'রে যেতে পারেন একথা আমার পক্ষে বাইরে থেকে তখন বিশ্বাস করা শক্ত ছিল, বিশেষ ক'রে যখন তিনি ক্লাসে ব'সে পড়াচ্ছেন বা কারো সঙ্গে কৌতুক করছেন

তখন এ কথা কখনো মনে আসেনি যে তিনি হয় তো তার পাঁচ মিনিট আগে কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান চিন্তা করছিলেন।

মন্ত্রদানের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নন্দলাল এখানে আছেন এটি আমাদের সৌভাগ্য। বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হও, তা হ'লেই বুঝতে পারবে তিনি কত বড় আর্টিস্ট। আর বলেছিলেন, ক্লাইভ বেলের আর্ট বইখানা পড়, তা হ'লে তোমার উপকার হবে।

একদিন শেলীর 'হিম্ টু ইনটেলেকচুয়াল বিউটি' নামক কবিতাটি পড়ালেন। ইংরেজী কবিতা তিনি বাংলায় ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যা তাকে বলা যায় না, এক কাব্যের সমান্তরাল যেন আর এক কাব্য রচনা। পড়াতে পড়াতে ইউরোপের ফুলের কথা উঠল। বললেন, অনেকের ধারণা আমাদের দেশেই ফুলের শোভা বেশি, কিন্তু তা ঠিক নয়। ইউরোপে তিনি ফুলের যে শোভা দেখেছেন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে, তা অপূর্ব সুন্দর, সে শোভা আমরা এ দেশে ব'সে কল্পনা করতে পারি না।

বাংলা ভাষায় ইংরেজী কাব্যের স্বাদ অনুভব করা এবং তা রবীন্দ্র-নাথের কাছ থেকে, এ অভিজ্ঞতা নতুন, তাই খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। লক্ষ্য করতাম, নবাগত বিদেশী ছাত্ররা অস্বস্তি বোধ করছেন বাংলা বুঝতে না পেরে, কিন্তু কবির সে দিকে খেয়াল নেই। কিংবা খেয়াল ছিল ব'লেই বাংলায় বোঝাতেন। কারণ তাঁরা কবির কাছে পড়বেন ব'লেই এসেছেন, অতএব বাংলা শেখার জন্য উঠেপড়ে লাগতেন, এবং শিখেও ফেলতেন খুব দ্রুত। আমি তো একজনকে বাঙালী মনে ক'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করছিলাম তারপর শুনলাম ছাত্রটি সিংহলী। এক জন নবাগত সিংহলী ছাত্র আমার কাছেও আসতেন বাংলা শিখতে।

জাপানী এক যুবক পণ্ডিত এসেছিলেন, নামটি মনে নেই। তাঁর কাছে শুনেছিলাম তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থেকে ইউরোপে যাবেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলতেন। দু চার দিনের মধ্যেই বাঙালী রীতি কিছু শিখে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সব কথা মনে রাখতে পারতেন না। খাবার ঘরে আমরা পাশাপাশি খাচ্ছিলাম। এমন সময় তাঁর নতুন পরিচিত একজন সেখানে আসতেই ভাতের থালা থেকে হাত

তুলে দুহাত জোড় ক'রে তাঁকে নমস্কার জানালেন। আমি খুব সহজ ভাষায় একটি একটি কথা পৃথকভাবে উচ্চারণ ক'রে বুঝিয়ে দিলাম, ঠিক যেমন একটি ছোট ছেলেকে বোঝায় তেমনি ক'রে যে, খাবার সময় এ কাজ করতে নেই, ওটা আমাদের রীতি নয়, আমরা সবাই এখানকার বাসিন্দা, তাই সকালে হোক বা যখন হোক আমাদের যখন প্রথম দেখা হবে তখন নমস্কার জানাব, কিন্তু সেটি কখনো খেতে খেতে নয়। তিনি আমার কথা বুঝলেন এবং বললেন 'ইয়েস ইয়েস'। কিন্তু কি পরিমাণ বুঝলেন, সেটি আমি বুঝলাম কয়েক মুহূর্ত পরেই। তাঁর আর এক জন নব পরিচিত ছাত্র খাবার ঘরে আসতেই নিষিদ্ধ সকল প্রতিক্রিয়াগুলিই পুনরনুষ্ঠিত হ'ল। অর্থাৎ মুখ থেকে ডান হাত বেরিয়ে বাঁ হাতের সঙ্গে যুক্ত হ'ল এবং 'নমস্কার' ব'লে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

পাতে ডাল ও আলুর তরকারী ছিল। প্রথমত তিনি শুধু ভাত খাচ্ছিলেন, একটু একটু ডালও খাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে এক টুকরো আলু মুখে দিয়ে ভেরি হট ভেরি হট (জাপানী উচ্চারণে ভেলি হৎ ভেলি হৎ) বলতে বলতে উঠে পড়লেন। চেয়ে দেখি নাক ও চোখ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। সেদিন আর তাঁর খাওয়া হল না।

খাবার ঘণ্টা বাজলে থালাবাটি নিয়ে ছোটার একটি কমিক দিক আছে। ব্যাপারটি আমার কাছে খুবই মজার মনে হ'ত। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে খাবার জন্য ছুটে আসার অভ্যাস তৈরি ক'রে দেওয়ার পরীক্ষা কুকুরকে নিয়েই বেশি হয়েছে। মানুষের জন্যও এটি দরকার কাজের সুবিধার জন্য।

সেপ্টেম্বর (১৯২১) মাসের রাত্রি বেলা রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্লাস নিয়েছিলেন জাপানী কবিতা পড়াবার জন্য। ডিটস লণ্ঠনের আলোয় ব'সে পড়াতেন ছাদের খোলা হাওয়ায়। আমরা মোট দশবারো জনের বেশি নয়, তাঁকে ঘিরে ব'সে যেতাম। জাপানী 'হাইকাই' নামক 'লিরিক এপিগ্রাম' কবিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। কাবতাগুলি এক লাইন, দু লাইন, তিন লাইন বা চার লাইনের। তিনি এই জাতীয় কবিতা প'ড়ে এমনই বিস্মিত হয়েছিলেন যে তাঁর সে বিস্ময় তিনি আমাদের মনে যতক্ষণ না সঞ্চারিত করতে পারছেন ততক্ষণ তাঁর তৃপ্তি নেই। এ

রকম উচ্ছ্বসিত অনাবিল প্রশংসার হেতু হাইকাই কবিতাগুলির গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। অল্পকথা, অনাড়ম্বর প্রকাশ, তবু এক একটি কবিতার ইঙ্গিত হঠাৎ এমন গভীরতা এবং ব্যাপ্তির দিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে মনকে প্রবলভাবে ধাক্কা মেরে যায়। রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে বীজমন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন মনে আছে। তিনি বলেছিলেন এই কবিতার জন্ম নিতান্তই কৌতূহল থেকে, হঠাৎ-কৌতূহল, উদ্দেশ্যমূলক নয়, একটি benevolent curiosity, কিন্তু তারপর তুলির ছোঁয়া (কবিতা তুলিতেই লেখা) পাওয়া মাত্র তা profundity of sympathyতে, অর্থাৎ সেই কৌতূহল একটি অতি গভীর সংবেদনে, রূপান্তরিত।

যেমন, একটি এক লাইনের হাইকাই—'শ্রান্ত বাহক চেরি ফুল দেখতে পায় না।'

কবি বললেন, দেখ, মানুষের দুঃখবেদনার মূলে না পৌঁছলে এমন ক'রে এ কথাটি বলা যেত না। এ দৃষ্টান্তটি হচ্ছে vital comprehension of human suffering-এর।

আর একটি কবিতা—'দ্বারের কাছে একটি পাইন—ইটারনিটির পথের মাইলস্টোনের মতো।'

প্রাণের অনুবৃত্তির vision আছে এতে।

আর একটি কবিতা—

They spread their beauty
and we watch them—
and the flowers turn and
fade—and—

এইটুকু মাত্র। কত বড় সঙ্কেত রেখে গেল, ইঙ্গিতের শেষ হ'ল না কোথায়ও। মন চিরদিন নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে 'এবং'-এর পরে কি। আশ্চর্য সংহত শক্তি।

আর একটি অদ্ভুত সুন্দর কবিতা, এটি one of the most beautiful—

The world of dew is
alas! a world of dew
and none-the-less—

এখানেও ইঙ্গিত চিরদিনের। খানিকটা পেসিমিস্টিক, এবং এপিকিউরিয়ানিস্‌মের ভাব। এই world of dew-এর মানে হচ্ছে অনিত্য জগৎ।

চমকপ্রদ সুন্দর এই সব কাব্য-বীজমন্ত্র। কবি একটি কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। কথাটি জাপানী জনসাধারণের সৌন্দর্য ও রসবোধের সম্পর্কে। তিনি বললেন এই হাইকাই কবিতা এমন রিফাইনড এবং এর রস এত ঘনীভূত যে হঠাৎ মনে হবে অল্প সংখ্যক লোকই এর মর্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর সব চেয়ে বড় বিস্ময় যে জাপানী জনসাধারণ এর ভোক্তা। তুলির এক টানে যে সব ছবি আঁকা হয় সে সম্পর্কেও তাই। একটা জাতি যে এমন রুচিসম্পন্ন হ'তে পারে তা তিনি আগে ভাবতে পারেন নি।

কথায় কথায় জাপানী মেয়েদের কথা উঠল একদিন। তিনি গাঢ় স্বরে স্মরণ করলেন তাঁর বিদায় মুহূর্তের কথা। সে সময় মেয়েরা এমন কেঁদেছিল যে তা মনকে স্পর্শ না ক'রে পারেনি। একজন বিদেশী অতিথির প্রতি তাদের এই মমত্ববোধ কবির কাছে সুন্দর লেগেছিল।

এই নাইট স্কুলে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তারও দেখা মিলত। একদিনের একটি কথা বিশেষভাবে মনে আছে। ছাদে ক্লাস বসত একটিমাত্র ডিট্‌স লণ্ঠনের আলোয়। আমি বসতাম কবির ডান হাতের কাছে, একখানি খাতা নিয়ে, কিছু কিছু নোট নিতাম। হাইকাই সম্পর্কে এতক্ষণ যে কথাগুলি লিখলাম তা সেদিনের একখানি মাত্র পাতায় লেখা নোট থেকে। অন্যান্য অনেক কথা যা আর এক খাতায় লেখা ছিল, তা হারিয়ে গেছে।

লণ্ঠনের আলো বেশি দূরে যেত না, কবির কণ্ঠও একদিন কিছু ক্ষীণ ছিল। তাঁর ইচ্ছে আমরা সবাই তাঁর খুব কাছে বসি। লণ্ঠনটা থাকত ছোট্ট একটা টুলের উপর। কাছেই বসেছিলাম সবাই, কিন্তু আমাদের মধ্যকার একজন ছাত্র কবির লক্ষ্য এড়াতে পারলেন না! তিনি বেশ একটু দূরে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। পড়াতে পড়াতে কবি একবার মাত্র চোখ তুলে বললেন, ঘুমোনোর তো আরও ভাল জায়গা ছিল।

এই শ্লেষের লক্ষ্য হচ্ছেন শিল্পশিক্ষক অসিতকুমার হালদার। এর পর তাঁকে এগিয়ে আসতেই হ'ল।

অরবিন্দমোহন বসু এক দিন তাঁর জার্মানির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। বছর দশেক বিদেশে থেকে তাঁর বাংলা উচ্চারণে টান ধ'রেছিল। অ্যানড্রুজ সাহেব একদিন আমাদের সবাইকে ডেকে গান্ধীজির অসহযোগ নীতি সম্পর্কে কিছু বললেন। তিনি তখন সদ্য তাঁর কাছ থেকে ফিরেছেন।

সন্তোষ মজুমদার একদিন রাত্রে আমাদের ঘরে ব'সে তাঁর জীবনের পূর্ব কথা কিছু শোনালেন। তাঁর সঙ্গে অল্পদিনের আলাপেই তাঁর বেশ একটা সরল মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। এমন নিরহঙ্কার মনখোলা লোক স্মরণীয়। তিনি বললেন সন্ত্রাসবাদ তাঁকে ভীষণ আকর্ষণ করছিল। তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেবেন মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন, এমন সময় গুরুদেবের আদেশ এলো অ্যামেরিকায় যেতে হবে। সেখানে না গেলে এতদিন তাঁকে আন্দামানে থাকতে হত।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী আর এক সদাশয় চরিত্র। দূর কালের ব্যবধানেও সেই অল্পকালের পরিচয়, অস্পষ্ট, তবু মনের একটি কোণে চিহ্ন এঁকে গেছে। ভাল লেগেছিল, শুধু এই স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। তাঁর মোচার আগার মতো একটুখানি শ্মশ্রুশীর্ষ যেন অনেক দিনের অব্যবহৃত স্মরণ রেকর্ডখানার উপর আজ নীড্‌ল্ এর কাজ করছে।

আশ্রমের এক প্রান্তে এক প্রাচীন ঋষি বাস করতেন। আত্মভোলা, ঋষিসুলভ শুষ্ক এবং ক্ষীণ। পাখী ও কাঠবিড়ালিদের সঙ্গে তাঁর ভাব। দর্শন শাস্ত্র অনুশীলনে বিরাম নেই; অনুশীলনে ক্লান্তি বোধ হ'ল, কিছু রিক্রিয়েশন দরকার, কিছু খেলা দরকার। দর্শন অনুশীলন ছেড়ে খেলায় মাতলেন। কি সাংঘাতিক খেলা! শুনলে চমকে উঠতে হয়। সেটি গণিতের খেলা। পড়াশোনার ক্লান্তি কাটাতে অঙ্ক কষা! এ শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। শুধু তাই নয়, শাস্ত্র অনুশীলনে কোথায়ও এসে ব্যাখ্যা আটকে গেল, ব্যাখ্যা দরকার। তখনই আপন রিকশ'খানায় চেপে হাল্কা কয়েকগাছা রেশমী দাড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছুটলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। এমন মানুষ আর দ্বিতীয় দেখলাম না। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে দেশে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি কেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা হয়নি আজও। তাঁর পরিচয় বাংলাদেশে প্রচার হওয়ার প্রয়োজন আছে।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীও ছিলেন অতি মধুর এবং উদার চরিত্রের। যখন-তখন তাঁর কাছে গিয়েছি, কত কথা আলোচনা করেছি—তিনি বিরক্ত বোধ করেননি।

জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন এঁদের পরিচয় পেলাম ঋণশোধ নাটকে। সে নাটকের কথা ভোলবার নয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজে কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। 'সারা নিশি ছিলেন শুয়ে', 'কেন যে মন ভোলে', 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে', 'আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে' ইত্যাদি।

আচার্য নন্দলাল বসুর শিক্ষাপদ্ধতি খুব সহজ ও সরল ছিল, তিনি নিজে সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার এবং অক্লান্তকর্মা। কি ভাবে আঁকলে আরও ভাল হবে, তা আঁকা ছবির উপর বা পাশে দ্বিতীয়বার এঁকে দেখিয়ে দিতেন। তাঁর হাতের পেন্সিলে আঁকা ছবি আমার কাছে দু একখানা এখনও আছে। আমার আঁকার পাশে তাঁর আঁকা।

শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকেই বর্ষার দু একটি গান খুব শুনতে পেতাম যেখানে-সেখানে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকল গানের কেন্দ্রে। 'বাদল মেঘে মাদল বাজে' অথবা 'ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়া তরীর মাঝি', এই সব গানের সুরে এমন একটি বেদনার গভীরতা ছিল যা আমার মনকে বড়ই উতলা ক'রে তুলত। মনে সব সময় ঐ সব কথা গুঞ্জরণ করে ফিরত। কিছু ভাল লাগত না। এক এক সময় মন বড অস্থির হয়ে উঠত। বিকেলের দিকে একা বেরিয়ে যেতাম বহু দূরে, নির্জন কোনো স্থানে। কখনো রেলের ধারে গিয়ে বসতাম। রেলের দু ধারে ফিকে গৈরিক মাটির পাহাড় যেন। দু ধারের উঁচু দেয়ালের মাঝখান দিয়ে রেল চ'লে গেছে। ১৯১৩ সালে এই পথে সাহেবগঞ্জ যেতে যে আনন্দ শিহরণ অনুভব করেছিলাম তাই যেন আবার ফিরে আসত মনে। কখনো চ'লে যেতাম কোপাই নদীর ধারে—বহু দূরে। দিগন্তব্যাপী সেই বিস্তীর্ণ বালু জমিতে আমার কোথায়ও আর আড়াল নেই, সমস্ত উন্মুক্ত পরিমণ্ডল যেন আমার নিশ্বাসের সঙ্গে এসে রক্তে মিশছে। শান্তিনিকেতনের আবেষ্টনেই কেমন যেন একটা বেদনার সুর। উৎসব চলছে, প্রাণোচ্ছলতার শেষ নেই, কিন্তু তবু আমি তার মাঝখানে একা। বাইরে বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্যহীনভাবে দু চার মাইল হাঁটার পর মন শান্ত হ'ত অনেক সময়।

বীরভূমের নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে বেশ একটা অভিনবত্ব আছে, আমার খুব ভাল লাগত। আশৈশব যে প্রকৃতির কোলে মানুষ, বীরভূমের প্রকৃতি তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই আমার চোখে তা ছবির মত লাগত। এ দৃশ্য প্রকৃতই চিত্রধর্মী। সবুজ এখানে পূব বাংলার তুলনায় অনেক কম। এক একটা উঁচু জমিতে তাল গাছের ভিড়—বহু দূরে দূরে। এর বেশ একটা চরিত্র আছে। পূব বাংলার নদী বাদ দিলে বাকী দৃশ্য চরিত্রহীন। ঝোপঝাড ঢাকা সমতল মাঠের পুনরাবৃত্তি বড্ড একঘেয়ে। যেন গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে। শুধু নদী পূব বাংলার দৃশ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে কিছু বলিষ্ঠতা থাকা নিতান্ত দরকার। বীরভূমের নামে ও দৃশ্যে সেই বলিষ্ঠতার পরিচয় আছে; তদুপরি কিছু রুক্ষতাও আছে। সব মিলিয়ে অভিনব।

শান্তিনিকেতনে বর্ষা কেটে গিয়ে এলো শরৎ। ঋণশোধ নাটকের রিহার্সালে সমবেত কণ্ঠে 'আজ আমাদের ছুটি' অথবা 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা' ধ্বনিত হয়ে উঠল। আমার মনের উপরকার বোঝাটাও নেমে গেল। শরৎকালের সঙ্গে পল্লীবাংলার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ এবং সে এক মধুর ঘনিষ্ঠতা। এই কালের সঙ্গে, বাংলাদেশের বহু আনন্দময় স্মৃতি একত্র জড়িয়ে আছে। তার উপর আবার শরতের সমস্ত অন্তরাত্মাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গানে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বর্ষার বেদনাভরা ভাবটি মুহূর্তে কেটে গেল, এলো ঋণশোধের পালা। সামনে ছুটির আনন্দ। ঋণশোধ নাটকের প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

অভিনয়ের আগের দিন। সবত্র বেশ একটা চাঞ্চল্য। বিকেলের দিকে আমি বেশ একটি কৌতুকময় ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। লাইব্রেরি ঘরের সামনের দিকে শালবীথির পারে কোনো একটা স্থানে স্টেজ সম্পর্কে কি আলোচনা করতে করতে কবি এগিয়ে চলেছেন। চোখেমুখে উদ্বেগের ছায়া। আমিও ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম বাইরে থেকে আসা দু তিন জন ভদ্রলোক দ্রুত সে দিকে আসছেন। কবির সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে তাঁদের সম্মুখীন হলেন। তাঁরা পর পর কবিকে প্রণাম ক'রে তাঁর মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে

চেয়ে রইলেন। বলা বাহুল্য কবি হঠাৎ খুবই বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। একজন আগন্তুক ব'লে উঠলেন, আমরা আপনাকে দেখতে এলাম।

কবি ইতিমধ্যেই আত্মোদ্ধারের পথ খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি মুখে আরও ব্যস্ততা ফুটিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন এবং ভদ্রলোকদের বললেন, আপনারা দেখুন সব ঘুরে—

তার পর হঠাৎ বাঁ পাশে মুখ ঘুরিয়ে রথী, রথী, ব'লে ডাকতে ডাকতে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। রথীন্দ্রনাথকে দেখা গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে এত দূরে যে কবির কণ্ঠ তত দূরে পৌঁছবার কথা নয়, এবং তিনি যত দ্রুতই পা চালান রথীন্দ্রনাথকে ধ'রে ফেলাও তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ ভিন্ন তখন আর কোনো উপায়ও ছিল না। রথীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবে হয়তো তাঁর পিতাকে অনেক সঙ্কটের হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকবেন, কিন্তু সে দিন নিজ চোখে দেখলাম "রথীন্দ্রত্ব" নামক একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট পুত্রসত্তা কবি-পিতাকে আশ্চর্য রকমে বাঁচিয়ে দিল।

দ্বিতীয় পর্ব

চতুর্থ চিত্র

ঋণশোধ নাটকের পশ্চাৎপট রূপে নন্দলাল বসু একখানা দৃশ্য এঁকেছিলেন। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে সবুজের সমুদ্রে শাদা ফেনার ঢেউ। এই ছবিখানা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। শিল্পীর কাছ থেকেই একটুখানি ব্যাখ্যা পেয়ে হঠাৎ যেন আর্টের উদ্দেশ্য বিষয়ে আরও খানিকটা অস্পষ্টতার কুয়াসা আমার মন থেকে কেটে গেল। শরৎকালের আনন্দ-আবেগের প্রকাশ এ ছাড়া আর কি হ'তে পারত ভেবেই পেলাম না। শরৎ-কালে মাঠে মাঠে সবুজের সমুদ্রে কাশফুলের এই সফেন ঢেউই তো এত দিন বাংলাদেশের সর্বত্র দেখে এসেছি। একটি একটি পৃথক গাছ এঁকে তার রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশের যে শরৎ-দৃশ্য মনকে নাড়া দেয় তা কোনো বিশেষ একটি জিনিস নয়। সে যেন শত কণ্ঠের ঐকতান। তা থেকে কোনো একটি সুরকে বেছে বা'র করতে গেলে সমগ্র রূপের উপর আঘাত হানা হয়। ইংরেজদের নীতিশাস্ত্রেও Spoiling the forest with too many trees নামক একটি নিন্দাবাক্য প্রচলিত আছে। অর্থ কিছু ভিন্ন হলেও মূল কথাটি এক।

আচার্য নন্দলালের আঁকা এই একখানা মাত্র দৃশ্য আমার জীবনে একটি নতুন আবিষ্কার। কারণ বাংলার শরৎকালের ভাবরূপের প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যে স্যাচুরেশন পয়েন্টে উঠেছে বলা যেতে পারে। নন্দলালের ছবিতে দেখলাম তার অব্যবহিত দৃশ্যরূপ। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহের বহু আয়োজন, বিশেষ মুহূর্তে যেমন একটিমাত্র আঁকাবাঁকা আগুনের রেখাময় ঝলকে প্রকাশিত হয়, এ ছবিটিও আমার মনে তেমনি শরৎ-আকাশের একটি বিদ্যুৎ রেখাময় প্রকাশ ব'লেই প্রতিভাত হয়েছিল।

ঋণশোধ পালা অভিনয় যে রাত্রে শেষ হ'ল, সম্ভবত সেই রাত্রেই রওনা হয়েছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে। আমার সঙ্গে ছিলেন নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।

আর ফিরিনি সেখানে ছাত্ররূপে। স্বাস্থ্য এমন ভেঙে পড়েছিল যে মনে একটা হতাশার ভাব না এসে পারেনি। আমার সমস্ত উদ্যমের মুখে বার বার স্বাস্থ্য এসে বাধা দিয়েছে।

শান্তিনিকেতনে তখন খাওয়া ছিল আলুর তরকারী, ডাল ও দই বা দুধ। এ রকম খেয়ে যে-কোনো সুস্থ লোক সুস্থতর হয়, কিন্তু এই খাদ্যে স্বভাবত রুগ্ন আমি রুগ্নতর হয়ে পড়লাম। এমেটিন হাইড্রোক্লোর ইন্‌জেকশন তখন খুব ডাক্তারজন-প্রিয় ছিল, কিন্তু "ভাঙারে জোড়া দেবে সে, কিসের মন্তরে ?"

বাড়িতে ফিরে উৎসাহহীন ভাবে ব'সে রইলাম। শান্তিনিকেতন থেকে বিদায়ের কালে ঋণশোধ পালা দেখে এসেছিলাম, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ঋণশোধের পালা আর ফিরে এলো না জীবনে।

শান্তিনিকেতনে আর ফেরা হবে না এ চিন্তা আমার কাছে বেদনাময় ছিল। মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম বলা চলে। সম্ভবত গানের সুরে সুরে সমস্ত শান্তিনিকেতন পরিমণ্ডলের সঙ্গে আমি বাঁধা পড়েছিলাম। গান আমি গাই না। নীরব কবির মতোই আমি হয় তো নীরব গায়ক—অর্থাৎ কবিও নই, গায়কও নই, কিন্তু ও দুয়ের প্রভাব আমার জীবনে একটু বেশি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন ভাবে বাইরে কোথায়ও শুনিনি তার আগে। যেটুকু শুনেছি তা যৎসামান্য। বিদ্যাসাগর কলেজ হস্টেলে তৎকালে প্রচলিত দু চারটি গান দু এক জনের মুখে শুনেছি, তার অধিকাংশই প্রার্থনা সঙ্গীত। ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটে বিমলকৃষ্ণ ঘোষ গাইত মাঝে মাঝে। তখনকার দিনের প্রচলিত গান—অমল ধবল পালে লেগেছে, মহারাজ একি সাজে, আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার, আমি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, তোমার অসীমে, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে, মন্দিরে মম, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি, শুধু তোমার বাণী নয় গো, বাদল ধারা হল সারা, প্রভৃতি গান চলত। গীতাঞ্জলির গানই বেশি।

মাঝে মাঝে এ সব গান শুনেছি শৌখিন গায়কের অপটু কণ্ঠে। পরবর্তী কালের বৈচিত্র্য এবং বহু মাজিত কণ্ঠে গাওয়ার মোহবিস্তারী

সৌন্দর্য তাতে ছিল না। এ সৌন্দর্য-স্বাদ প্রথম পেলাম শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায়।

এখান থেকে চলে আসবার সময় আনন্দবেদনাজড়িত এই সঙ্গীতময় পরিবেশের যেটুকু রেশ বহন ক'রে নিয়ে এলাম তার ক্রিয়া তখন বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে বোঝা গেল তা আমার রক্তে মিশেছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যারা সঙ্গীত মনে করেন না, তাদের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। রুচি বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রকাব্য কাব্য নয় এমন কথা অনেক ভদ্রলোক তো এককালে বলতেন। তারা অনেকে পণ্ডিত ছিলেন। এবং অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিও বলতেন রবীন্দ্রনাথের ছন্দের কান নেই। এ নিয়ে অনেক কাল ধ'রেই বাগবিতণ্ডা চলেছিল এবং রবীন্দ্রছন্দের ব্যাখ্যায় আমার পিতাও যোগ দিয়েছিলেন (ভারতী, ইং ১৯০১, 'বঙ্গভাষা' ১৯০১)। আমি পরে এ সব লেখা পড়েছি। কিন্তু এতে প্রতিপক্ষের মত বদলায়নি।

যাঁরা কাব্য ভালবাসেন এবং সঙ্গীত ভালবাসেন তাঁদের কাব্য-সঙ্গীত ভাল না লাগবার হেতু নেই। বাংলাদেশে প্রচুর কাব্য-সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে এবং সে সব নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কথার যে কি কথার-অতীত আবেদন, তা কেবল কথার জাদুকরই আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাতে পারেন। যথাযথ কথা যথাযথ সুরের বাহনে আমাদের মর্মে এসে পৌঁছয় সহজে। এর এমনই ক্ষমতা যে এরই সাহায্যে অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে অনায়াসে একটি যোগ ঘটে যায়, আমরা এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকের সঙ্গে সেই মুহূর্তে 'কমিউন' করতে থাকি। সঙ্গীতের এই 'কথা' সঙ্গীতের প্রধান কথা নয়। এ 'কথা' ভাবের সমার্থক। প্রকৃত সঙ্গীতে কথা বড় নয়, ভাবটাই বড়। রবীন্দ্র সঙ্গীতেও কথা সুরের বাহনে তার পৃথক অস্তিত্ব যথাসম্ভব লুপ্ত ক'রে ভাবে পরিণত। কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও ভাবের গভীরতায় পৌঁছনো সম্ভব। শুধু সুর, বিশুদ্ধ যন্ত্র সঙ্গীতের আবেদন প্রোফাউণ্ড হতে পারে। এমন কি দুজন প্রেমিকের মধ্যে গভীরতম ভাবের আদান প্রদান হতে পারে সম্পূর্ণ নীরব থেকে, শুধু হাতে হাত রেখে। কিন্তু প্রেম প্রকাশের এই নীরব রীতিই যদি একমাত্র রীতি হ'ত তা হলে প্রেম বেশি দিন টিকত কি না সন্দেহ।

ভারতীয় অনেক রাগই প্রোফাউণ্ড। আশ্চর্য সৃষ্টি। সামান্য কথার আশ্রয়ে, অনেক সময় অর্থহীন কথার আশ্রয়ে তা দাঁড়ায়। কাব্যকথা সেখানে অবান্তর।

রবীন্দ্রসঙ্গীত এ থেকে স্বতন্ত্র, যদিও সম্পূর্ণ নয়। এখানে কাব্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা এত বেশি যে কাব্যকেই সুরের ভিতর দিয়ে অধিকতর সার্থক করা হয়েছে। এতে বৈচিত্র্য আপনা থেকেই বেড়ে গেছে। কম্পোজার-রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত সুরেব আশ্রয়েই তাঁর গানের কথা গানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে মিশে গেছে। এর কোথায়ও তুলনা হয় না। অধিকাংশ ভারতায় রাগের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার অলঙ্কারসর্বস্বতা-বর্জিত সরল সহজ আবেদন নিয়ে। সুরের অতি অলঙ্করণ এতে চলে না। সরলতাও যে আর্টের একটি বিশিষ্ট ধর্ম সেটি আধুনিক যুগে স্বীকৃত। এটি মানলে এবং বিশ্বাস করলে তবেই এ দিকে আকর্ষণ বাড়তে পারে। অবশ্য তা শিক্ষা সাপেক্ষ। সুরের সঙ্গে সুরের মিশ্রণ মানা সহজ, কিন্তু সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের তৃতীয় আর একটি মিশ্রণকে, আর একটি সৃষ্টি ব'লে মানা অতি-অলঙ্কার-প্রিয়দের পক্ষে সম্ভবত কঠিন।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিবেশে বাল্যকাল কেটেছে। তার মূল্য আমার কাছে কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবেদন আমার কাছে সম্পূর্ণ পৃথক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত যেমন অনেক সময় যে-কোনো কণ্ঠে শুধু সঙ্গীত-ব্যাকরণ ঠিক রেখে চললেই হ'ল, রবীন্দ্রসঙ্গীত (অন্তত আমার কাছে) তা নয়। এইখানে এর আর এক বৈশিষ্ট্য। যে সব রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার ভাল লাগে, উপযুক্ত কণ্ঠে গীত সে সব গানের ভিতর দিয়ে আমি অনেক গভীর বেদনায় গভীর সান্ত্বনা লাভ করেছি; কত দূর কত কাছে এসে পড়েছে; কোনো দিন যা পাওয়া সম্ভব মনে হয়নি, তা পেয়েছি; বেঁচে থাকার নতুন সার্থকতা লাভ করেছি; অনেক মানসিক মৃত্যুর পরে জন্মান্তর লাভ করেছি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশি ভালবাসি একান্তে শুনতে, আসরে নয়। আমার ঘরে ব'সেই অনেকের গান শোনায় সৌভাগ্য ঘটেছে। একদিন কণিকার গান শোনা হচ্ছিল। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের বুড়ো দা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ

আমার চেয়েও বেশি। তিনি সেদিন কণিকার কণ্ঠে, রূপে তোমায় ভোলাব না, শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর কেউ না থাকলে বুড়োদার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা আলোচনা ক'রে অথবা তা থেকে কাব্যাংশ প'ড়ে এক একটি বেলা কাটিয়েছি। পূর্বে শান্তিনিকেতনের স্মৃতি মিত্রের ও সুচিত্রার গানও এভাবে অনেক শুনেছি। এবং আরও অনেকের। একান্তে, বিনা যন্ত্রে।

কথায় কথায় ১৯৫৬ পর্যন্ত ঘুরে যাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ১৯২২ অনেক ঘটনা নিয়ে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে।

আমাদের দেশের বাড়িতে এই সময় এমন একটি লোকের আবির্ভাব ঘটে, যাঁকে নিয়ে কয়েকটি দিন বেশ উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল।

আমার এক আত্মীয়ার সঙ্গী হিসেবে কলকাতা থেকে নরেন নাগ নামক এক ব্যক্তি আসেন। আত্মীয়া যাবেন পদ্মা নদীর ওপারে পাবনা জেলার একটি গ্রামে। মাঝপথে আমাদের বাড়িতে দু এক দিনের বিশ্রাম।

এই নরেন নাগের চেহারাটি খুব মার্জিত নয়। কেমন যেন একটি সাধারণ অশিক্ষিতের মতো চালচলন। পাতলা চেহারা, তামাটে রং, ঘাড়ের দিকে চুল চাঁছা, কপালে একগোছা চুল ঝুলে পড়েছে। মুখে পান এবং বিড়ি। যাই হোক তাঁর সঙ্গে মৌখিক একটি কি দুটি কথা ব'লেই আমার কর্তব্য শেষ করেছি। বাড়ি থেকে একটুক্ষণ বেরিয়েছিলাম। দশটায় ফিরে এসে শুনি মেয়েদের মহলে হাত দেখা ও টোটকা ওষুধ ব্যবস্থা করা নিয়ে তিনি বড়ই ব্যস্ত। আমি শুনে বেশ একটু বিরক্ত বোধ করলাম।

কিন্তু বাইরে থেকে আসা মেয়েদের মুখে ছড়িয়ে পড়ল যে গণৎকার এসেছেন, ওষুধও ব'লে দেন। গুজব শুনে প্রথমে ছুটে এলো হরেন্দ্রকুমার রায়। তখন সে শান্তিনিকেতনের কাজ ছেড়ে এসেছে। অতি-সাধুতার জন্য সে বিবেক বাঁচিয়ে কোথাও বেশি দিন কাজ করতে পারে না। যখন নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজন উগ্র হয়ে ওঠে, তখনই কাজের সন্ধানে বেরোয়, এবং কাজ পেলে কিছুদিন পরেই ছেড়ে দেয়।

সে এসে নরেন নাগকে ধ'রে বসল, কয়েকটি টোটকা ওষুধ লিখে দিতে হবে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসল সে। নরেন নাগ ওষুধ ব'লে যেতে লাগলেন। বললেন অজীর্ণের ওষুধ লিখুন। সেটি লেখা হ'লে বললেন, সর্দিকাশির ওষুধ লিখুন, এইভাবে চার পাঁচটি টোটকা লেখা হয়ে গেলে

তিনি অসুখের নাম বাদ দিয়ে বললেন, এইবার আপনার অসুখেরটি লিখুন, ব'লে একটি টোটকার নাম বললেন এবং সেটি লেখা হ'লে বললেন, উপরে লিখুন অর্শ।

হরেন অর্শে ভুগছিল এবং নরেন ও হরেন পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব আমি একটু ধাঁধায় প'ড়ে গেলাম।

হরেনই দ্রুত প্রচার করল কথাটা, এবং দ্রুত ভিড় বাড়তে লাগল আমাদের বাড়িতে। প্রফুল্লর পিতা যোগেন্দ্রকুমার এলেন। তাঁর পাশে ব'সে থেকে দেখলাম নরেন নাগ তাঁর মেরুদণ্ড বরাবর একবার হাত বুলিয়ে বললেন, আপনার অসুখ সব বলছি, লিখুন। যোগেন্দ্রকুমার নিজে ডাক্তার, লিখলেন সব। প্রত্যেকটি মিলে গেল। তিনি আমার চেয়েও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনিও যখন বিস্মিত হলেন, তখন আমি রীতিমতো ভাবতে শুরু করেছি। এর পর থেকে নরেন নাগ প্রত্যেকের হাত ধ'রে তার মনের কথা এবং যাবতীয় খবর বলতে লাগলেন। ক্রমে আমাদের বাড়ি প্রায় পীঠস্থান হয়ে উঠল।

নরেন নাগের একটি পদ্ধতি কিন্তু আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হ'ল। সেটি তাঁর লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি। লিখিত প্রশ্ন ভাঁজ করা অবস্থায় প্রশ্নকারীর হাতের মুঠোয় থাকে, তার পর সেই ভাঁজ করা কাগজখণ্ড নরেন নাগ নিজে চেয়ে নিয়ে তাঁর হাতের মধ্যে রাখেন এবং দু একটি প্রক্রিয়া করেন, তাতে কোনো রহস্যজনক উপায়ে প্রশ্নগুলো তাঁর জানা হয়ে যায়। তার উত্তর দেওয়া শেষ হ'লে প্রশ্নকারীর মুঠোর মধ্যে কোনো টাটকা ফুলের টুকরো পাওয়া যায়! এই ফুলের টুকরো মাদুলিতে পুরে ব্যবহার করতে বলা হয়।

কিন্তু এটি যে একটি উচ্চাঙ্গের ম্যাজিক এ বিষয়ে আমার আর সন্দেহ রইল না। সবই ভোজবাজি। কিন্তু অন্যটির কোনো ভৌতিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। সেটি সত্যি আমার বুদ্ধির অতীত।

তিন মাইল দূর থেকে শশী মালাকার এলো। এসে ভিড় ঠেলে নরেন নাগের কাছে গিয়ে বলল, "বাবু আমার একটি কথা আছে।" নরেন নাগ বললেন, "কি কথা, বল।" শশী বলল কথাটা তার বৌ সম্পর্কে। "বৌকে ডাক।" শশী বলল, "বাবু, সে তো আসেনি।" তখন নরেন নাগ বললেন,

"তার ব্যবহারের যে কোনো জিনিস নিয়ে এসো, শাড়ী আনলেও হবে।"

শশী মালাকার চলে গেল।

ইতিমধ্যে লোকের পর লোক, অবিরাম ধারায় আসছে। দুপুরের খাওয়া শেষ হ'ল তিনটেয়। খেয়ে উঠেও বিরাম নেই। শশী ফিরে এলো বিকেলে। বৌএর শাড়ী নিয়ে এসেছে। নরেন নাগ ভাঁজকরা শাড়ী খানা দুহাতের মুঠোয় চেপে ধ'রেই বললেন, "তোমার বৌ পাগল।"

ঘটনাটা আমরা জানতাম না। শশী স্বীকার করল, দুর্দান্ত পাগল। তারপর নরেন নাগ পাগল সারার ব্যবস্থাপত্র দিলেন।

কাগজে লেখা প্রশ্নোত্তর চলছিল শুধুই সাক্ষর লোকের সঙ্গে, তাদের সংখ্যার চেয়ে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং হাত ধ'রে অথবা পিঠে হাত বুলিয়েই বলতে হচ্ছিল অধিকাংশ স্থলে। আমি আর-সব ভুলে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম সব। লক্ষ্য করছিলাম কোথায়ও কোনো ফাঁকি আছে কিনা। কারো সম্পর্কে কিছু বলা, অতি সাধারণ-ভাবে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় হ'লে সে রকম গণনা-বিদ্যার কোনো দামই নেই। কিন্তু নরেন নাগের এ পদ্ধতিতে কোথাও কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলাম না। কারণ সবার ক্ষেত্রেই তাদের সবচেয়ে জরুরি কথাগুলোই তিনি বলতে লাগলেন। অনেকেই তা শুনে চমকে যাচ্ছিলেন।

নরেন নাগের চরিত্রের আর একটি দিক আছে। সর্বদা তাঁর সঙ্গে লেগে থেকে সেটি প্রথম দিনই আবিষ্কার করেছিলাম। সেটি হচ্ছে তাঁর ধাপ্পার দিক। অকারণ মিছে কথা বলা। গণৎকার রূপে একটি পয়সা নেওয়া গুরুর নিষেধ আছে, অথচ অন্যভাবে ধাপ্পা দিয়ে দু আনা এক আনা নেওয়ার মধ্যে আমি কোনো ভুল দেখিনি। ভেবেছি, যে বিদ্যা তিনি জানেন, তাতে তিনি সহজে ধনী হতে পারতেন, কিন্তু তার বিকল্পে এই ব্যবহার নিতান্তই অসঙ্গত।

চন্দনা নদীর পারে বোয়ালিয়া গ্রামের প্রাচীন সাহা পরিবারের ধারণা তাঁদের পূর্বপুরুষ অনেক টাকা মাটিতে পুঁতে রেখে গেছেন, কিন্তু প্রকাণ্ড স্থান জুড়ে বাড়ি, তার কোন্ অংশে তা আছে তা তাঁরা জানেন না। এখন একমাত্র ভরসা নরেন নাগ। একদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে শুনি আমার

মামাবাড়ির বড় একটি ঘরে তাঁরা সবাই এসে নরেন নাগের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। পরামর্শের বিষয়টিও তখনই শুনলাম।

গুণে ব'লে দেওয়ার ক্ষমতা যে নরেন নাগের অসাধারণ, এ বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। অতএব কোথায় টাকা পোঁতা আছে সেটি বলা আর এমন কঠিন কি। অর্থাৎ আমার বিচার বুদ্ধির একটি অংশ ইতিমধ্যেই নরেন নাগের ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়েছে।

গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া হচ্ছে শুনেই আমার মনে হ'ল বিনা শর্তে দেওয়া উচিত নয়। প্রাপ্ত টাকার একটি বিশেষ অংশ স্থানীয় স্কুলে দান করলে তবেই সন্ধান দেওয়া হবে এ রকম একটা শর্ত ক'রে নেওয়া দরকার। কিন্তু এ কথাটা এখন তাঁকে বলি কি উপায়ে। ছুটে গেলাম মামাবাড়িতে। গিয়ে দেখি বিরাট আসর। তার মধ্যে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে বলাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হ'ল। আমি চোখমুখের ভাব এমন করলাম যেন কিছুই জানি না এখানে কি হচ্ছে, এমনিভাবে নিতান্ত হাল্কাভাবে নরেন নাগকে বললাম—"নরেনবাবু, সামান্য একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে, একটু উঠবেন?"

নরেন নাগ বললেন—"এখন তো ওঠা সম্ভব নয়। দেখছেন তো চেয়ে?" ব'লেই তিনি আমার ডান হাতখানা খপ ক'রে ধ'রে সেকেণ্ড তিনেক কাঁপাতে লাগলেন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে পেন্সিলের সাহায্যে এক টুকরো কাগজে গোপনে আমাকে লিখে জানালেন—"পরিমলবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি শর্ত না ক'রে এঁদের আগেই কিছু বলব না।"

এই কথাটিই তাঁকে বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার হাতের ভিতর দিয়ে তা তাঁর মনে পৌঁছল কি ক'রে তা আমি জানি না।

একদিকে এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে অন্যদিকের দু'এক আনার ধাপ্পা, ক্ষমার চোখেই দেখলাম।

আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা বলি। চন্দনা নদীর পারে মোহনপুর গ্রামের ঘোষেদের বাড়িতে নরেন নাগকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দুপুরে, এদিকে আমাদের বাড়ির জনতা ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছে, তাদের অধৈর্য বাড়ছে। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ফিরে আসার কথা, কিন্তু চার ঘণ্টা পার হয়ে গেল।

আমি অগত্যা নিজে গেলাম তাঁকে ধ'রে আনতে। গিয়ে এক রকম

জোর ক'রে তাঁকে কেড়ে নিয়ে এলাম অন্দর মহল থেকে। বাইরে আসতেই এক মুসলমান যুবক হন্তদন্ত হয়ে নরেন নাগের গতি রোধ ক'রে দাঁড়াল, বলল, "বাবু আমার কথাটা একটু ব'লে যেতেই হবে।" নরেন নাগ বললেন এখন আর সময় নেই। আমিও তাই বললাম। তখন সে প্রায় কেঁদে ফেলল। নরেন নাগ তার হাতখানা চেপে ধ'রে একটু কাঁপিয়ে বললেন, "ও! তোমার বৌ সরে পড়েছে—এত নিয়ে।" ব'লে দুহাতে একটা পরিমাণ দেখালেন। যুবক বলল "হাঁ বাবু। এখন কি করি?"

নরেন নাগ বললেন "এনায়েত—

যুবক বলল, "হাঁ বাবু, সে শালাও আসত।"

নরেন নাগ যুবককে আশ্বস্ত করলেন, "ভয় নেই, বৌ আবার ফিরে আসবে।"

কোনো দিক দিয়েই ভেবে পেলাম না এটি কি ক'রে সম্ভব। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছি—বলেন না ঠিক কিছু। কামাখ্যায় শেখা বলেন। কিন্তু যেখানেই শেখা হোক. এ রকম ক্ষমতা মানুষের কি ক'রে লাভ হয় এ এক মহা রহস্য, আজও আমি এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

কলকাতায় তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল সম্ভবত এর তিন চার বছর পরে। কিরণকুমার ছিল আমার সঙ্গে সেদিন, এসপ্ল্যানেডে ট্রামে উঠতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা। তাঁর ঠিকানা নিলাম। কিরণ ও আমি একদিন গেলাম তাঁর কাছে, চিৎপুর রোডের কাছে কোনো ঠিকানায়। দেখা হল, কিরণের হাত ধ'রে তার বিষয়ে কিছু বলতে যেতেই গলা থেকে অনেকখানি রক্ত বমন করলেন মেঝের উপর। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না। বললেন ওটি তাঁর সাধনার ফলে ঘটেছে। কি সাধনার ফলে জানি না। ঘরে দারিদ্র্যের চিহ্ন, অপরিচ্ছন্ন চারদিক। কিন্তু এ রক্ত কিসের রক্ত? পেটের না ফুসফুসের? —একটু ভীতভাবে উঠে এলাম; নরেন নাগের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

নরেন নাগের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হওয়াতে আমার একটা লাভ হয়েছিল। আগে যে সব জিনিস হয় না ধারণা ছিল, এবং তা জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতাম, এর পর থেকে সে জোর কমে গেল। শুধু এ বিষয়ে নয়, সব বিষয়ে। আমি যা সত্য ব'লে জানি, তার বাইরে সত্য থাকতেও পারে এমনি একটা মনোভাব গড়ে উঠল ক্রমে। অর্থাৎ মনের

গোঁড়ামি কিঞ্চিৎ দূর হ'ল। এক গোড়ামি থেকে আর এক এক গোঁড়ামিতে যাওয়াই হচ্ছে মনের স্বভাব। এর মাঝামাঝি আরও একটি পথ আছে ব'লে ক্রমে বিশ্বাস হ'ল—এবং সে পথই নিরাপদ এটিও বুঝলাম। তাই আজও এটা হয় না, বা ওটা অসম্ভব, এমন কথা বলতে আটকায়। বলি হতেও পারে, জানি না, তবে আমার নিজের এই বিশ্বাস, বা আমি নিজে এর বেশি ভাবতে পারি না।

আমার অবিলম্বে আর কিছু কর্তব্য নেই, শুধু বাড়িতে বসে আছি এটি আমার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ হচ্ছিল। পড়াশোনার পথে চলব না মনে মনে স্থির করেছিলাম, কিন্তু তা না করলে ব্যবসা করা উচিত। সে সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ মনে মনে খুব বড় হয়ে উঠেছিল। চাকরি করব না, ব্যবসা করব। কিন্তু কিসের? সেইটি ঠিক হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত। মাসের পর মাস যায় বিষয় নির্বাচন হয় না।

বাবা ইতিপূর্বে আমার চলার পথে কখনো বাধা দেননি, এইবার তাঁর ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন, কিছু না ভেবে আগে এম. এ. ডিগ্রীটা নাও, তার পর যা হয় ভেবো

পড়াশোনার বিরুদ্ধে মনটা প্রায় স্থির ক'রে ফেলেছি, এমন সময় এ প্রস্তাবটা হঠাৎ খারাপ লাগল। মনে মনে ডিগ্রীর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি খাড়া করেছি। আমার আদর্শ প্রফুল্লচন্দ্র, আমি বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার হ'তে দেব না এই পণ। বললাম এম. এ. পাস ক'রে লাভ কি? আমি ব্যবসা করব। প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের কথাটাও প্রকাশ করলাম। বাবা বললেন, প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং অনেকগুলো ডিগ্রীর অধিকারী, তাই ডিগ্রীর মোহ তাঁর নেই, তুমিও এম. এ. পাস কর, তার পর যা হয় ক'রো, ডিগ্রীর বিরুদ্ধে তোমার যুক্তি তখন শোনা যাবে।

প্রফুল্লচন্দ্র যে নিজে ভাল ভাল ডিগ্রীর অধিকারী হয়ে তবে ডিগ্রীর বিরুদ্ধে বাঙালী যুবকদের মন ভাঙাচ্ছেন, কথাটা মন্দ লাগল না। এ রকম যুক্তি মনে আসেনি। এ পথে ভাবতে গিয়ে অনেক দূর চ'লে এলাম। যে ব্যক্তি ডিগ্রীধারী, ডিগ্রীর বিরুদ্ধে বলার অধিকার তাঁর থাকবে না তো কার থাকবে? যিনি মদ্যপান করেন, মদের বিরুদ্ধে তাঁর কথাই গ্রাহ্য, যিনি চা পান করেন, চা পান না বিষ পান বলার অধিকার তাঁরই। অতএব এম. এ.

ডিগ্রী খারাপ কিনা, এম. এ. পাস না ক'রে আমি বুঝব কি ক'রে। রাজি হয়ে গেলাম বাবার প্রস্তাবে। তা ভিন্ন বাবার ইচ্ছা এই প্রথম পালন করব ভেবে মন প্রসন্ন হ'ল।

অর্থাৎ এম. এ. ক্লাসেই আবার ভর্তি হব। ইংরেজী বই অধিকাংশই কেনা ছিল, অতএব ইংরেজীতে ভর্তি হওয়াই মোটামুটি ঠিক করলাম। কিন্তু নতুন ক'রেই যখন পড়তে হবে তখন নতুন কোনো বিষয় নিলে কেমন হয় এ প্রশ্নও জাগল মনে। নানা বিষয়ে আকর্ষণ অনুভব করি মনে মনে। যে জিনিস বাড়ি ব'সে নিজে নিজে পড়া অসুবিধাজনক, এ রকম একটি বিষয় পড়ার কথাও ভাবলাম। মনশ্চক্ষে প্রথম ভেসে উঠল অ্যানথ্রপোলজি। বিষয়টি নতুন, এবং আমার কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক বোধ হল, এবং দুতিন দিন নানা ভাবে চিন্তা ক'রে শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টিই পড়ব ঠিক ক'রে ফেললাম। ইংরেজী যেটুকু পড়েছি তাতে ঘরে ব'সে বাকী বই নিশ্চয় পড়তে পারব, কিন্তু কোনো বিজ্ঞানের সকল অঙ্গ নিজে নিজে পড়ায় অসুবিধে। অতএব অ্যানথ্রপোলজি।

টাকা নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হব—সুদীর্ঘ আড়াই বছর পরে।

সব ঠিক, এমন সময় যাকে বলে 'ম্যান প্রপোজেস্ গড ডিসপোজেস'—মানুষ যা আয়োজন করে, ঈশ্বর তা ভেঙে দেন, তাই ঘটল। মালদহের ঈশ্বরলাল কুণ্ডু ছিল আমার সহপাঠী, তার সঙ্গে দেখা হতেই সে ধ'রে বসল ভর্তি হয়ে টাকা ও সময় নষ্ট করার দরকার নেই, তিন মাস পরে পরীক্ষা, বি. এ. পাসের পর তিন বছর হয়ে গেল —অতএব নন্-কলিজিয়েট হয়ে পরীক্ষা দেওয়ায় বাধা নেই।

ঈশ্বরলাল উকিল হওয়ার জন্য আইন পড়ছিল, তার ঐ সঙ্গে একটি এম. এ. ডিগ্রীর দরকার ছিল। সে জন্য সে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আমারও ডিগ্রী নেবারই প্রয়েজন ছিল, কিন্তু তবু আমি এ প্রস্তাবে স্তম্ভিত হয়ে বললাম—সে একেবারে অসম্ভব, আমি অ্যানথ্রপোলজির জন্য তৈরি হয়ে এসেছি। ঈশ্বরলাল বলল, সে খুব ভাল কথা সে জন্য আগামী বছর ভর্তি হলেও চলবে, আগে বিনা খরচে বাংলায় পাস ক'রে নাও, বই সব আমার, এক সঙ্গে পড়া যাবে।

ঈশ্বর স্বয়ং সেটানের ভূমিকায় নেমে আমাকে ক্রমাগত বোঝাতে লাগল। তার নিজের এক বেলার পড়া নষ্ট ক'রে। এবং শেষ পর্যন্ত ভজিয়ে ফেলল। মাত্র তিন মাস সময়, এবং বাংলার সঙ্গে অতিরিক্ত তিনটি ভাষা নতুন ক'রে শিখতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সে আমাকে কিছু ভাবতেই দিল না আর। সে থাকত বিদ্যাসাগর হস্টেলে। সম্ভবতঃ সে তখন প্রিফেক্ট রূপে বাস করত, ঠিক মনে নেই। কিন্তু আমি কোথায় থাকব সে হ'ল এক সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'লে কোনো পি. জি. হস্টেলে থাকা চলত হয় তো, কিন্তু এ অবস্থায় কি করা যায়। বিদ্যাসাগর হস্টেলে ঈশ্বরলালের গেস্ট হয়ে থাকা তখন চলল না, সীট খালি ছিল না। দিনের বেলা হস্টেলে কাটানো যায়, কিন্তু রাত্রি বাস তখন স্থানাভাবে সম্ভব নয়।

তখন মনে পড়ল হরেন্দ্রকুমারের কথা। সে এতদিনে রবীন্দ্রনাথের কাজে এসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে সে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে থেকে তাঁর বাজারের কাজ করে। তার কাছে গিয়েছি দু একবার, সে বলল এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে, তুমি থাকতে পার। রথীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করতেই তিনি সহজে সম্মতি দিলেন। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ঠিকানা—বিশ্ববিখ্যাত ঠিকানা। সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই বাঁয়ের দিকের ঘর। বড় ঈজি চেয়ার ছিল একখানা সে ঘরে। সেই খানায় আমি ঘুমোতাম। খাটে থাকত হরেন্দ্রকুমার।

দিনের বেলা হস্টেলে গিয়ে পড়তাম। রাত্রে ফিরে, শুধু ঘুমনো নয়, পড়তেও হ'ত কিছু, যতটা পারা যায়। ক্রমে পড়া ভাল লাগতে লাগল। পাঠ্য বইয়ের অনেকগুলির ইতিহাসমূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলাম। এত অল্প সময়ে তিনটি নতুন ভাষা সহ এতগুলো বই প'ড়ে আটটি পেপারে পরীক্ষা দিতে হবে, সেজন্য মনোযোগকে চাবুক মেরে, তাকে চোখের-পাশ-ঢাকা গাড়িটানা ঘোড়ার মতো narrow angle ক'রে নিলাম—মনের দৃষ্টি যাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয়।

এই বাড়িতেই কিছু দিনের মধ্যে এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য বিসর্জন নাটকের রিহার্সাল শুরু হল। অভিনয় হয়েছিল অগস্টের (১৯২৩) কোনো তারিখে। রিহার্সাল চলত আমার মাথার উপরে কোনো ঘরে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে বিকেলে হস্টেলে যেতাম। সব দিন

যাওয়া ঘটত না। রিহার্সালের আড়ম্বরের মধ্যে মনোযোগ খুব বেশি বিক্ষিপ্ত হয় নি, কেননা ততদিনে পড়ায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছি। মাঝে মাঝে মানসিক ক্ষণবিরামের মুহূর্তে,—এবং যখন রিহার্সালের সম্মিলিত ধ্বনি আর শোনা যায় না,—তখন কবি-কণ্ঠে একছত্র দুছত্র গানের সুর ভাঁজা প্রায় শুনতে পেতাম। এই ভাবে তিনি মনে-আসা সুরের আভাসকে রূপায়িত করতেন এবং তার সঙ্গে কথা জুড়ে গান রচনা করতেন। এক একটি সুর গাইছেন, পছন্দ হচ্ছে না, আবার কিছু বদলিয়ে গাইছেন। এই ভাবে চলত সর্বক্ষণ। মাঝে মাঝে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিতেন, তার আওয়াজও খুব জোর ছিল।

ক্রমে বিসর্জনের অভিনয় এবং আমার পরীক্ষা, দুইই আসন্ন হয়ে এলো। ভীষণ লোভ অভিনয় দেখব, অথচ তখন নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। দেখব না-ই ঠিক করলাম। মনকে একেবারে যাকে বলে বেঁধে ফেলা, তাই করলাম। নিজেকে বিসর্জন না দেওয়ার কঠিন প্রতিজ্ঞা।

তার পর অভিনয়ের দিন এলো, বিকেলে সবাই এম্পায়ার থিয়েটারের উদ্দেশে বেরিয়ে যাচ্ছেন—সবই লক্ষ্য করছি। ঠিক এমনি সময়ে পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভূমিকম্পের মতো টলে উঠল। আবার প্রশ্ন জাগল দেখব কি দেখব না। না দেখলে মস্ত বড় একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হব, দেখলে কম ক'রেও দিন সাতেক লাগবে এর প্রভাব কাটাতে। নাটকখানি ভালভাবে পড়া ছিল, জানতাম তার অভিনয়-রূপ আমাকে বিচলিত করবে, তাই ভয়। অনেকটা হ্যামলেটের দ্বন্দ্বের মতোই—To be or not to be—

কলকাতায় থিয়েটার দেখছি প্রথম আসবার পর থেকেই। ১৯১২ কিংবা ১৩ থেকে। বাল্যকালে প্রথম বলিদান নাটক দেখেছি বেশ মনে আছে। দানীবাবু দুলালচাঁদ সেজেছিলেন। গিরিশ ঘোষের অভিনয় আমি দেখিনি তারপর কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় নিয়মিত থিয়েটার দেখেছি। নিয়মিত সিনেমা দেখেছি ১৯২২ থেকে।

বলা চলে, অভিনয় দেখার ঝোঁকটা একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল। তাই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আর হ'ল না। সবাই চলে যাওয়ার পর কবি যখন গাড়িতে উঠে পড়েছেন তখন হঠাৎ মনে হ'ল, না দেখলে অনুতাপের আর অন্ত থাকবে না। দিশাহারা হয়ে কবিকেই অর্বাচীনের মতো জিজ্ঞাসা

ক'রে বসলাম এখন টিকিট পাওয়া যাবে কিনা। তিনি বললেন, আমি তো ঠিক বলতে পারব না, তুমি চলে যাও থিয়েটারে, সেখানে গিয়ে খোঁজ কর। আমি তখন বিভ্রান্ত। প্রতিজ্ঞা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার আনন্দের প্রথম ইনস্‌পিরেশনেই নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ।

কাল বিলম্ব না ক'রে ছুটে গেলাম এম্পায়ার থিয়েটারে এবং বিসর্জন দেখলাম। যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল। এমন শ্রদ্ধা এবং তৃপ্তি নিয়ে অভিনয় আমি কমই দেখেছি। যা পাব আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেলাম। সবটা অভিনয় আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহ আর দিনেন্দ্রনাথের রঘুপতি। তার উপর সাহানা দেবীর অতগুলি গান—এম. এ. পাঠ্যপুস্তকগুলিকে লজ্জায় সঙ্কুচিত করল।

জয়সিংহ-বেশী রবীন্দ্রনাথকে দেখে যৌবনের রবীন্দ্রনাথকে কল্পনা করছিলাম। অপর্ণার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের সময়ে জয়সিংহের উক্তি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির ভিতর দিয়ে তা দীর্ঘ মনে হয় নি। শেষ দৃশ্য রোমাঞ্চকর। বিচলিত হয়েছিলাম। সে বয়সে অনেক কিছুতেই বিচলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

নির্দিষ্ট কয়েক মাসের বিরামহীন পড়ায় এই একটি ছেদ পড়ল, এবং তা ছাড়াও বন্ধু শৈলেন চাটুজ্যের বিয়েতে দেশে যেতে হয়েছিল। ফলে পড়া আরম্ভ করতে হ'ল আবার নতুন উদ্যমে। দিনে রাতে মোট প্রায় ১৬ ঘণ্টা।

এরই মধ্যে একটি পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে হ'ল। বাবা পারসিক ভাষা শেখার পর সাদির পন্দনামা ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপি খানা আমার কাছে পাঠিয়ে লিখেছিলেন তাঁর কথা যেন 'রবিবাবু'কে স্মরণ করিয়ে দিই এবং তাঁর এই নতুন উদ্যমের কথা তাঁকে বলি। রবীন্দ্রনাথ সে যুগে আমাদের সবার মুখেই রবি ঠাকুর অথবা রবিবাবু ছিলেন।

একদিন সুযোগ পেলাম দেখা করার। দোতলায় তিনি তখন একা ছিলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন বাবার সম্পর্কে। আগেই বলেছি বাবা পোতাজিয়া স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন—এবং পোতাজিয়া ছিল সাজাদপুর থানায়। এই সাজাদপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা নতুন ক'রে বলবার দরকার নেই। এই অঞ্চলের ভূগোল সম্পর্কে সেদিন তিনি আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন। হুড়োসাগর

নদীর অবস্থা এখন কেমন, বর্ষায় কেমন সব ডুবে যায়, এ সব বেশ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করছিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর জীবনের অনেকখানি অংশ এই স্থানের সঙ্গে বাঁধা আছে, তাই এই কৌতূহল। আমার পিতার কথা বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন, এবং তিনি একদা তাঁকে শান্তিনিকেতনে ইংরেজী পড়বার ভার দিতে চেয়েছিলেন সে কথা আমাকে বললেন। সে প্রসঙ্গ আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

পন্দনামা বইয়ের বাংলায় কি নাম দেওয়া যায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি পাণ্ডুলিপির কয়েকখানা পাতা উল্টে উল্টে দেখে নিলেন একটুখানি, এবং বললেন, একে নীতিপত্র বলতে পার। বই ছাপা হয়েছিল ১৯২৫ সালে। ঐ নামই রাখা হয়েছিল। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার ধরন সম্পর্কে কথা উঠল। কি কি বই পড়া হয় এবং কেমন ভাবে হয়, তাও তিনি একে একে জেনে নিলেন। তিনি একখানি বিশেষ বইয়ের কথা শুনে এমন বিচলিত হয়ে উঠলেন যে আমার নিজেকে সে সময় অত্যন্ত অপরাধী মনে হ'তে লাগল তিনি দুবার জিজ্ঞাসা করলেন—"এই বই এম. এ. তে পড়ানো হয়?"—মনে হ'ল যেন বলতে বলতে মুখচোখ একটু লাল হয়ে উঠল, (ক্রোধে কিংবা লজ্জায়, জানি না) তবে তখনই সামলে নিলেন, এবং আগের মতোই শান্তভাবে বলতে লাগলেন, "স্কুলের পরীক্ষার সঙ্গে তোমাদের এম. এ. পরীক্ষার কোনোই পার্থক্য নেই।"—নোট মুখস্থ ক'রে এম. এ. পাস করা যায় শুনে তিনি সেদিন অবাক হয়েছিলেন। বললেন, চারুকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) বলেছি, কিন্তু তার এতে কোনো হাত নেই।

এই প্রসঙ্গে আরও এক দিন অন্য এক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে একই রকম বিচলিত হ'তে দেখেছি মনে পড়ল। সেটি ১৯৩৭ সালে চন্দননগরে কবির হাউস-বোটের মধ্যে। শ্রীঅমল হোম আর আমি সেখানে ছিলাম অন্য কেউ তখনও এসে পৌছন নি। কোনো একটি বিশেষ রচনা সম্পর্কে তিনি সেদিন ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যিক শান্তিভঙ্গ হবে আশঙ্কায় কোনোটিরই নাম প্রকাশ করা গেল না।

অবশেষে এম. এ. পরীক্ষা এসে পড়ল। কয়েকদিনের জন্য বিদ্যাসাগর হস্টেলে একটি সীট সংগ্রহ করা গেল। তাতে বেশ সুবিধা হ'ল। প্রতিদিন হস্টেলে আসার সময়টুকু বেঁচে গেল।

আমাদের সময়ে বাংলা পরীক্ষার যে আটটি পেপার ছিল সেই আটটি পেপারের প্রত্যেকটিই ইংরেজীতে লেখা চলত খুশি মতো। বাংলাতে লিখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আমি সাতটি পেপার ইংরেজীতে লিখেছিলাম। বাংলায় পরীক্ষার্থী খুব বেশি ছিল না। সেনেট হলে প্রথম যিনি বসেছেন, আর সবাই তাঁর পর পর পিছনে। সম্ভবত ইণ্ডিয়ান ভার্নাকুলার সব এক সঙ্গে। আমাদের বাঁ পাশে ইংরেজী পরীক্ষার্থীরাও ঠিক ঐ ভাবে। একে বলা হয় single file বা Indian file। পরীক্ষাগৃহে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে আমাদের পাশ দিয়ে কয়েক দিন যেতে দেখেছি।

আমাদের ফাইলের পুরোভাগে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আর আমি একজন বাদে সবশেষ। অর্থাৎ আমার পিছনে মাত্র এক জন, কিন্তু আমার সম্মুখের সাতটি শূন্য, পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত। ফিসফাস চলেছিল মন্দ নয়, কিন্তু আমার কোনোই উপায় ছিল না, আমার সম্মুখস্থ আসন শূন্য। পিছনে যিনি ছিলেন তিনি নির্বিকার। বরঞ্চ তিনি কিছু অসুবিধের সৃষ্টি করেছিলেন অন্য ভাবে। আমার বাঁ পাশের ইংরেজীর ছেলেরা কেউ কেউ চাপা গলায় আমার কাছে দু একটা শব্দের বানান জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছেন। কিন্তু সব চেয়ে অসুবিধে ঘটাতে লাগলেন আমার পিছনের পরীক্ষার্থী। তিনি প্রত্যহ মিনিট পনেরো লিখেই গুন্‌গুন্ ক'রে সুর ভাঁজতে লাগলেন। তিন দিন সহ্য ক'রে চতুর্থ দিন তাঁকে বললাম, "আপনি তো মশায় খুব ক্ষমতাবান পুরুষ, গান গাইতে গাইতে লিখতে পারেন।"

তিনি বললেন, "আমি তো লিখি না।"

"সে কেমন কথা ?"

বললেন, "আমি ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষার্থী, কিন্তু আমার লেখবার কিছুই নেই।"

"কেন ?

"পড়াশোনা আদৌ করিনি, ক্লাসে একমাত্র পরীক্ষার্থী আমি। অধ্যাপকের অনুরোধে পরীক্ষা দিচ্ছি।"

অতঃপর তিনি যা বললেন, তা তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক এবং তাঁর অধ্যাপকের পক্ষে করুণ। সে কথা প্রকাশ ক'রে বলবার নয়।

তৃতীয় পর্ব

প্রথম চিত্র

পরীক্ষার ফল ভালই হ'ল এবং কেমন ক'রে হ'ল তা আমি আজও জানি না ; কোন্ প্রশ্ন কি ভাবে লিখলে এম. এ. পরীক্ষক খুশি হবেন জানা ছিল না, বিষয়ের ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত বললেই হয়। কোনো বিশেষ শ্রেণীতে পাস করার লোভও ছিল না, কিন্তু দৈবাৎ প্রথম শ্রেণীই পেয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা এবং শেষ পরীক্ষা দুইয়েতেই প্রথম শ্রেণী হ'ল, আত্মতুষ্টির পক্ষে ঘটনাটা মন্দ নয়। আমাদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জীবনেও তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম সম্মান পেয়ে গেছেন স্বদেশের কাছ থেকে।

যাই হোক আমার আবার সমস্যা দেখা দিল, পরবর্তী কর্তব্য কি ? এ সমস্যা অবশ্য শেষ পরীক্ষা পাস করার পর প্রায় সবারই। শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় ছেদ পড়ায় মনে দুঃখ ছিল। সেখানে তো আর ফেরা হ'ল না, অথচ দেখি চিত্রাঙ্কন শিক্ষার বাসনাটাই আবার একটু একটু ক'রে মাথা তুলছে।

পুনরায় কলকাতাতেই চ'লে এলাম।

এবং এসেই সোজা সরকারী আর্ট স্কুলে গিয়ে অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের কাছে মনের বাসনা প্রকাশ করলাম। তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমার বক্তব্য ছিল আধুনিক রীতিতে কিছু সুবিধে করতে পারব কি না, অর্থাৎ শেষ লক্ষ্য তেল। তিনি বললেন যে রীতিতে কাজ করেছ, তা ছেড়ে এখনই অন্য রীতিতে যাওয়া সম্ভব হবে না, আগেরটি ভুলতে কিছু সময় লাগবে, অতএব প্রাচ্য পদ্ধতির জলেই লেগে থাক, তেলের আশা ছাড়। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ও সেই কথাই বললেন। অর্থাৎ অয়েল পেন্টিং চলবে না।

অগত্যা তাই। আমার শিক্ষক হ'লেন হেড মাস্টার ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা। আমাকে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে নেওয়া হ'ল। ঈশ্বরীপ্রসাদ আমাকে

অতিরিক্ত খাতির করতে আরম্ভ করলেন। আমার প্রতি সেই পক্বকেশ বৃদ্ধের স্নেহ আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। তিনি প্রথমেই আমাকে সম্মানিত করলেন তাঁর ডান পাশে আমার জন্য একটি পৃথক আসনের ব্যবস্থা ক'রে। খুব কাছে বসালেন। তারপর আমাকে তাঁর হাতের কাজ দেখাতে লাগলেন। তিনি তখন বাইরের কোনো মহারাজার অর্ডারি একটি মিনিয়েচার পেন্টিং করছিলেন আইভরির উপর। বললেন একমাত্র এতেই পয়সা, তোমাকে এ কাজ শিখিয়ে দেব। তার পর একদিন আমাকে মিউজীয়ামের আর্ট গ্যালারিতে নিয়ে রাজপুত পেন্টিংয়ের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন মোটামুটিভাবে এবং একখানা ছবি দিয়ে বললেন এ খানা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কপি কর। নিজ হাতে কপি করতে করতে তবে একটা পদ্ধতি আয়ত্ত হয়, বুঝতে সুবিধে হয়। কিছুদিন এ কাজ করতে হবে তোমাকে। সে ছবিখানার একটি কপি করেছিলাম, তাতে অন্যান্য রঙের সঙ্গে সোনা রঙও ছিল। কপিখানা এখনও অবিকৃত আছে।

স্কুল ছুটির পর প্রায় প্রতিদিন তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং হালুয়া খাওয়াতেন। তাঁর পুত্রের (রামেশ্বর বর্মা) অনেকগুলি পেন্টিং তার ঘরে টাঙানো ছিল, দেখালেন। তাঁর নিজের আঁকা ভারতীয় রাগ-রাগিণীর কল্পিত রূপ কয়েকখানি ছিল। সে ছবিগুলো আমার ভাল লাগে নি।

এর পর মাসখানেক তাঁর নিতান্ত অনুগত হ'য়ে চলার পর তিনি আমাকে আরও বেশি খাতির করতে লাগলেন এবং এই সময় তিনি তাঁর সবচেয়ে গোপন কথাটি আমার কাছে প্রকাশ করলেন। এ কথা ছিল তাঁর মনে মনে। হয় তো কাউকে কখনও বলতে পারেন নি, তাই আমাকে বলতে পেরে তিনি নিজের ঘাড় থেকে যেন একটা বড় বোঝা নামিয়ে ফেললেন।

তাঁর একান্ত ইচ্ছা আমি আর্ট স্কুল ছেড়ে দিই। বললেন, "এখানে কিছুই হয় না। এখান থেকে যারা পাস ক'রে বেরোয় তারা মাথা খুঁড়েও ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকরি পায় না।" তার পর একটু চাপা গলায় একটু ব্যঙ্গ মিশ্রিত সুরে অন্যান্য ছাত্রদের দিকে ইসারা ক'রে বললেন,— "ঐ যে দেখছ ওদের, ওরা সবাই র‍্যাফেল হতে এসেছে এখানে। কি রকম

শুনবে? এক র‍্যাফেল গম ভাঙার কল খুলে ক'রে খাচ্ছে। আর এক র‍্যাফেল এক অফিসের কেরানি হয়েছে। এখানে পড়লে তুমিও ঐ রকম র‍্যাফেল হবে। রাজি আছ?"

আমি হতাশ হয়ে পড়ি। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "আমার মতো যদি মিনিয়েচারের কাজ শেখ তা হ'লে এতে কিছু সুবিধে হ'তে পারে। যদি স্কুলে টিকে থাক তা হ'লে আমি শিখিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে বলি না থাকতে, তুমি এ পথ ছাড়।"

ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রতিদিন আমাকে সঙ্গে ক'রে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং কানে এই মন্ত্র দিতেন। ক্রমে তাঁর কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করলাম, বুঝলাম তিনি সত্য কথাই বলেছেন। কারণ সেই ১৯২৮ সালে শিল্পীর কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না, তার প্রমাণও পেলাম চারপাঁচ বছর পরে এক বিজ্ঞাপনের সাহায্যে। ত্রিশ টাকা বেতনের একজন শিল্পীর দরকার হয়েছিল, আবেদনপত্র এসেছিল প্রচুর। সেও আবার ছবি আঁকার কাজ করতে নয়, ফোটোগ্রাফের এনলার্জমেণ্ট ফিনিশিংএর কাজে। অনেক শিল্পীই তখন নিজের চেষ্টায় এই বিদ্যা শিখে নিয়েছিলেন অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য।

ঈশ্বরীপ্রসাদ আমার প্রকৃত হিতৈষীর কাজ করলেন।

আবার শহর থেকে গ্রামে। এখানে কাজ কিছুই নেই, তবু এ পরিবেশ নিতান্ত আপনার। রতনদিয়া গ্রামের পরিবেশ।

পদ্মার ভাঙনে যখন কালুখালি স্টেশন রতনদিয়ার সীমানায় উঠে এলো তখন থেকে এ গ্রামের দাম বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত। জায়গাটি পাইকপাড়ার সিংহ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং সম্ভবত ১৯১৭ সালে একবার সাহেববেশী অরুণকুমার সিংহকে দেখেছিলাম রতনদিয়া কাছারীতে। ততদিনে রতনদিয়া গ্রামে প্রকাণ্ড বাজার বসে গেছে এবং বর্ষার চন্দনা বিদেশী বহু নৌকোভরা বন্দরে পরিণত হয়েছে। এ বন্দরের স্থায়িত্ব বছরে প্রায় চার মাস, তারপর নদী শুকিয়ে যায়, তখন আর নৌকো চলে না।

বাজার ও বন্দর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে। আগে এ অঞ্চলটি ছিল চাষের ক্ষেত আর ঝোপঝাড়ের অঞ্চল। শ্মশানও ছিল এই দিকে। স্টেশন থেকে চন্দনানদী পর্যন্ত শড়ক তৈরি হ'ল বণিকদের জন্য। দূরত্ব সিকি মাইল

মাত্র। গ্রামের সঙ্গে বাজারের যোগাযোগ হ'ল আর একটি শড়কে। তার পাশে প্রকাণ্ড স্কুল ঘর তৈরি হ'ল, আর হ'ল অতি সুন্দর একটি খেলার মাঠ। দৈনিক বাজারও আয়তনে খুব বেড়ে গেল। সব রকম মাছ, তরিতরকারী, দুধ, বেলা আটটা থেকে একটা পর্যন্ত বিক্রির বিরাম নেই। কি সস্তা সব জিনিস, কি স্বাদ এবং টাটকা।

বাজার ও গ্রাম—মাঝখানে একটি পথ। এতবড় বাজার কিন্তু তাতে গ্রামের শান্তি কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয় নি। বর্তমানের বিচারে এ গ্রামকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত বলা চলে। অথচ কারো মনে কোনো বিষয়েই কোনো আতঙ্ক নেই। গৃহসংলগ্ন জমিতে তরিতরকারী, ফলের গাছে ফল, আম কাঁঠাল ইত্যাদি—সবই অরক্ষিত, খোলা প'ড়ে আছে। আসবাবপত্র খোলা-বৈঠকখানায় পড়ে আছে, কোনো দিন কিছু চুরি হয় না। সিঁদেল চোরের আবির্ভাব বছরে একবার হয় কিনা সন্দেহ। মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে নদীতে স্নান করতে যায়। কোনো দিন কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে এমন শোনা যায়নি।

রতনদিয়া গ্রামটি পূর্বপরিকল্পিত একটি সুন্দর ছোট্ট উপনিবেশের মতো। এ গ্রামে যদিও সবাই হিন্দু, কিন্তু চারিদিকের সমস্ত গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রবাস। সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত। সাধারণ মুসলমানেরা সবাই প্রায় কৃষিজীবী। তারা দৈনিক বাজারে দুধ তরিতরকারী বিক্রি ক'রে নগদ পয়সা উপায় করে। তা দিয়ে মাছ কেনে। সবাই নিজ নিজ অদৃষ্ট মেনে নিয়ে তৃপ্ত। তারা ইংরেজ রাজত্বের খোঁজ রাখে না, তারা সবাই ঈশ্বরের রাজত্বে বাস করে। বড় বড় ব্যাপারে জীবন মরণ সমস্যায় তারা ঈশ্বরের বিচার মেনে চলে। কারো বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ নেই। তাদের মুখের দিকে চাইলে বহু কালের একটি অভ্যস্ত আত্মভোলা সরলতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান যে সামাজিকভাবে পৃথক, তা ভাল হোক মন্দ হোক, সবারই অভ্যাস হয়ে গেছে। এ নিয়ে কেউ কারো সীমানায় অনধিকার প্রবেশের কথা চিন্তা করে না।

এদের মাঝখানে বাস করার মতো তৃপ্তি আর নেই। গ্রাম্য জীবনের আর একটি বড় আরাম হচ্ছে এখানে ক্ষুরের ব্লেড ও ঘড়ি না হ'লেও চলে। এ পরিবেশ স্থায়ীভাবে ছাড়ব এ কল্পনা ভাল লাগেনি কখনো। এ ব্যাপারটি

মনের সজ্ঞান পরিকল্পনাজাত নয়। খুব সম্ভব মনের দিক দিয়ে একটি বিরোধহীন পরিবেশ পছন্দ ব'লেই।

স্থায়ীভাবে গ্রাম ছাড়া নয়, স্থায়ীভাবে গ্রামে থাকলে ক্ষতি কি, এই প্রশ্নটিই মনে বড় হয়ে দেখা দিল। সম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবন। এখানে তখন মাসে দশ পনেরো টাকা একটি পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। অধিকাংশ পরিবার পাঁচ ছ টাকায় চলে।

আমার এম. এ, ডিগ্রীর ভবিষ্যৎ মূল্য ডিগ্রী পাবার পরই ভুলে গিয়েছি। গ্রামে ব'সে ডিগ্রীর কথা মনে পড়ার হেতুও নেই কিছু। গ্রামের ঐশ্বর্য দ্রুত লোপ পাচ্ছে, কিন্তু তবু তার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে যে অঙ্গাঙ্গি পরিচয়, তা ভুলতে হবে এ কল্পনা বেদনাদায়ক, কিন্তু ডিগ্রীর কথা ভুলে যেতে কোনো দুঃখই বোধ হ'ল না।

স্থির করলাম গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাব না।

মাটির সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় ক'রে তুললাম। বাড়ির সংলগ্ন জমিতে নানা গাছ লাগাতে লাগলাম। নানা জাতীয় আমের কলম এবং নতুন ধরনের সিংহলী নারকল গাছ কলকাতা থেকে রেল পার্সেলে আনিয়ে নিলাম। কোদাল এবং কুড়ুলের সঙ্গে পরিচয় বাড়ল। মাটি কোপানো এবং বড় বড় গাছ কাটাতেও পটুত্ব বাড়ল।

ইতিমধ্যে আমার মামাশ্বশুরের ভাগ্নে উপেন্দ্রনাথ বাগচী এসে প্রস্তাব করল রতনদিয়া বাজারে ডিসপেনসারি খুললে কেমন হয়। বড় ডাক্তার-খানা ছিল না গ্রামে। বাজারে তখন একমাত্র ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসাক, কুমারখালি থেকে এসেছেন সেখানে। আর গ্রামের মধ্যে ললিতমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। উপেনের ডিসপেনসিং জানা ছিল, চিকিৎসা ব্যাপারেও তার জনপ্রিয়তা ছিল। আর আমার ওষুধ তৈরিতে ছিল তীব্র আকর্ষণ। বাল্যকাল থেকে নানা ওষুধ খেয়ে আসছি, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ আমি পরবর্তীকালে বরাবর নিজেই তৈরি ক'রে নিতাম, অতএব নানাজাতীয় মেজার গ্লাস ও ব্যালান্স সহ আমার ব্যক্তিগত ডিস্‌পেনসারিটি তখন প্রায় পনেরো ষোল বছরের প্রাচীন। বাল্যকাল থেকে এ কাজে আমার স্বোপার্জিত নৈপুণ্য। অতএব প্রস্তাবটি খুবই মনের মতো হ'ল। উপেন নৌকো ক'রে তার বাড়ি থেকে অনেক ওষুধ এবং অনেক আলমারি নিয়ে

এলো। বাজারে একখানা বড় ঘরভাড়া নেওয়া হ'ল, মাসে পাঁচ টাকা। অতিরিক্ত মূলধন লাগল মাত্র ছ শ টাকা, সেটি আমি দিলাম।

বেশ উৎসাহ জাগল। শ্রমের মর্যাদা বা 'ডিগ্‌নিটি অভ লেবার' কথাটিতে তখন মনে পুলক খেলে যেত। তদুপরি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতটি সর্বদা চোখের সামনে। দোকান বেশ জমে উঠল। পাইকেরি খুচরো সব রকম বিক্রি। প্রথম দিকে আমি নিজ হাতে ডিসপেন্সিংএর ভার নিলাম। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার প্রায় সকল ওষুধের মাত্রা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। ওষুধের পার্সেল আসত রেলে। স্টেশন থেকে ডিসপেন্সারি পর্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য হাঁটা পথে দশ মিনিট। একদিন একটি বাক্স আমি নিজে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এলাম খুব গর্বের সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য ছিল পাঁচজনকে দেখানো যে সাধারণ মজুর যা পারে আমিও তা পারি। শ্রমের সম্মান ওরাই একা পাবে কেন। আদর্শবাদের চূড়ান্ত। শ্রমের মর্যাদা !

বলা বাহুল্য এতে নিন্দা রটে গেল। আমি এই নিন্দারই অপেক্ষা করছিলাম। মনের উৎসাহ আরও তীব্র হয়ে উঠল। সব দিকেই সংস্কার বর্জন করেছি যতটা সম্ভব। এটি তার মধ্যেকার একটি। নিন্দা রটল প্রায় সামাজিকভাবে। সমাজের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

পল্লী সমাজ অবশ্য সর্বত্রই এক। কয়েকজন আত্মচিহ্নিত নেতা সর্বত্রই আছেন এবং তাঁদের দাপট কম নয়। এতদিনে এঁরা আর নেই সম্ভবত। রতনদিয়া গ্রাম এ থেকে মুক্ত ছিল বরাবর। গ্রামটি অনেক দিক থেকেই ছিল আধুনিক। কিন্তু পল্লীসমাজ একটিমাত্র গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকে না, আশেপাশের অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে এক একটি সমাজ এবং এ সমাজ ব্রাহ্মণ প্রধান। শ্রাদ্ধ বা বিবাহ কাজে সঙ্গতি থাকলে সমাজসুদ্ধ নিমন্ত্রণ করাই রীতি। এই নিমন্ত্রণ কয়েক রকমের আছে। যথা (১) সমাজসুদ্ধ স্ত্রীপুরুষ মিলিয়ে, (২) সমাজসুদ্ধ কিন্তু শুধু পুরুষদের (৩) শুধু স্বগ্রামের স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে, অথবা (৪) স্বগ্রামের শুধু পুরুষদের। কোনো উপলক্ষে যখন সমাজসুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয় তখন আড়ালে ব'সে সমাজপতি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নিমন্ত্রণকারীর কোনো একটা খুঁত বা'র করার চেষ্টা করেন, অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি তাকে জব্দ করার উদ্দেশ্য থাকে। কখনো বিনা উদ্দেশ্যেই।

খুঁতের অভাব হয় না। তখন সবাই মিলে নিমন্ত্রণকারীর অজ্ঞাতসারে জোট পাকাতে থাকে এবং ভোজনের সময় উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যদি দেখা যায় নিমন্ত্রিতরা কেউ আসছেন না, তখন বোঝা যায় কিছু ঘটেছে।

এমনি হয়েছিল আমার বিবাহ সময়ে। আমার কাকা থাকতেন অন্যত্র, তাঁর বিবাহ হয়েছিল এমন পরিবারে যেখানে বিধবা বিবাহ বা ঐ জাতীয় কোনো গুরুতর কলঙ্ক ছিল। কাকা সপরিবারে এসেছিলেন বিবাহ উপলক্ষে। অতএব মহা সুযোগ!

রতনদিয়ার লোকেদের কারো এ নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু ভিন্ন গ্রামের সমাজপতি জোট পাকাতে লাগলেন। তিনি ভয় দেখিয়ে বহু নিমন্ত্রিতকে আটকে রাখলেন। বেলা গড়িয়ে যায়, এবং তাঁদের আশা প্রায় ছেড়েই দেওয়া হয়েছে, এমন সময় দেখা গেল একে একে আসছেন সবাই। শেষ মুহূর্তের এই উদারতায় কৃতজ্ঞ না হয়ে পারা গেল না। পরে বোঝা গেল এর মূলে 'উদরতা'। ভাল ভাল মিষ্টান্নের আয়োজনের কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই জাতীয় বিরোধিতাকে কখনো ভয় করিনি আমি, এবং পাল্টা এঁদের বিদ্রূপ করায় তখন উৎসাহবোধ করেছি। একটি ঘটনা বলি। মুরগীর মাংস খাওয়া সে যুগে নিন্দনীয় ছিল, বিশেষতঃ প্রকাশ্যে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে রান্নাঘরেই মুরগীর মাংস বরাবর রান্না হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত ছিলাম। মাঝে মাঝে ডাক্তার কার্তিক বসাকের বাড়িতেও সবাই মিলে খাওয়া হ'ত। একদিন কথাটা খুব প্রচার হয়ে পড়ল এবং নদীর ওপারে অবস্থিত সমাজপতির কানেও পৌঁছল। তিনি এই উপলক্ষে আবার বৈঠক বসাতে লাগলেন, খবর এলো। এ কথা শোনামাত্র আমরা তাঁকে একখানা চিঠি লিখলাম। চিঠিখানা ছিল এই রকম :

"মহাশয়, আমরা নিম্নস্বাক্ষরিত ব্রাহ্মণসন্তানগণ গত রাত্রে ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসাকের বাড়িতে অতিশয় তৃপ্তিসহকারে তিনটি পুষ্ট মুরগীর মাংস ভক্ষণ করেছি। রান্না অতি উপাদেয় হয়েছিল।"

এ চিঠির নিচে আমরা প্রায় দশজন সই করেছিলাম। চিঠি যথাস্থানে পৌঁছেছিল, কিন্তু এর পর সব ঠাণ্ডা। সে আজ কতদিনের কথা—

তেত্রিশ বছর হবে। তখন কিঞ্চিৎ দাম্ভিকতা ছিল, মনে কিছু উগ্রতা ছিল, তাই এখন যা অত্যন্ত করুণ মনে হয় তারই বিরুদ্ধে উৎসাহের সঙ্গে লড়াই করেছি। আহত-মস্তক সাপের মতোই তাকে মাটিতে প'ড়ে ধুঁকতে দেখেছি। কি বেদনাময় সে দৃশ্য। অনিবার্যকে রোধ করবার উপায় নেই, অথচ অনিবার্যকে গ্রহণ করবারও ক্ষমতা নেই। নির্বীর্য, কর্মবিমুখ, স্বয়ং যাবতীয় পাপ কাজে লিপ্ত সমাজপতিদের এই দুরবস্থা নিজ চোখে দেখেছি। দূর কালের পটে দেখলে বোঝা যায় আমাদের নিষ্ঠুরতা প্রকাশের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। মৃতপ্রায়কে আঘাত করাটা বাড়াবাড়ি।

কিন্তু আরও একটি বড় জিনিস এতদিন লক্ষ্য করিনি। রতনদিয়া গ্রামে এতদিন আমাদের ছাত্রজীবনে বন্ধুদের মধ্যে যে স্তরের আলাপ-আলোচনা মেলামেশা এবং ক্রিয়াকলাপ চলত, ইতিমধ্যে তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের দলের সবাই প্রায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, বন্ধুরা সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনে দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পরবর্তী ধাপের যারা অবশিষ্ট রইল তারা না পারল লেখাপড়া শিখতে, না পারল মার্জিত হ'তে। তারা রতনদিয়ার আভিজাত্যের ভাঙনের তলায় চাপা প'ড়ে গেল। তাদের সঙ্গে আমাদের ভেদ অতি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। শিক্ষাবর্জিত গ্রাম্য ছেলে তারা। তারা আমাদের বোঝে না, আমরাও তাদের বুঝি না। তারা উগ্র, এবং সম্পূর্ণ শালীনতাবর্জিত।

এইটি হৃদয়ঙ্গম ক'রে ভয় পেয়ে গেলাম। এদের মধ্যে বাস করে কিছু করা বিপজ্জনক। যতই গ্রাম্য হব কল্পনা করি না কেন, সেটি ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত মনের রোমান্টিক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়! নিষ্ঠুর সত্যটি মনের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। সভয়ে আবার পল্লীদিগন্ত রেখার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম।

এর পরেও ছ সাত বছর নানা পরীক্ষার পথে চলেছি। অভিজ্ঞতাও লাভ হচ্ছে বিবিধ। লিখন বৃত্তিই যে শেষ পর্যন্ত অবলম্বন করতে হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পরবর্তী কয়েক বছরের অনেক কিছুই কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে ঘটেছে তা এখন আর মনে করতে পারি না, কেননা এ সবের কোনোটিই জীবনের মোড় ঘোরায়নি।

এর মধ্যে বছরখানেক গভর্মেণ্ট কমার্শ্যাল ইনস্টিট্যুটে পড়েছি। কিছু

একটা করা দরকার। চাকরি যদি করতেই হয় তবে স্টেনোগ্রাফি ভাল এমন উপদেশ দিয়েছিলেন অনেকে। সাধারণভাবেই খুব দ্রুত লেখার অভ্যাস ছিল আমার, কপিং পেন্সিলের সাহায্যে কলেজের অধ্যাপকের বক্তৃতা লিখেছি অনেকদিন। অতএব শর্টহ্যাণ্ডে সফল হব এমন বিশ্বাস ছিল। প্রিন্সিপ্যাল হেমেন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন বাবার সহপাঠী এবং পরিচিত। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে অভ্যর্থনার বদলে তিরস্কার আরম্ভ করলেন। বললেন বয়স পার ক'রে এ লাইনে এলে কেন? সরকারী চাকরির মনোনয়ন তো অনেকটা আমার হাতেই, সাতশ আটশ টাকা পর্যন্ত পাচ্ছে অনেকে। তোমার এখন সে পথ বন্ধ। এখন পাস করলে হয়তো কোনো মার্চাণ্ট অফিসে দুশো টাকার চাকরি করবে, কিন্তু কানে আসবে লাখ লাখ টাকার আলোচনা। ভাল লাগবে না সে কাজ।

দুঃখ হ'ল খুবই। তবু ভর্তি হলাম। স্কুল ছিল বৌবাজার স্ট্রীটে। এক বছর পড়লাম সেখানে। দেবেন্দ্র দত্ত স্টেনোগ্রাফি শেখাতেন পিটম্যান পদ্ধতিতে। প্রথম বৎসর শেষে পরীক্ষা দিলাম মিনিটে ৮০ শব্দ (অফিশিয়ালি)। আসলে ১০০ শব্দ ডিকটেট করা হয়েছিল, দেবেনবাবু নিজেই বলেছিলেন। টাইপরাইটারে ব'সে এর প্রত্যেকটি শব্দই নির্ভুল-ভাবে ট্রান্সক্রাইব করেছিলাম। ইংরেজী বা বাংলা বানান সম্পর্কে নিষ্ঠা ছিল একটু বেশি মাত্রায়. এবং আমাদের যুগের অনেকেরই এটি ছিল বিশেষত্ব। তাই পরীক্ষা ভালই হ'ল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অধিকাংশই ছিল ম্যাট্রিকুলেট।

শর্টহ্যাণ্ড পড়ার সময় এই শব্দানুগ চিহ্নের সংক্ষিপ্ত লিখন পদ্ধতিটি খুব ভাল লেগেছিল। তখন মনে হ'ত এটি আগে শেখা থাকলে সকল অধ্যাপকের বক্তৃতা আগাগোড়া লিখে নেওয়ার কত সুবিধে হ'ত। তখন অধ্যাপকদের বক্তৃতা লিখে রাখবার মতোই ছিল।

পরীক্ষা দেবার পর আর ঐ স্কুলের সীমানায় যাইনি, হঠাৎ শর্টহ্যাণ্ডের প্রতি এবং স্টেনোগ্রাফির চাকরির প্রতি মনে বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। অনেক দিন পরে এক সহপাঠীর মুখে শুনেছিলাম পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়েছিলাম এবং আমার জন্য কিছু প্রাইজও ছিল। কিন্তু ঐ স্কুলের সীমানায় পুনরায় যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

এই কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। পরিচয় আগেই ছিল, কিন্তু এবারে গলায় গলায় ভাব হ'ল। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল আইন অমান্য ক'রে চলার দিক দিয়ে আমাদের দুজনের চরিত্রে অনেকখানি মিল ছিল। দুজনেই অনিয়মিত এবং এলোমেলো। বলাই এ বিষয়ে আমার চেয়ে কয়েক ডিগ্রী বেশি। এ সময়ে কয়েক মাস বা কয়েক বছর একই সঙ্গে কাটিয়েছি। একবার এক ঘরেও। বলাইয়ের নাওয়াখাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, নিয়মও নেই, হয় তো দশ পনেরো দিন পর একদিন স্নান হ'ল। চুলে চিরুনির স্পর্শ নেই, জুতোয় কালি নেই।

একবার পটুয়াটোলা লেনের এক মেসে ছিলাম। কেন ছিলাম তা এখন মনে পড়ে না। সেখানে আমার পূর্বেকার সহপাঠী বন্ধু শিবচরণ মৈত্র থাকত। বলাইএর ভাই ভোলানাথ এখানে কিছুদিন ছিল মনে হয়। সেই সূত্রে বলাই এখানে আসত। শিবের জ্বর হয় একবার, জ্বরের পরে অন্নপথ্য দরকার। বলাই সম্ভবত শিবকে ওষুধ দিয়েছিল, অতএব বলাইয়ের খেয়াল হ'ল মেসের ভাত তো ভাল নয়, ভাল ভাত কারো বাড়ি থেকে ভিক্ষে ক'রে আনা যায় না? বলাই তৎক্ষণাৎ মেস থেকে একখানা থালা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ভাত ভিক্ষার উদ্দেশ্যে।

বলাইয়ের কণ্ঠস্বর, চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল দুর্বার। সব সময়েই তা ধারালো, তা সব বাধা কেটে এগিয়ে চলে এবং তা চমকপ্রদ রূপে চিত্তহারী। পনেরো মিনিটের মধ্যে বলাই প্রকাণ্ড একখানা থালায় শুধু ভাত নয়, অনেকগুলো বাটিতে সাজানো ঝোল ডাল ইত্যাদি নিয়ে এসে হাজির। সেই থালাখানার নিচে মেসের থালাখানা লজ্জায় মাথা ঢেকে আছে।

বলাই এক অপরিচিতের বাড়িতে ঢুকে সোজা গিয়ে বলল, "এক বন্ধু আজ অন্নপথ্য করবে, মেসের ভাত অখাদ্য, তাই ভাল ভাত ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি, সম্ভব হলে এই থালায় কিছু ভাল ভাত বেড়ে দিন।" একেবারে সোজা কথায় সোজা প্রস্তাব, প্রস্তাবে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো দীনতা নেই। যাঁদের কাছে ভাত চাওয়া হ'ল, সম্ভবত তাঁরা এই রকম চাওয়ার সরলতা এবং এর মধ্যকার নতুনত্ব দেখে এমন মুগ্ধ হলেন যে তাঁদের

নিজেদের বড় বড় থালা বাটিতে সব সাজিয়ে বলাইয়ের হাতে তুলে দিলেন, ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

বলাই ছিল এমনি খেয়ালি ও ওরিজিন্যাল। কলকাতার মতো রুদ্ধদ্বার বাড়িতে প্রবেশ ও ভাত ভিক্ষে পাওয়া যায় কিনা তার পরীক্ষা-বাসনা, একমাত্র বলাইয়ের পক্ষেই সম্ভব। এবং শুধু এটি নয়, আরও অনেক ঘটনা যার প্রত্যেকটি চমকপ্রদ, এবং একটা আর একটা থেকে স্বতন্ত্র।

ডাক্তারি ছাত্রদের কাছে কডলিভার তেল তখন অন্তত খুব প্রিয় ছিল। বলাইকে এই তেল কিছুকাল খেতে হয়েছিল নিউমোনিয়ার আক্রমণ থেকে উঠে। বোতল ধ'রে মুখে ঢালত যতটা সম্ভব। সে সময় আমরা মির্জাপুর স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলের ত্রিকোণাকার বাড়িতে থাকি। ওটির নাম ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিং। এইখানে আরও ডাক্তারি ছাত্র থাকত, তার মধ্যে অমিয়কুমার সেন আমাদের অন্তরঙ্গ ছিল। এই অমিয় সেনকেও বলাইয়ের মতোই মাঝে মাঝে বোতল ধ'রে কডলিভার তেল মুখে ঢালতে দেখেছি। শেষে আমিও ঐ রকম অভ্যাস করেছিলাম। কডলিভার তেলের বোতল দেখলেই এরা লোভ সামলাতে পারত না। তেল-খোর বলা চলে এদের।

এই সময় অমিয় সেনের বিয়ে। ডাক্তারি ছাত্র, অতএব বলাইয়ের খেয়াল হ'ল বিয়েতে সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হবে এক বোতল কডলিভার তেল। কারণ এতে ফাঁকি নেই, সম্পূর্ণ সারবান এবং মৌলিকতায় আর সব উপহারকে হার মানাবে। তখন আমাদের কারো কাছেই উদ্বৃত্ত পয়সা বিশেষ কিছু থাকত না, খরচ সম্পর্কে আমরা সর্বদা বেহিসেবী। বলাই ঠিক করল উপহারের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যালের কডলিভার তেল কিনবে এক বোতল, দাম কম, সম্ভবত দেড় টাকার নিচে। সেটি খাটি নরোয়েজিয়ান তেল, এখানে বোতলে পোরা। ডি জংস্ কডলিভারও খুব চলত তখন। সেটি বিদেশী।

কেনার সময় আমি সঙ্গে ছিলাম। আমাদের বোর্ডিং হাউসের নিচে বি. বোসের দোকান। বলাই বেঙ্গল কেমিক্যালের তেল চাইল এক বোতল। সেখানে বাইরের এক ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন, তিনি হঠাৎ ব'লে বসলেন, "কিনছেন যদি, তা হ'লে আর দেশী কিনছেন কেন?" এ

রকম ধারণা তখন অনেকেরই ছিল বিদেশীর নামের উপর অতি-বিশ্বাস। কিন্তু বলাই একথা শুনে মুহূর্তে সেই ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তখন তার মস্তিষ্কের-তর্ক এবং কৌতুক-কেন্দ্র যুগপৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে সামনের বেঞ্চের উপর একখানা পা তুলে সামনে একটু ঝুঁকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে নিজেকে দেখিয়ে বলতে লাগল, "আমার এই স্বাস্থ্য দেখছেন? ওজন বারো স্টোন। কিন্তু আগে আমি ছিলাম কঙ্কাল। শুধু বেঙ্গল কেমিক্যালের কডলিভার অয়েল খেয়ে এই স্বাস্থ্য হয়েছে আমার। অতএব আপনি যত ইচ্ছে চেঁচান, চেঁচিয়ে গলা দিয়ে রক্ত বা'র করুন, তবু আপনার কথা আমি মানতে রাজি নই।"

ভদ্রলোক মাথা নিচু ক'রে বোকার মতো ব'সে রইলেন।

সমস্তই খেয়ালের মাথায়, কোনোটিই পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। যেমন একদিন অমিয় সেনের বিয়ের পর। মজা সৃষ্টির হঠাৎ একটি সুযোগ পাওয়া গেল। আমরা দুজনে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আবিষ্কার করি সদ্য-বিবাহিত অমিয়কুমার তার স্ত্রীর কাছে একখানা চিঠি আরম্ভ ক'রে শেষ হবার আগেই কলেজে চলে গেছে। চিঠিখানা বলাই তার চিঠির প্যাড খুলে আবিষ্কার করল। আমি তখন সেই চিঠি নিয়ে বাকীটুকু লিখলাম। অমিয়কুমারের লেখা যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে এই ভাবে লিখলাম—

"সে যা হোক, আমি তোমাদের বাড়িতে যেতে চাই কিন্তু হেঁটে যেতে বড় লজ্জা হয়। তোমরা যদি ওখান থেকে যেতে বল তা হলেই যেতে পারি। লিখবে তো?—ইতি"

তারপর এ চিঠি খামে বন্ধ ক'রে তার উপর অমিয়র স্ত্রীর নাম ও ঠিকানা লেখা হ'ল। ওখান থেকে হাঁটা পথে তিন মিনিটেরও কম পথ। মির্জাপুর স্ট্রীটের উপর।

আমি অন্যের হাতের লেখা সুন্দর নকল করতে পারতাম, যার লেখা সেও ধরতে পারত না অনেক সময়। যাইহোক, এ চিঠি পৌঁছে দেবার ভার নিল বলাই। সে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, ফতুয়া গায়ে, খালি পায়ে এবং চুলগুলো আরও অবিন্যস্ত ক'রে, অমিয়র শ্বশুরবাড়ি চলে গেল এবং কড়া নেড়ে গ্রাম্য উচ্চারণে গিয়ে বলল, "অমিয় দাদাবাবু নতুন দিদিমণিকে এই চিঠিখানা পাঠিয়েছেন।"

ঘটনাটা ঘটেছিল বেলা প্রায় একটায়। তার পর আমরা বিকেলে বেরিয়ে যাই এবং এ চিঠির পরিণাম কি ঘটল তা জানবার জন্য সন্ধ্যার পরেই ফিরে আসি। এসে দেখি অমিয় গুম হয়ে ঘরে ব'সে আছে, আমাদের দেখামাত্র একখানা চিঠি আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নাও তোমাদের চিঠির উত্তর।

অমিয়কুমার মিষ্টস্বভাবের মানুষ, কারো উপর চটতে দেখিনি কখনো, আমাদের উপরও চটেছিল কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছিল। নতুন জামাই চিঠি দিয়েছে, অতএব তাতে শ্বশুর বাড়ির সবারই অধিকার—চিঠির কথা সঙ্গে সঙ্গে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার শ্বশুর বাড়ির সবাই একে একে অমিয়কে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। অমিয়র শ্বশুরও এসে গেছেন একবার।

এটি নিষ্ঠুর কৌতুক সন্দেহ নেই। বলাই যে কি পরিমাণ খেয়ালি তার আরও দৃষ্টান্ত আছে। একদিন অমিয়র অনুপস্থিতিতে তার টেবিলের ল্যাম্প থেকে চিমনিটা খুলে নিয়ে টেবিলের উপর ভেঙে রাখল। আমিও কিছু সহযোগিতা করলাম এ কাজে। আঙুলের সঙ্গে রুমাল জড়িয়ে ধুলো আর জলে মিশিয়ে ঝকঝকে বিছানার চাদরটির উপরে বিড়ালের পদচিহ্ন এঁকে দিলাম কয়েকটি। কাজটি খুব নিখুঁত হয়েছিল, অমিয় ফিরে এসে কোনো অদৃশ্য বিড়ালের উদ্দেশে অভিসম্পাত বর্ষণ করতে লাগল।

একদিন অপরাহ্ণে হঠাৎ খেয়াল হ'ল কলকাতার বাইয়ে কোথাও ঘুরে আসা যাক। বলাই আমি ও শিব মৈত্র অবিলম্বে চলে গেলাম শিয়ালদহ স্টেশনে। সবার সব পয়সা একত্র ক'রে বলাইয়ের হাতে দিলাম। বলাই সে পয়সা বুকিং ক্লার্কের সম্মুখে ঠেলে দিয়ে বলল, "দাদা, তিন খানা রিটার্ন টিকিট দিন।"

"কোথাকার?"

"তিতোবিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি দাদা, যে কোনো স্টেশনের দিন, আটকাবে না কিছু।"

বুকিং ক্লার্ক খুব কৌতুক অনুভব করলেন এ কথায়, এবং পয়সা হিসেব ক'রে তিনখানা কাঁচরাপাড়ার রিটার্ন টিকিট দিলেন।

ট্রেনের মধ্যে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনিও কাঁচরাপাড়া

যাবেন। বলাই তাঁর সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে নিল, এবং তাঁকে দাদা বলতে আরম্ভ করল। বলাই ক্রমে প্রস্তাব করল তাঁর বাড়িতে গিয়ে বৌদির হাতের রান্না খেয়ে তবে অন্য কথা। ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়লেন। তিনি যতই প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করেন, বলাই ততই তাঁর সম্পর্কে এবং বৌদির সম্পর্কে আলাপ করতে থাকে। অবশেষে কাঁচরাপাড়া পৌঁছনোর পরও যখন আমরা তাঁর সঙ্গে চলতে শুরু করলাম তখন তিনি যত রকম ভাবে সম্ভব আমাদের নিরুৎসাহ করতে লাগলেন। বললেন, "রাত্রি বেশি হ'লে ফেরবার আর গাড়ি পাবেন না, আপনাদের ভীষণ কষ্ট হবে, আপনারা সত্যিই আসবেন না, আমার বাড়ি এখান থেকে চার মাইল"—ইত্যাদি।

আমরা শুধুই একটু মজা করবার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে মাইল খানেক গিয়েছিলাম।

ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ বলাই, আমি, ও বলাইয়ের দূর সম্পর্কীয় এক ভাই (সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়) একটি ঘরে বাস করতাম। সে ঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বর পড়ত মেডিক্যাল স্কুলে। পড়াশোনায় তার খুব নিষ্ঠা ছিল। বলাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল তার অপরিসীম। তার পড়ার সুবিধা হবে এই উদ্দেশ্যে বলাই মেডিক্যাল কলেজ থেকে মানুষের মগজ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি কি'ভাবে সংগ্রহ করে এনেছিল জানি না। সেগুলো পৃথক পৃথক মাটির হাঁড়িতে ফর্মালিনে ডোবানো থাকত। হাঁড়িগুলো থাকত তক্তাপোষের নিচে। তিন খানা তক্তাপোষের মাঝখানে বড় একটা সতরঞ্চি পাতা ছিল—সেইখানে ব'সে মগজ বা ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড কাটা হ'ত এবং সিদ্ধেশ্বরকে এ সবের অ্যানাটমি বোঝানো হ'ত। সেই সতরঞ্চির উপর একটি কুকার ছিল, তাতে প্রায়ই মাংস রান্না হ'ত। একদিকে মানুষের ফুসফুস কাটা হচ্ছে, অন্যদিকে পাঁটার মাংস রান্না হচ্ছে। সতরঞ্চির উপর মাসখানেকের ধুলো জমে আছে, কখনো তারই উপর শুয়ে পড়ছে বলাই। মানুষের সেই সব দেহাঙ্গ হাঁড়িতে ফর্মালিনে ডোবানো থাকত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অংশ ডুবত না, তার ফলে সেইসব অংশ কিছুদিনের মধ্যেই প'চে উঠে ঘর দুর্গন্ধে ভরে তুলত, কিন্তু সবাই নির্বিকার। তার মধ্যেই খাওয়া শোয়া সবই স্বাভাবিক ভাবে চলছে।

আমারও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল কয়েক দিন ধ'রে একটি ফুসফুস কাটা হচ্ছিল। ফুসফুসের ভিতরটা এই প্রথম দেখার সুযোগ পেলাম। ফুসফুসের খণ্ডিত অংশের গায়ে ছোট বড় নানারকম আকারের কয়লার মতো কালো এক একটা অংশ, কেউ যেন সে সব জায়গায় কালির ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। শুনলাম অত্যধিক ধূমপানে বা ধোঁয়া নাকে টানার ফলে ফুসফুসে ঐ রকম এক একটা এলাকা কালো হয়ে যায়।

কাটাকাটির কাজ শেষ হবার পর আসল বিপদ। বলাই একদিন রাত দুটোয় উঠে কাটা ফুসফুস খবরের কাগজে জড়িয়ে গোপনে পথের রেফিউজ বিনের মধ্যে ফেলে এলো। বলল যদি পুলিসে ধরে, তা হলে বিপদ। বলবে, নরহত্যা করেছে। প্রমাণ করতে হবে, করিনি। ততদিনে শাস্তির চূড়ান্ত।

থিয়েটার দেখা অনেকদিন থেকেই একটি বড় নেশা ছিল। বলাইও নিয়মিত দেখত। কিন্তু আমাদের হাতে উদ্বৃত্ত পয়সা কোনো সময়েই বেশি থাকত ব'লে মনে পড়ে না। মাসের শেষ দিকে কোনো বন্ধু এলে তাকে শোষণ ক'রে একেবারে গজভুক্ত কপিত্থবৎ ক'রে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। সাহেবগঞ্জ থেকে প্রবোধ এলে তার উপরেই আক্রমণটা বেশি হ'ত। প্রবোধ ছিল অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, সে আমাদের জন্য খরচ ক'রে তৃপ্ত হ'ত, এটি জানা ছিল ব'লেই আমাদের কোনো সঙ্কোচ হ'ত না। তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম থিয়েটারে অথবা সিনেমায়। একটি পয়সা হাতে থাকতে তাকে ছাড়া হ'ত না। সে যখন সাহেবগঞ্জে ফিরে যেত, তখনকার অবস্থা বলাইয়ের ভাষায়ঃ "প্রবোধদার পকেট আমরা একেবারে খালি করে ফেলতাম, শেষে তাঁর যাবার সময় অন্য কোনো বন্ধুর কাছ থেকে পয়সা ধার ক'রে দিতাম, সে ধার প্রবোধদাই শোধ করতেন, বলা বাহুল্য। প্রবোধদার যাবার সময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা পোষাক! দাড়ি কামানোর পয়সাও থাকত না।" একটু অতিরঞ্জিত, তবু বলাই এ গল্প তখন অনেককে শুনিয়েছে।

প্রবোধ ছিল অত্যন্ত কোমল-হৃদয় এবং সেন্টিমেণ্টাল। কোনো বিয়োগান্ত নাটক তার সঙ্গে দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল। মনোমোহন থিয়েটারে 'প্রফুল্ল' অভিনয়ে প্রবোধ বলাই ও আমি গিয়েছিলাম। প্রবোধ

কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন কাঁদতে আরম্ভ করল যে তা ঠেকানো দুঃসাধ্য ঃ সে উঠে যাবেই। কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ে, এবং বওনা হয়, আমরা দুদিক থেকে তার হাত ধ'রে জোর ক'রে বসিয়ে দিই। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! একটু পরেই আবার মর্মান্তিক দুঃখের দৃশ্য আরম্ভ হয় আবার প্রবোধের সেখানে ব'সে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। জোর ক'রে চলে যেতে চায়। বলে, পয়সাও খরচ করব এবং এত দুঃখ সহ্য করব, এ আমি পারব না! আবার তাকে ঠাণ্ডা করি, আবার সে কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়ে।

দানীবাবুর পরে প্রবোধকে কাঁদাতে লাগলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি, তাঁর সীতা নাটকে। কিন্তু ততদিনে প্রবোধ থিয়েটারে ব'সে কান্নার মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করতে শিখেছে, কাঁদতে কাঁদতে উঠে যাবার চেষ্টা করেনি।

থিয়েটারে দুঃখের দৃশ্য দেখে কাঁদি কেন এবং পয়সা খরচ ক'রে কাঁদি কেন, এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটি আজও মেলেনি। আরিস্টটল থেকে অদ্যাবধি এ চেষ্টা হয়ে আসছে, অনেক উত্তরই ভাল লাগে কিন্তু সম্পূর্ণ মনে হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে ট্র্যাজিডি দেখতে আমরা পছন্দ করি——তা-সে *Katharsis* হোক বা না হোক, অথবা যে অর্থেই হোক। কিন্তু প্রবোধ যখন বলেছিল, "পয়সাও খরচ করব এবং কাঁদবও, এ আমি পারব না"—তখন অন্তত সে মুহূর্তের জন্য আরিস্টটল একটু দূরে স'রে ছিলেন, এ দৃশ্যটি দেখতে পাননি।

বলাইয়ের খেয়ালের মৌলিকতা বলাইকে একটি অদ্ভুত চরিত্রে পরিণত করেছিল। আরও দুজন খেয়ালি ব্যক্তির সংশ্রবে এসে বলাইয়ের চরিত্র আরও খুলেছিল। সে দুজন—ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শিবদাস বসুমল্লিক। প্রথম জন বলাইয়ের শিক্ষক, দ্বিতীয় জন তার সহপাঠি। খেয়াল বিষয়ে এ দুজনকেই বলাইয়ের বড়দা বলা চলে। এঁদের কথা পরে বলব। ইতিমধ্যে আর একটি ছোট্ট ঘটনা বলি।

একদিন বলাইয়ের হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে কোনো একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সে পথে এসে দাঁড়াল এবং কিছু-ক্ষণের মধ্যেই একটি পছন্দ মতো যুবককে ডেকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলল। দুজনের মধ্যে চিঠিপত্র লেখা চলেছিল কিছুকাল।

তৃতীয় পর্ব

দ্বিতীয় চিত্র

বলাইচাঁদ এ সময়ে (১৯২৫-২৬) 'বনফুল' নামে মোটামুটি পাঠকমহলে পরিচিত হয়ে গেছে। কিন্তু তবু লেখাটা তখন তার নিতান্তই একটা শখের ব্যাপার ছিল, যেমন তখনকার দিনের অধিকাংশ লেখকের ছিল। লেখা যে জীবিকারূপে গ্রহণ করা যায় তা সাধারণ শৌখিন কোনো লেখকেরই তখন মনে আসেনি। পরবর্তী যুগে বনফুল বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছে তার গল্প এবং উপন্যাসে—সবই প্রায় তার নিজে দেখা চরিত্র। দেখার চোখ তার এমনই সজাগ যে খুঁটিনাটি কোনো কিছুই সে-চোখে এড়ায় না, এটি বনফুলের লেখার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তবু এর আরম্ভে বলাই নিজেই যে একটি উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র হয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে খেয়াল তার ছিল না। খেয়াল না থাকার কারণ বলাই আত্মসচেতন ছিল না। তার নিজের সম্পর্কে কে কি ভাববে বা বলবে তা সে তার অসাধারণ ঔদাসীন্যে অগ্রাহ্য ক'রে চলার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত আমার চোখের সামনে মেলে ধ'রেছিল। একটা দুর্দান্ত প্রাণশক্তি সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে দুঃসাহসিক ব্যঙ্গের সাহায্যে উল্টে দিত। এ বিষয়ে তার মতো দ্বিতীয় আর কাউকে দেখিনি। এ দিক দিয়ে সে তার গুরু ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত শিষ্য ছিল। পোষাক পরিচ্ছদ ছেঁড়া হোক, গ্রাহ্য নেই। মাটিতে ব'সে পড়ত যেখানে সেখানে। চুলে চিরুনি পড়ত না আদৌ। ধুলো পায়ে বিছানায় শুয়ে পড়ত। দাড়ি গজাচ্ছে মুখে, ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা বৈপ্লবিক স্বাতন্ত্র্য।

একবার তার মির্জাপুর স্ট্রীটের মেডিক্যাল মেসে থাকতে এক কন্যার পিতা তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। বলাই সোজা ব'লে দিল, "না আমি এখন বিয়ে করব না।" ভদ্রলোক তবু একবার মেয়ে দেখতে অনুরোধ জানালেন। বলাই তার উত্তরে বলল, "বিয়ে করতে চাইলে কনের নাক ক ইঞ্চি বা চামড়া কেমন তা কখনো দেখব না, দেখি

তো ব্লাড স্পিউটাম ইউরিন রিপোর্ট দেখব। বিয়েতে আমার ন্যূনতম শর্ত থাকবে এই যে প্রথমত সে একটি মেয়ে হবে, দ্বিতীয়ত ম্যাট্রিকুলেশন পাস হবে, এ ভিন্ন চামড়ার রঙে বা নাক মুখের মাপে আমার ইণ্টারেস্ট নেই।"

ভদ্রলোক অতঃপর আর আসেননি।

বলাই চরিত্রের আরও একটা দিকের কথা বলা দরকার। ভাঙার দিকটা বলেছি, গড়ার দিকেও সমান উৎসাহ ছিল। তখনকার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক জটাজুটধারী ব্যক্তিকে তখন ট্রামে বা পথে প্রায় দেখা যেত। জটা আজানুলম্বিত, দাড়ি নাভিস্পর্শী এবং পরনে গৈরিকবাস। চেহারাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। বলাই এক দিন লক্ষ্য করল তার চোখের নিচে, গালের যেটুকু স্থান দেখা যায়, সেখানে কে যেন চড় মেরে আঙুলের চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে, জায়গাটি লাল হয়ে উঠেছে।

বলাই তাঁকে একদিন পথে ধ'রে বলল, "আপনার মুখে যে ভয়ঙ্কর অসুখের চিহ্ন দেখা দিয়েছে—হয় তো কুষ্ঠ হবে, অবিলম্বে চিকিৎসা করা দরকার। চলুন আপনার বাড়িতে সব ব্যবস্থা করছি।"

গেল তাঁর বাড়িতে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবেশ। গুরুগিরি ব্যবসা। বলাইয়ের প্রস্তাব শুনে প্রায় কেঁদে ফেলেন ভদ্রলোক, বলাই বলেছিল জটা দাড়ি সব কেটে ফেলতে। কিন্তু তিনি বলেন তা হ'লে শিষ্যবাড়িতে তাঁর মান থাকবে না, ব্যবসা মাটি হবে। বলাই বলল "ও সব ছাড়ুন, প্রাণে বাঁচতে চান তো জটা কাটুন, দাড়ি গোঁফ কামান।"

অবশেষে তিনি প্রাণভয়ে সব প্রস্তাবেই রাজি হলেন। বলাই এক দিন তাঁর রক্ত নিয়ে গেল পরীক্ষা করতে। ভাসারমান রিঅ্যাকশন পজিটিভ। ইনজেকশন চলল এবং তাঁর অনেকটা উন্নতিও হ'ল। চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করেছিল বলাই। পথের লোক ধ'রে বন্ধুত্ব করার কথা আগে বলেছি। সে বন্ধুর বাড়িতেও বলাই নিজে খরচ ক'রে মাঝে মাঝে চিকিৎসা করেছে।

ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছিলাম। তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। এমন চরিত্র সহজে দেখা যায় না। আজকের দিনের পাঠক তাঁকে চেনেন না, কিন্তু বাংলা ভাষায় তিনি ছিলেন স্যাটায়ারের রাজা। তাঁর নরকের কীট, দশচক্র, প্রভৃতি রচনা আলোড়ন জাগিয়েছিল পাঠক-সমাজে। কার্টুন ছবি আঁকায় তিনি অসাধারণ পটু ছিলেন। তাঁর অনেক

কার্টুন ছবি শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছে, পরে ভারতবর্ষেও দেখেছি। বিচিত্রায় তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা নামক তাঁর সচিত্র হাকর জীবনী যারা পড়েছেন তারা আজও তাঁর কবিতা রচনার ক্ষমতার কথাও মনে রেখেছেন নিশ্চয়। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে বেপরোয়া নামক 'অসাময়িক' পত্র বার ক'রেছিলেন ইং ১৯২১-২২ সালে।

তিনি কারো ব্যবহারের অপরিচ্ছন্নতা সহ্য করতে পারতেন না। এ জন্য অনেকে তাঁকে ভয় করে চলত। বলাইয়ের মুখে তাঁর সম্পর্কে যে দু একটি গল্প শুনেছি, তা থেকে তাঁর চরিত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

একবার এক ভদ্রলোক কোনো রোগীর জন্য বিশেষ একটি ওয়ার্ডে বেড পাওয়া যাবে কিনা জানতে এসেছিলেন বনবিহারীবাবুর কাছে। বনবিহারীবাবু বেশ ভদ্রভাবে তাঁকে বললেন, "এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে এসে খোঁজ ক'রে যাবেন।"

কথাটি স্বভাবতই ভদ্রলোকের মনের মতো হয় নি, অতএব তিনি পুনরায় অন্যত্র চেষ্টা করতে গেলেন। কিন্তু যার কাছে গেলেন তিনিও পুনরায় ভদ্রলোককে বনবিহারীবাবুর কাছেই নিয়ে এলেন। বনবিহারীবাবু চকিতে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, "বসুন।" খুব আদর ক'রে কাছে বসালেন। তার পর তাঁর হাতের কাজ সরে দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নিয়ে আগে যে সব কথা বলেছিলেন সেই সব কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। বললেন, "এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে খোঁজ ক'রে যাবেন।" এক কানে ব'লে, এ কথাই আর এক কানে বললেন, এবং একবার এ কানে আর একবার ও কানে বলতে লাগলেন। তার পর দুচার জন ছাত্রকে ডেকে বললেন, "আমি আর বলতে পারছি না, এবারে এক এক ক'রে তোমরা বলতে থাক, ইনি সহজে বুঝতে পারেন না, কিন্তু একে বোঝাতেই হবে এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে হবে, তোমরা সে ভার নাও।"

ভদ্রলোক প্রথমে হঠাৎ ধারণাই করতে পারেন নি কি ব্যাপার, কারণ ঘটনাটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিত, কিন্তু যখনই বুঝলেন তখনই লজ্জায় অত্যন্ত বিপন্ন বোধ ক'রে দ্রুত পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একদিন বনবিহারীবাবু আউট-

ডোরের রোগী দেখছিলেন, এমন সময় উপস্থিত রোগীদের ভীড় ঠেলে এক ভদ্রলোক কোনো এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের পরিচয় পত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন বনবিহারীবাবুর কাছে, এবং সেই চিঠিখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন "আমাকে একটু আগে দেখে দিন দয়া ক'রে।"

বনবিহারীবাবু চিঠিখানা দেখেই ছাত্রদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "ইনি ডাক্তার '—'এর চিঠি এনেছেন, তোমরা সবাই মিলে এঁকে নিয়ে নাচো, আমিও কাজ শেষ ক'রেই আসছি।"

আগে-আসা রোগীদের ঠেলে কারো চিঠির জোরে সুবিধে আদায় করতে আসা বনবিহারীবাবু সহ্য করতে পারেন নি। আর একটি ঘটনায় তাঁর ব্যঙ্গের আর একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যাবে। সে দিন আমি সঙ্গে ছিলাম। বলাই ও আমি অনেকবার তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি গাড়িতে বেরোলে বনবিহারীবাবু মানিকতলা স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামিয়ে একটা হোটেল থেকে ফাউল কাটলেট আনিয়ে নিতেন, আমরা সবাই তার অংশ গ্রহণ করতাম। সে দিন আমরা তিনজনেই নেমে কাছের একটি সাময়িক পত্রের স্টলে দাঁড়িয়ে নতুন কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। এমন সময় বলাই একখানা ইংরেজী পত্রিকার একখানা পাতা খুলে বনবিহারীবাবুকে দেখিয়ে বলল, "এই দেখুন এঁরা লিখেছেন, যে-থিয়েটারে বারবনিতারা অভিনয় করে, সে থিয়েটার কারো দেখা উচিত নয়।" বনবিহারীবাবু তৎক্ষণাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন এবং বললেন "সত্যি কথা লিখেছে। থিয়েটারে অভিনয় করতে হ'লে অধিকাংশ সময় ওদের চিন্তা করতে হবে কি ক'রে ভাল আর্টিস্ট হওয়া যায়, কি ক'রে অভিনয়ে নাম করা যায়। নিজ নিজ ভূমিকা মুখস্থ করতে এবং রিহার্সাল দিতে দিনরাতের অনেকখানি অংশ ওদের বৃথা নষ্ট হয়ে যাবে—সমাজের এত বড় ক্ষতি সহ্য করা উচিত নয়, কারণ যারা বারবনিতা তাদের ধর্ম হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা সেক্স আলোচনা করা। থিয়েটার করতে গেলে সেই ধর্ম থেকে ওরা যে ভ্রষ্ট হবে, অতএব ওদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

আর একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র—শিবদাস বসুমল্লিক। তার চরিত্রও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি এ রকম একটি চরিত্র কল্পনাই করতে পারিনি। তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। দারিদ্র্যের সঙ্গে এমন হাসিমুখে লড়াই করতে আর আমি দ্বিতীয় কোনো ছাত্রকে দেখিনি।

শিবদাস সামান্য স্থূলকায় ছিল। মুখখানা গোলগাল, শার্টের উপর বুক-খোলা কোট, ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, মুখে একটু বিষণ্ণতার ছাপ, হাসলে সে হাসি শিশুর মতো সরল এবং সুন্দর। হয় তো বা একটুখানি বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ তাতে ছিল ব'লেই তা এমন সুন্দর। এমনি বিব্রত একটি চরিত্র অথচ মধুর ব্যঙ্গপ্রিয় এবং দুষ্টুমি বুদ্ধিতে ভরা। প্রায় সব সময় সে সাইকেলে চড়ে বেড়াত। সে কারো কাছে সামান্য উপকার পেলে তার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করত। উপকারের সম্ভাবনাতেও পায়ের ধুলো মাথায় মাখা তার ছিল রীতি। এ বিষয়ে বয়স জাতি বা শ্রেণীভেদ তার কাছে ছিল না। ঝাড়ুদারের পায়ের ধুলো নিয়েছে সে অবলীলাক্রমে। কেউ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে, কেউ চমকে উঠেছে, কেউ সন্দেহ করেছে, কিন্তু প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে শিবদাস যখন সরল হাসিটি হেসে বলত, "আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, আপনার পায়ের ধুলো আমাকে নিতেই হবে, জ্যেষ্ঠ কি না বলুন"—তখনই সন্দেহকারীর সকল সন্দেহ দূর হয়ে যেত, তখন সে পুনরায় তার পায়ের ধুলো নিত।

একদিন বিয়ের প্রীতিউপহার ছেপে নিয়ে আসা হচ্ছিল চিৎপুর থেকে। বটতলায় কয়েকটি প্রেস আছে যেখানে অতি অল্প সময়ে ছোটখাটো জিনিস ছাপিয়ে আনা যেত। রবিবারেও কাজ হ'ত সেখানে। এই রকম একটি জরুরি অবস্থায় সেখানে যাওয়া হয়েছিল। আমরা তিনজন গিয়েছিলাম সেখানে। শিবদাস তার বাহনটিকে হাতে ঠেলে চলছিল। দু শ' উপহারের প্যাকেটটা আমাদের কারো হাতে ছিল। এমন সময় বীডন স্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটারের কাছাকাছি বিপরীত দিকের একটি বাড়ির সঙ্গে সাইকেলটি হেলান দিয়ে রেখে ভিতরের এক হারমোনিয়াম মেরামতের দোকানে ঢুকে গিয়ে বলল, "দাদা, একখণ্ড দড়ি দেবেন? বড় বিপদে পড়েছি।" দোকানী একখণ্ড দড়ি তার হাতে তুলে দিল। শিবদাস তৎক্ষণাৎ তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে দোকানী লাফিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে—মুখে ধ্বনিত হচ্ছে "একি কাণ্ড, একি করেন মশায়।" শিবদাস গম্ভীরভাবে বলল, "আপনি যে উপকার করলেন তা কজন করে বলুন? তা ভিন্ন আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, পূজনীয়, আবার আপনার ধূলো দিন।"—শিবদাস গম্ভীরভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে উপহারের প্যাকেটটি সেই দড়ির সাহায্যে তার সাইকেলের কেরিয়ারের সঙ্গে বেঁধে নিল।

শিবদাস কোষ্ঠীবিচার শিখেছিল। প্রথম পরীক্ষার সময় সে আপন কোষ্ঠী বিচার ক'রে বুঝতে পারে সে সময় সকল গ্রহই তার প্রতিকূলে অতএব পাস করা তার হবে না। এমনি অবস্থায় গুজব শুনতে পেল সে সব বিষয়ে পাস করেছে। শুনে মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। তবে কি তার বিচারে ভুল হ'ল? সে একে একে প্রত্যেক পরীক্ষকের কাছে যেতে লাগল সত্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে। যেখানে যায় শোনে পাস করেছে। শুধু একজন পরীক্ষক মার্ক বললেন না, এবং শুধু তাই নয় তিনি অত্যন্ত কড়া লোক ছিলেন—আইন না মেনে মার্ক জানতে আসাতে তিনি শিবদাসকে তার বিষয়ে ফেল করিয়ে দিলেন।

শিবদাস ফেল করেছে জানতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল—কারণ গণনা মিলে গেছে।

সেটি সম্ভবত ১৯২৫ সাল। শিবদাসের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বিয়ের কিছুদিন পরেই কোন একটি ঘটনা নিয়ে তার শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে তার কিছু মনান্তর ঘটে, এবং এই ব্যাপার নিয়ে কিছু চিঠি লেখালেখি চলে। একদিন শিবদাস আমাদের কাছে প্রস্তাব করল সে সবগুলো চিঠি পড়ে শোনাবে। সে যত চিঠি লিখেছিল তার নকল রেখেছিল।

তাই ঠিক হ'ল। অনেক চিঠি, কোথায় পড়া যায়? বলাই বলল, রাত্রে ময়দানে গিয়ে কোনো আলোর নিচে ব'সে পড়লে বেশ হয়। আমরা সেখানে গেলাম রাত বারোটা আন্দাজ সময়ে। টীকাটিপ্পনিসহ সমস্ত চিঠি পড়া শেষ করতে মোট তিন ঘণ্টা লেগেছিল। সে প্রকাণ্ড এক ফাইল। শিবদাস সব বিষয়ে ছিল নিখুঁত।

রাত তিনটেয় কোথায় যাওয়া যায়? ঠিক হ'ল একটা ফীটন ভাড়া ক'রে সকাল পর্যন্ত পথে ঘুরে বেড়াব। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া। শিশিরে ঘাস ভিজে উঠেছিল। শীত অনুভব হচ্ছিল বেশ। চা খাওয়া দরকার। আমরা তখন স্ট্র্যাণ্ড রোড ধ'রে চলেছি। শিবদাস হাঁকল চালাও হাওড়া স্টেশন। চা খাওয়া দরকার, অতএব হাওড়া স্টেশন।

এই 'অতএব'টা আমাদের ভ্রান্তি।

হাওড়া স্টেশনের স্টল যে রাত্রিকালে বন্ধ হয়ে যায় সে খেয়াল কারোই ছিল না। স্টেশনের গাড়ি-বারান্দায় আমাদের ফীটন গিয়ে দাঁড়াল, আমরা

নেমে ভিতরে গেলাম। সেখানে এক পুলিস কনস্টেবল আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। শিবদাস বলল আমরা চা খেতে এসেছি। কনস্টেবল আমাদের বুঝিয়ে বলল রাত্রে স্টল খোলা থাকে না, চা এখন পাওয়া যাবে না। শিবদাস তৎক্ষণাৎ তার ডান হাতখানা অতর্কিতে ধ'রে হস্তরেখা বিচার করতে লাগল। কি বলেছিল মনে নেই, তবে তার ক'টি সন্তান তার সংখ্যা বলেছিল এবং তা মিলে গিয়েছিল। কনস্টেবল মহা খুশি, সে বলল "দাঁড়ান চায়ের ব্যবস্থা করছি"—ব'লে কোথায় চলে গেল এবং মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলো এক চাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে। তিনটি মাটির ভাঁড়ে তিনজন সেই চা খেলাম, চায়ে দুধের বদলে ক্ষীর! উপাদেয় লেগেছিল।

এই প্রথম দেখলাম শিবদাস উপকারীর পায়ের ধুলো নিল না, খুব ভারিক্কে চালে গাড়িতে এসে উঠল। গাড়িতে উঠতে দ্বিতীয় আর একটি কনস্টেবল এগিয়ে এসে আমাদের খুব খাতির করতে লাগল। শিবদাস দুজনকেই কিছু বখশিস দিতে গেল। কিন্তু তারা বখশিস নিতে অস্বীকার করল। গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে। শিবদাস বলল "ঠিক করেছ না নিয়ে—এইটে দেখতেই এসেছিলাম।" কনস্টেবলেরা তা শুনে আরও একবার সামরিক ভঙ্গিতে সালাম জানাল।

ফিরতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। হাওড়া ব্রিজ তখন ভোর বেলা খুলে দেওয়া হ'ত সপ্তাহে কয়েক দিন। আমরা ব্রিজ পার হওয়ার সময়েই খুলে দেওয়ার সময় হয়েছিল। গাড়ি সব থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঘণ্টা বেজে গেছে। আমাদের কোচম্যান হঠাৎ গাড়ি খুব জোরে ছুটিয়ে দিল, ব্রিজ খুলতে খুলতেই যাতে পার হয়ে যেতে পারে, নইলে অন্তত ঘণ্টা দুই দেরি হবে। পার হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু পার হয়েই ঘোড়া আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। হৈ হৈ ব্যাপার। শিবদাস ভীষণ রেগে গেল কোচম্যানের উপর। আমরা দৈবাৎ বেঁচে গিয়েছিলাম, কারণ ঘোড়া প'ড়ে গেলেও গাড়িটা সোজাই দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোড়াটাকে তুলে দেবার পর গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করল।

সমস্ত রাত বাইরে থাকার ফলে আমি সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং কয়েকদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল সেজন্য।

শিবদাস কলেজে পড়ার খরচ চালাতো নিজে উপার্জন ক'রে। খুব পরিশ্রম করতে হ'ত; সেজন্য পড়ায় যতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার, তা দিতে পারত না। সেজন্য সে প্রথম এম.বি. পরীক্ষাতে মেটেরিয়া

মেডিকায় ফেল করেছিল। সম্ভবত ওষুধের মাত্রা মুখস্থ ছিল না। ছোট্ট একখানি বই তার হাতে দেখেছি, তাতে ওষুধের মাত্রা ছাপা ছিল। সেই বই সে যন্ত্রের মতো মুখস্থ করবে ব'লে উঠে প'ড়ে লাগল। ফেল ক'রে শিবদাস একবারই মাত্র খুশি হয়েছিল, কারণ তাতে ছিল তার কোষ্ঠী-বিচারের নির্ভুলতার প্রশ্ন। এবারের ফেল করার জন্য সে তৈরি ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল তার অত্যন্ত বেশি। সে ওষুধের এ থেকে জেড পর্যন্ত মুখস্থ করবেই, যাতে একটিও ভুল না হয়। অর্থাৎ প্রায় চার শ সাড়ে চার শ ওষুধের মাত্রা মুখস্থ করতে হবে!

ডোজের বইখানা সে সর্বদা পকেটে নিয়ে ঘুরত। কিন্তু একা একা মুখস্থ করা বড্ড একঘেয়ে লাগে। কোথায়ও ভুল হ'লে নিজে বই খুলে যাচাই করতে হয়। তা ভিন্ন ভুল কি না তা চেক করা নিজে নিজে সম্ভব নয়। অতএব সে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি কৌশল উদ্ভাবন করল। পথে চলতে চলতে শিবদাস হঠাৎ সাইকেল থামিয়ে কোনো পছন্দসই ভদ্রলোকের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েই বলল "দাদা, আমি মেডিক্যাল ছাত্র, পরীক্ষায় ডোজে ফেল ক'রেছি, আপনি এই বইখানা খুলে ধরুন, আমি মুখস্থ বলে যাই, ভুল হ'লে ব'লে দেবেন।" মুখে করুণ সরল হাসি। ভদ্রলোক চিন্তা করবারও অবসর পেলেন না যে তিনি কি করছেন। কিন্তু তাঁর না ক'রে উপায় ছিল না। শিবদাসের বালকোচিত সরল অনুরোধ, অন্যায় কিছু নয়, কিন্তু অভূতপূর্ব। হয় তো ভদ্রলোক কিছু গর্বও বোধ করলেন।

ঘটনাটির মৌলিকতা লক্ষণীয়।

শিবদাসের মুখস্থ বলা আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু পরেই ভদ্রলোক বললেন, "এবারে একটু ভুল হল।"

শিবদাস থমকে দাঁড়াল। তা হলে মুখস্থ ঠিক হয়নি। বইখানা ভদ্রলোকের হাত থেকে খপ ক'রে কেড়ে নিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, "হ'ল না দাদা, আমি একটি চাম লোদকু"—ব'লেই দ্রুত সাইকেল চালিয়ে দিল।

শিবদাসের নিজের গড়া কয়েকটি ধন্যাত্মক শব্দ ছিল। ওর মুখে উচ্চারিত হ'লে তার বেশ একটি অর্থ ফুটে উঠত। 'লদকালদকি' এই রকম একটি শব্দ, মানে ঢলাঢলি, খুব শোনা যেত তার মুখে। "চাম লোদকু" ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থ। কখনো নির্বোধ, কখনো কৃপণ, কখনো ধূর্ত।

একদিন চৌরঙ্গী প্লেসের মোড়ে এক প্রহরী পুলিসের পায়ের ধুলো নিয়ে খুব বিনীত ভাবে এবং সসম্মানে জিজ্ঞাসা করল, "আপকা ইডিয়সি কনজেনিট্যাল হ্যায় কি অ্যাকোইয়ার্ড হ্যায়?" কিছুই বুঝতে না পেরে কনস্টেবল গর্বের সঙ্গে বলল, "কনজেনিট্যাল হ্যায়।" শিবদাস বলল "ও! আপ একদম বরন্ (born) ঈডিয়ট হ্যায়, তাহ'লে ঠিক আছে, আমি এই গলিতে একটি নিষিদ্ধ কাজ করব, আপনি একটু পাহারা দিন," ব'লে সাইকেলটি তার হাতে দিয়ে যথাকর্তব্য করতে গেল। কনস্টেবলটি যে অন্যায় নিবারণের জন্য সেখানে ছিল, সেই অন্যায়টিই শিবদাস করল তাকে পাহারা রেখে! এ শুধু শিবদাসের পক্ষেই সম্ভব। তার লোক বশ করার বিদ্যা ছিল একেবারে অমোঘ।

এই চরিত্রের অনুকরণ হয় না। এ তার ব্যক্তিত্বের নিজস্ব রূপ, আর পাঁচজনকে ছেড়ে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তার চেহারার সঙ্গে, চরিত্রের সঙ্গে এ সব উদ্ভট ব্যবহার এমন মানিয়ে গিয়েছিল যে এ সব বাদ দিয়ে তাকে ভাবাই যেত না। সব চেয়ে বড় কথা শিবদাসের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ প্রাণ-ধর্ম ছিল, তেজও ছিল অসাধারণ। তার হাসিটি সব সময় বেদনামণ্ডিত মনে হ'ত, সে জন্য সে একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক চরিত্র ছিল।

দারিদ্র্য ছিল তার প্রথম ছাত্র জীবনে। কিন্তু তা সে দৃঢ়তার সঙ্গে জয় করেছিল এবং অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিল। তার এম. বি. পাস করার পর তার সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা হয়নি, কারণ আমি কিছুদিন কলকাতায় ছিলাম না। হঠাৎ কয়েক বছর পরে একদিন কর্পোরেশন স্ট্রীট ও গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের মোড়ে দেখা। ছোট গাড়ি একখানা আমার পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

সে দিকে ফিরে চাইতে না চাইতে গাড়ির চালক শিবদাস খপ ক'রে আমার হাতখানা ধ'রে তার অভ্যস্ত সরল হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত ক'রে ক্রমাগত বাংলায় এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যের নাম ক'রে যেতে লাগল এবং বলল, এর মধ্যে তোমার কাছে কি কি বই আছে?

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। ভুল শুনছি না তো? কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই সে তেমনি হেসে বলল, বাংলায় এম. এ. দিচ্ছি।

খবরটি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল শিবদাস চরিত্রের সঙ্গে এর অসঙ্গতি নেই কিছু। একমাত্র তার পক্ষেই এম. বি. পাস করার পর বাংলা এম. এ. পরীক্ষা দিতে উৎসাহী হওয়া সম্ভব। পরে শুনেছিলাম সে এম. এ. পাস করেছিল। আরও পরে আরও একটি খবরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছিলাম—শিবদাস মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। খবরটি যতদূর মনে পড়ে তার ভাইপোর কাছ থেকে শুনেছিলাম।*

১৯২৬ সালে যে বারে বলাই এম. বি. পরীক্ষা দেবে সেই বছরেই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় সেখানে যেতে হ'ল সরকারী নির্দেশে। কারণ বলাই বিহারপ্রবাসী বাঙালী, অর্থাৎ বিহারী, অতএব বাংলায় পড়া চলবে না। সুতরাং সে কলকাতার এম. বি. হল না, বিহারের এম. বি. বি. এস. হ'ল। এই সময় ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএর অন্যান্য ডাক্তারি ছাত্ররাও শেষ পরীক্ষা দিয়ে চলে গেলেন। অতঃপর এলেন একদল ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের পুরাতন সহবাসী ছিলেন শ্রীরামপুরের বিভূতি মুখুজ্যে। তিনি খুব আমুদে প্রকৃতির, হৈ হল্লা ক'রে খুব জমিয়ে রাখতেন। তিনি ডাক্তারদের মরশুম

---

* আশ্বিন, ১৩৬৪ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে স্মৃতিচিত্রণের এই কিস্তিটি প্রকাশিত হ'লে আমি শিবদাসের কন্যার কাছ থেকে এই চিঠিখানা পেয়েছি। প্রয়োজনবোধে সেখানা উদ্ধৃত করছি:

সংহতি-শ্রী
৬৪ বি. হরিশ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-২৫, ৬-১১-৫৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু

স্মৃতিচিত্রণ মাসিক বসুমতীতে পড়ছি, ভাদ্র সংখ্যার পর উন্মুখ হয়ে ছিলাম পরবর্তী সংখ্যার জন্য—আমার নিজস্ব প্রয়োজনেই। কাল পেলাম আশ্বিন সংখ্যা, আর সেই সঙ্গে পেলাম আমার বাবার (শিবদাস বসুমল্লিকের) সম্বন্ধে আপনার লেখা। ভাল লাগলো তো নিশ্চয়ই। খ্যাতি ও কালের ব্যবধানে বন্ধুত্বের বিস্মৃতি আপনার আসেনি, তাই এত সহজে ও আবেগের সঙ্গে তাঁর কথা লিখতে পেরেছেন। অবশ্য বাবার যে ক'জন বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বা হয়েছে তাঁদের সকলের বন্ধুপ্রীতিই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

তথ্যের দিক থেকে আপনার রচনায় একটু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে, তাঁর দরদী বন্ধু হিসেবে আপনাকে জানানো কর্তব্য মনে করেই লিখছি। বাবা মোটর দুর্ঘটনায় মারা যাননি। মোটর

থেকে শুরু ক'রে এঞ্জিনিয়ারদের মরশুম এবং তার পরবর্তী কালেও ছিলেন। আর একটি রহস্যপূর্ণ চরিত্রের লোক ছিলেন এখানে। তিনি জার্মানি ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ঘুরে এসেছিলেন। কেন, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল, কেননা তিনি ইংরেজী বা জার্মান কিছুই ভাল জানতেন না। কিন্তু তাঁর খুব অধ্যবসায় ছিল। মাঝে মাঝে ভোর বেলা উঠে জার্মান বা ইংরেজী অভিধান খুলে নিয়ে চিঠি লিখতে বসতেন। একখানা চিঠি শেষ করতে দুতিন দিন লাগত। ইংরেজ ও জার্মান মেয়েদের চিঠির উত্তর। প্রণয়পত্র সবই। দেখিয়েছিলেন দু এক খানা।

অতুলানন্দ চক্রবর্তী তখন ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএর বাসিন্দা। সে এই ভদ্রলোককে ঠাট্টা ক'রে বলত, প্রণয়পত্রলেখা যে কারো কাছে এমন বিভীষিকার ব্যাপার হ'তে পারে তা তো জানতাম না, আমরা তো জানি ওটি একটি আনন্দের ব্যাপার। এই ভদ্রলোক আমাকে খুব পছন্দ করতেন, কেননা চিঠি লেখায় আমি অনেকবার সাহায্য করেছি। ইংরেজ মেয়ের চিঠিগুলো আমাকে দেখাতেন। তাতে তাঁর প্রণয়িনী লিখেছে, আর কত দিন অপেক্ষা করব, আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, আমি দিন গুনছি।"

দুর্ঘটনা হয়ই নি, তবে গ্যারাজের মেঝেয় যে গর্ত থাকে গাড়ি সারাবার প্রয়োজনে, তাতে প'ড়ে গিয়ে হাড় ভেঙে শয্যাশায়ী ছিলেন কিছুদিন। তখন বিলেত যাবার জন্য পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরী, দুর্ঘটনার বছর কয়েক পর ১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আমরা তাঁকে হারালাম। শুনছি ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে তাঁর হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। মারা যাবার আগে তিনি ডি. পি. এচ্. এবং ল পড়ছিলেন। বাংলায় এম. এ. পাস করেছিলেন তার আগেই। দুর্ঘটনার জন্য বিদেশ যাওয়া স্থগিত ছিল, স্থির করেছিলেন পরীক্ষা দুটো দিয়েই যাত্রা করবেন।...

দারিদ্র্যকে তিনি জয় করেছিলেন সত্যিই, কিন্তু তাঁর সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের সমাপ্ত এলো বড় তাড়াতাড়ি।

তার পরেও কোনও খবর আপনি জানেন কিনা জানি না, আমার মা এসে দাঁড়ালেন বাবা-মা উভয়ের দায়িত্ব নিয়ে। ১৯৩৮ থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনা শুরু ক'রে তিনি ১৯৪৪ সালে ডাক্তারি পাস করেন রেগুলার কোর্সে, কৃতিত্বের সঙ্গে। আজ পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারেনি, বর্তমানে তিনি বাংলা সরকারের অধীনে কাজ করেন।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

গীতা বসুমল্লিক।

ভদ্রলোক যে ঐ মেয়েটিকে ধাপ্পা দিয়েছেন তা বুঝতে দেরি হ'ল না। ইনি, লণ্ডনের এক স্কুলের মেয়ে, নাম নেলি, তার সঙ্গে চিঠিতে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সে মেয়েটি অনেক দিন আমাকে চিঠি লিখেছে পড়াশোনা আর ছবি আঁকার ব্যাপার নিয়ে। তার আঁকা জলরঙা একগুচ্ছ ভায়োলেটের ছবিটি খুব সুন্দর হয়েছিল, সে ছবির প্রশংসা করাতে কি খুশি!

এক দিন এই ভদ্রলোকের গায় র‍্যাশ বেরোল। দারুণ ভয়ের ব্যাপার। তখন ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ ডাক্তার কেউ ছিল না, আমি নিজেই গরজ ক'রে ডেকে আনলাম আর এক বন্ধুকে, তিনি ডাক্তারি ছাত্র। নাম সমরেশ ভট্টাচার্য, নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের বিখ্যাত সার্জ্যন সুরেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র। সমরেশকে বললাম, ভাই একটা ব্যবস্থা কর. সবাই সন্দেহ করছে স্মল পক্স হয়েছে। ভয় পাচ্ছে সবাই। সমরেশ একটুখানি দেখেই আমাকে বাইরে এসে গোপনে বলল, স্মল নয়, বিগ।

সমরেশ পরে এসে তাঁর রক্ত নিয়ে গেল, ভাসারমান রিঅ্যাকশন পজিটিভ। ওষুধের ব্যবস্থা হ'ল, কিন্তু কেন যে রোগী ইনজেকশন ইত্যাদি বিনামূল্যে হওয়া সত্ত্বেও নিতে অস্বীকার করলেন জানি না। তবে জানা গেল ইতিমধ্যে তিনি কোনো এক দৈব ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন। তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। পরে শুনেছি কোনো এক সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে তিনি গঞ্জিকার এবং সন্ন্যাসধর্মের আকর্ষণে অনেক দূর এগিয়েছেন, গায়ে ভস্ম মেখে থাকেন। তারও পরে শুনেছি তিনি আর বেঁচে নেই।

ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ থাকতেই আমি ছোট ছোট নক্সা লিখতে আরম্ভ করি। সে সব ছোটখাটো কাগজে ছাপা হ'ত। বলাইও লিখত। আমাদের দুজনেরই তখন পরিমাণের দিক দিয়ে লেখা খুবই কম হ'ত। এবং তারও একটা বড় অংশ ছিল ফরমায়েসি উপহার লেখা। বলাইয়ের বিয়েতে আমি নানা নামে একখানা বইয়ের আকারে অনেকগুলো উপহার-কবিতা ছাপিয়েছিলাম। নানা ছন্দে লেখা ছিল কবিতাগুলো। ১৯২৬ সালে বিচিত্রায় আমার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় —নাম, আর্টের অর্থ; এ প্রবন্ধের কথা আগে একবার বলা হয়েছে। এরই কাছাকাছি সময়ে কল্লোলের দীনেশরঞ্জন দাশের সঙ্গে পরিচয় হয়। কি

ভাবে হয় তা আর মনে পড়ে না। তিনি ডিয়ার (D. R.) দাশ রূপে খ্যাত ছিলেন। তাঁর অনুরোধে কল্লোলে দুটি ব্যঙ্গ গল্প লিখেছিলাম। কাজি নজরুল ইসলাম 'নওরোজ' নামক একখানা কাগজ প্রকাশ করেন, তিনিও আমার একটি ব্যঙ্গ রচনা ছেপেছিলেন। দীর্ঘ ইউরোপ প্রবাস খ্যাত গিরিজা মুখোপাধ্যায় তখন সেণ্ট পল্‌স-এর ছাত্র, তিনি দেউটি নামক একখানা মাসিকপত্র বার করেছিলেন। সে কাগজে ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলাম, বলাইও লিখেছিল।

একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ব্যঙ্গ গল্প লিখি ১৯২৬ সালে। সেই আমার প্রথম বড় ব্যঙ্গ গল্প। কোনো বন্ধু সেটি প'ড়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান মাসিক বসুমতীতে। বসুমতী (চৈত্র ১৩৩৩) সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছিল। বসুমতী সিলভার জুবিলি সংখ্যায় সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তখনকার সকল ব্যঙ্গ লেখাতেই একটা অপরিপক্বতার ছাপ স্পষ্ট, এবং স্বভাবতই।

লেখা তখনকার দিনে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ 'আনন্দাৎ', উপার্জনেচ্ছায় কদাপি নয়। লেখা ছাপা হ'লেই একটা তৃপ্তি। কল্লোলে লিখলেও, দীনেশরঞ্জন ভিন্ন কল্লোল গোষ্ঠির অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে অনেক পরে, সম্ভবত পাঁচ ছ বছর পরে। দীনেশরঞ্জন দাশ ব্যক্তিটি বড়ই সহৃদয় এবং মনখোলা ছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছি। কিছুদিনের মধ্যেই, এবং প্রীতিবশতই তিনি আমার লেখা পছন্দ করতেন। ফোটোগ্রাফিতে তাঁর আকর্ষণ ছিল, এ বিষয়ে আমি তাঁকে সাহায্য করেছি অনেক পরে।

ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ এই সময়ের মধ্যে আর একজন অধিবাসীর কথা মনে পড়ে। নাম ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি নৃতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হয়েছেন পরে। এঞ্জিনিয়ার দলের মধ্যে কাশীর তারাচরণ গুইনের কথা আগে মনে পড়ে। তিনি তখন বি. ই. পাস ক'রে রেলে চাকরি করতেন, শিয়ালদহের পথে তিনি ছিলেন ডেইলি প্যাসেঞ্জার। তিনি সাহেবী পোষাকে থাকলে কেউ তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে ইতস্তত করত। তাঁর দেহ দীর্ঘ, পেশীবিন্যাস স্যাণ্ডোর মতো। এ দুইয়ের যোগাযোগ বাঙালীর মধ্যে আমি আর দেখিনি। তারাচরণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন এবং নিজে গাইতেন। ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। গুণী গায়কেরা আসতেন।

তারাচরণ গুইন আমাকে স্বাস্থ্য চর্চায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। আমার মতো ক্ষীণদেহেও, চড়তে চড়তে ক্রমে পঁচিশটি ডন এবং পঁচিশটি বৈঠকে উঠেছিলাম। আগে স্কুল-জীবনে স্যাণ্ডোর চেস্ট এক্সপ্যাণ্ডারের সাহায্যে মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছি। তার কোনো সময় স্থির ছিল না, এবং মাত্রাও সাধ্যসীমা ছাড়িয়ে যেত। তবে তারাচরণ গুইনের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে পাকস্থলীর কিছু উপকার হয়েছিল, কারণ এর পর কিছুকাল ধ'রে জারক রস সমূহ যথা পরিমাণ নির্গত হয়েছিল তাদের নিজ নিজ গুপ্ত বাস থেকে। এই তারাচরণ পরে শুনেছিলাম রেওয়া রজ্যের এঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বিশেষ সখ্য হয়েছিল, পরে তাকে হুগলী জেলা এঞ্জিনিয়ার রূপে দেখেছি।

ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএর ম্যানেজার প্রথমে ছিলেন মাখনবাবু, পরে রবি রক্ষিত। ইনি মনিবাবু নামে পরিচিত। সাইকেলে দূর ভ্রমণ ক'রে খ্যাত হয়েছিলেন, সাঁতারে বেশ নাম ছিল। তিনি আমাদের বন্ধু স্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন। মাস ছয়েক আগে (১৯৫৬) আ-কটিবক্ষ-বিস্তারী দাড়িচুল নিয়ে দেখা করেছিলেন, পরিচয় না দেওয়া পর্যন্ত চিনতে পারিনি। রবি রক্ষিতকে ইতিপূর্বে শেষ দেখেছিলাম ১৯৪৩ সালে এ. আর. পি. কর্মীরূপে সাইকেলে ছুটতে। তার পরেই এই প্রায়-সন্ন্যাসী বেশ।

চেনা-অচেনার ব্যাপার নিয়ে আরও দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গেই সেগুলো ব'লে রাখি।

যুদ্ধের মধ্যে ১৯৪৪-৪৫এর কোনো এক সময় গ্রে স্ট্রীটে এক মিলিটারি অফিসারের পাশ কাটিয়ে যেতে তিনি খপ ক'রে আমার হাত ধ'রে হেসে বললেন, 'চিনতে পারেন?" আমি বলি, "না।" তিনি ভীষণ বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কি কথা?—দেখুন ভাল ক'রে ভেবে।"

দু তিন মিনিট কেটে গেল কিছুই মনে পড়ল না। তখন তিনি একটুখানি দমে-যাওয়া সুরে বললেন, "শরৎদার কথা মনে নেই ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএর?"

এবারে আমার বিস্মিত হবার পালা। ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ কিছুকাল আগে আমরা একসঙ্গে অতুলানন্দ রবি রক্ষিত প্রভৃতি মিলে গ্রুপ ফোটো তুলিয়েছি। শরৎ সেন এম. বি. পাস ক'রে আয়ুর্বেদ এবং আইন পড়ছিলেন। তিনি সবারই শরৎ দা ছিলেন, এই মানুষকে চিনতে পারিনি!

পরে ভেবে দেখেছি এর যুক্তিসঙ্গত কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত তাঁর চমৎকার দুপাটি দাঁতের একটিও মুখে ছিল না, তাঁর গৌর কান্তি কৃষ্ণ কান্তিতে পরিণত হয়েছে এবং পোষাক ষোল আনা মিলিটারি। তবু এ ঘটনাটি আমাকে খুব ভাবিয়েছিল এবং এই বিষয় নিয়েই ১৯৬৬ সালে "নতুন পরিচয়" নামক একটি গল্প লিখেছিলাম, সেটি ঐ বছরেই প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল। (পরে গল্পটি "মাবকে লেঙ্গে" বইতে ও "শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প" সংকলনে স্থান পেয়েছে।)

আরও একটি মজার ঘটনা। বছর চারেক হয়ে গেল। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে ট্রামে উঠেছি। পুরনো গদিহীন ট্রাম। উঠেই ভিতরে প্রবেশ ক'রে ডানদিকে চারজনের উপযুক্ত যে একটি তপ্ত আসন তারই বাঁ কোণে বসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রুগুম্ফধারী গৈরিকবসন সন্ন্যাসী উঠে আমার বাঁ পাশে বাইরে অবস্থিত যে আধখানা আসন তাইতে বসলেন। আমাদের দুজনের মাঝখানে ব্যবধান একটি মাত্র জানালা।

ট্রামের কোনো আসনই খালি ছিল না, দু একজন যাত্রী দাঁড়িয়েও ছিলেন। এমন সময় বাঁ ধারের সেই জানালার পাশ থেকে সেই সন্ন্যাসীর মুখ আমার কানের কাছে বলে উঠল, "এই যে পরিমলবাবু!"

আমি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম সেই অচেনা মুখের দিকে।

"আমায় চিনতে পারছেন না?

"না। ঠিক মনে হচ্ছে না তো"—লজ্জিতভাবে বলি। হয় তো তিনিও লজ্জিত হয়েছেন।

তারপর হঠাৎ দুহাতে তাঁর সমস্ত দাড়ি চেপে আড়াল ক'রে মাথাটা যতটা সম্ভব জানালার ভিতর দিয়ে গলিয়ে বললেন, "দেখুন তো এবারে চিনতে পারেন কি না?"

ট্রামের যাত্রীরা আমার দিকে আমার উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রয়েছেন। কিন্তু আমি সেই দাড়ি-চেপে-ধরা মুখও চিনতে না পেরে প্রায় ঘেমে উঠেছি। —সন্ন্যাসীও দাড়ি থেকে হাত সরান না, আমিও তাঁর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

অবশেষে সন্ন্যাসী হতাশ হয়ে দাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললেন "আমি '—' এর দাদা, এবারে চিনতে পারছেন?"

চকিতে মনে প'ড়ে গেব সব। চেনা উচিত ছিল এতক্ষণ, কিন্তু প্রথমেই চিনি না রূপ যে ভ্রান্তি ঘটেছিল তা আর গেল না সহজে। ট্রামসুদ্ধ যাত্রীর কাছে আমি অপরাধী হয়ে রইলাম।

১৯৫৩ সালে আরও একজন পরিচিত পুলিসের লোককে সন্ন্যাসী বেশে দেখলাম যুগান্তর অফিসে। তবে এঁকে চিনতে কষ্ট হয়নি। অনিবার্য পরিবর্তনের পথে চলেছি আমরা। ব্যাপারটা ভুলে থাকি ব'লেই মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়। আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অধিকাংশ মানুষেরই মনে যে বৈরাগ্য জাগতে থাকে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু দুচারজন যে বাইরেও গৈরিক-বাস পরেন এবং লম্বা চুলদাড়ি রেখে বৈরাগ্য ঘোষণা করেন, সেটি নিতান্তই বাহুল্য ব'লে আমার মনে হয়।

১৯২৬-২৭এর মধ্যে রাজবাড়ির (ফরিদপুর) রাজা সূর্যকমার রায়ের পুত্র সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি রতনদিয়াতে তাঁর হেড-মাস্টার ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে—অথবা বন্ধু শৈলেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসতেন। বৎসরান্তে একবার ক'রে পূজোর মধ্যে তাঁদের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হতাম। শৌখিনদলের থিয়েটার হ'ত সেখানে। স্থানটি রাজবাড়ি স্টেশন থেকে দু মাইল দূরে, লক্ষ্মীকোল নামক জায়গায়।

রাজা সূর্যকুমার ছিলেন বরিশালের জমিদার মতিলাল ঘোষদস্তিদারের ভগিনীপতি। মতিলাল সূর্যকুমার রায়ের এস্টেটের এক্সিকিউটর ছিলেন। তার এক পুত্র রাজবাড়িতে রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিট্যুশনে পড়ত। সে যখন ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে (১৯২৫) তার সঙ্গেও পরিচয় হয় সূর্যকুমারের বাড়িতে। ছেলেটির ছবি আঁকার বেশ হাত ছিল, দেখে ভাল লেগেছিল। আমিই বলেছিলাম একে যেন আর্ট স্কুলে দেওয়া হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে সে কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তারপর সে গেল মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদের ছাত্ররূপে। কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার এর নাম। শিল্পীরূপে আজ সে সম্মানিত।

জমিদার-সন্তান কালীকিঙ্কর খুব বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হয়েছে স্কুল জীবনে। দু মাইল দূরে স্কুলে যেত হাতীতে চ'ড়ে, হাঁটা নিষেধ ছিল। এর মুখে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সম্পর্কে একটিমাত্র কথা শুনে আমিও দেবী-প্রসাদের প্রতি আকৃষ্ট হই। কালীকিঙ্কর সরকারী আর্ট স্কুলের কোনো

গণ্ডগোলে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল আরও অনেকের সঙ্গে। বেরিয়ে এসে সে ভিন্ন প্রদেশের দুএকটি আর্ট স্কুলে, সব কথা প্রকাশ ক'রে, আবেদন করেছিল ভর্তি হওয়ার জন্য। কিন্তু 'এক্সপেলড' শুনে কেউ রাজি হয়নি। রাজি হলেন একমাত্র দেবীপ্রসাদ। তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন, কালীকিঙ্করকে ডেকে পাঠালেন। কালীকিঙ্কর তার কাজের নমুনা দেখাল, দেবীপ্রসাদ তা পছন্দ করলেন। তারপর বলিলেন, "তোমাকে নিতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু তুমি আমার কাজ দেখ তোমার পছন্দ হয় কি না। পছন্দ হ'লে তোমাকে ভর্তি হ'তে বলব।

কালীকিঙ্কর এ কথায় অবাক হয়েছিল, কোনো শিক্ষক যে ছাত্রকে এতখানি শ্রদ্ধা করতে পারেন তা তার জানা ছিল না। এ সংবাদ আমার কাছেও নতুন। আত্মক্ষমতায় নিঃসন্দেহ বিশ্বাস থাকলেই তবে এতখানি মানসিক ঔদার্য সম্ভব। কিন্তু এ তো অনেককাল আগের কথা। চারপাঁচ বছর আগে দেবীপ্রসাদ আমাকে একখানা চিঠিতে প্রসঙ্গত যা লিখেছিলেন তার মর্ম এই যে, কালীকিঙ্কর ফাইনাল পরীক্ষা দিলে অবশ্যই ফার্স্ট হ'ত, কিন্তু পাস করলে স্কুল ছেড়ে যেতে হবে ভয়ে পরীক্ষাই দিল না সেবারে। একটি বছর অতিরিক্ত শিখল বসে ব'সে। ওর নিষ্ঠা দেখে ওকে মনে মনে গুরুর সম্মান দিয়েছি।

এ যুগের কোনো শিক্ষকের পক্ষে এমন কথা ভুলতে ভাবে কি।

১৯২৫-২৬ থেকে আমি প্রায় প্রতি শনিবারে আজিমগঞ্জ যেতাম প্রবোধের কাছে। পরে বলাই যখন কিছুকাল আজিমগঞ্জের হাসপাতালে ডাক্তারের চাকরি নিল তখন আজিমগঞ্জের আকর্ষণ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে একদিন জানা গেল জোড়াসাঁকোয় 'নটীর পূজা' অভিনয় হবে। এই অভিনয়টি প্রবোধকে বাদ দিয়ে দেখতে ইচ্ছে হ'ল না, অথচ চিঠি দিয়ে জানানোর সময় ছিল না, আমি সন্ধ্যা বেলা রওনা হয়ে রাত তিনটে আন্দাজ সময় গিয়ে পৌছলাম আজিমগঞ্জে। তারপর সেখান থেকে সকাল আটটায় রওনা হয়ে বিকেল সাড়ে চারটেয় কলকাতা এসে পৌঁছলাম। টিকিট বিক্রি হচ্ছিল চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত কার অ্যাণ্ড মহলানবিশের খেলাধুলোর সরঞ্জামের দোকানে। হাওড়া থেকে সোজা সেখানেই গেলাম আগে। গিয়ে দেখি টিকিট কেনার খুব ভিড় নেই, তা

দেখে খুবই উৎসাহিত হয়ে দোকানে প্রবেশ ক'রেই দুখানা টিকিট কিনে নিয়ে চলে এলাম জোড়াসাঁকোয়। কিন্তু জোড়াসাঁকোর ভিড় দেখে অবাক ! ভয় হ'ল, সম্ভবত অনেক দেরি ক'রে ফেলেছি, অতএব দ্রুত পা চালিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই অপ্রত্যাশিত বাধা।

টিকিট পরীক্ষক বললেন "এ টিকিট চলবে না।"

"কেন ?"

"এ তো আগামীকালের টিকিট, তারিখটা পড়ে দেখুন।"

পড়তে জানি না বলা সম্ভব নয়, কিন্তু দুঃখ হ'ল আগে কেন পড়িনি। এবং আগামীকালের টিকিটই বা কিনলাম কেন? অথবা কার অ্যাণ্ড মহলানবিশই বা তা দিলেন কেন ?—আমরা তো বলিনি আগামীকালের টিকিট চাই।

টিকিট পরীক্ষক ব্যাপারটা অনুমান করলেন। তিনি বললেন আজকের টিকিট অনেক আগেই সব বিক্রি হয়ে গেছে, তাই বিকেলে যারা টিকিট কিনতে গেছেন তাঁরা আগামীকালের টিকিটই কিনতে গেছেন এটি ধ'রে নেওয়া হয়েছে। কোনো নোটিস সেখানে অবশ্যই আপনাদের চোখের সামনে ছিল, আপনারা হয় তো দেখেননি। আপনারা যে আজকের টিকিট ভ্রমে কালকের টিকিট কিনছেন এটি হয় তো তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন নি, তাই এই বিভ্রাট।"

প্রবোধ ও আমি পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। কাল সকালেই তার ফিরে যাওয়া জরুরি দরকার। মনে হচ্ছিল পায়ের নিচে যেন মাটি নেই। এত উৎসাহ এত পরিশ্রম সব বৃথা।

এমন সময় রথীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠে তাঁকে গিয়ে বললাম—এই ভুল হয়েছে—যেমন ক'রে হোক আজকেই আমাদের দেখার ব্যবস্থা ক'রে দিন। রথীন্দ্রনাথ কথাটি মাত্র না ব'লে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। যেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, তিন বছর আগে তারই নিচের ঘরে বাস করেছি। অনেকেই দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, তাতে অসুবিধে হয়নি কিছু। হ'লেও তা মনে পড়েনি।

তৃতীয় পর্ব

তৃতীয় চিত্র

নটীর পূজার কথা বলছিলাম। আগাগোড়া দাঁড়িয়ে দেখলাম নাটকটি ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়িতে। দর্শকের ভিড়ে কোথায়ও এক ইঞ্চি স্থান শূন্য নেই। কিন্তু যতক্ষণ অভিনয় হ'ল—একটি কথা ছিল না কারো মুখে।

নটীর পূজা নাটক আমার আগে পড়া ছিল না, তাই মনোযোগ ঘনীভূত ক'রে প্রত্যেকটি কথা এবং ঘটনা অনুসরণ ক'রে চলছিলাম।

এ নাটকের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত ও প্রযোজিত দুটিমাত্র নাটক এর আগে দেখেছি—ঋণশোধ আর বিসর্জন। সে দুটিই সাধারণ নাটকের কাঠামো। নটীর পূজা সে রকম নয়। এতে সবই নারী চরিত্র, সেও অভিনব নয়। ক্ষণকালের জন্য রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও এ নাটকের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত নয়। এর বিস্ময়কর অংশ হচ্ছে এর শেষ দৃশ্য। শ্রীমতীর নৃত্যটাকেই নাটকের ক্লাইম্যাক্স বানানোর মধ্যে যে অনন্যসাধারণ সাহস এবং অভিনবত্ব আছে তা আমাকে স্তম্ভিত করেছিল বলা যায়। একটি নৃত্য যে এমন একটা সম্পূর্ণ দৃশ্য হ'তে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। এর সার্থকতা আগে উপলব্ধি করতে পারিনি। 'আমায় ক্ষম হে ক্ষম' গানের সঙ্গে শ্রীমতীর নৃত্যদৃশ্য এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল রচনা করল আমার সম্মুখে।

এমন মন পবিত্র করা একটি দৃশ্য মঞ্চে দেখা যায় না। একটিমাত্র নাচ ও একটিমাত্র গান—এই দুইয়ে মিলে যে সম্পূর্ণ দৃশ্যটি রচিত হয়েছিল তা কত বড় এবং কত গভীর মনে হয়েছিল তখন। আজও তা মনে হ'লে রোমাঞ্চ জাগে। ট্র্যাজেডির এই অকল্পিতপূর্ব রূপটি আমার মনকে উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল সেদিন। এমন গভীর বেদনা যে এমন গভীর আনন্দ দিতে পারে, তার উপলব্ধি এই আমার প্রথম।

মনের মধ্যে এর রেশ নিয়ে ফিরলাম। সব যেন স্বপ্নবৎ মনে হ'তে লাগল। বহুদিন মন থেকে এ দৃশ্যটি সরাতে পারিনি।

তারপর ধীরে ধীরে একটা কথা মনের মধ্যে জেগে উঠল। কথাটি এই যে আর্ট যখন সত্য হয় তখন তার ভিতর দিয়ে শিল্পী নিজেকেই দান করেন। শিল্পীর মনে আত্মনিবেদনের যে প্রেরণা থাকে সেই প্রেরণায়, লক্ষ্যে পৌছতে পারলেই, শিল্পের উদ্দেশ্য সার্থক হয়, সিদ্ধ হয়। শিল্পের সকল রঙের বা ছন্দোঝঙ্কারের আবরণ এক এক ক'রে খুলে ফেলতে পারলে দেখা যেত তারও অন্তরে শ্রীমতীর মতোই ঐ একই গৈরিক বাস। সেটি ঢাকা থাকে কিন্তু আভাসে ইঙ্গিত তার পরিচয় ফুটে ওঠে, তার স্পর্শ এসে মনে লাগে।

"আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে।"

শ্রীমতীকে তাই আমার সকল বড় শিল্পীর প্রতীক ব'লে মনে হয়েছিল। এ ধারণা আমার অদ্যাবধি নষ্ট হয়নি। বরঞ্চ এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে যে শিল্পীর পক্ষে শিল্পই তার শ্রেষ্ঠ পূজা। এ শুধু নটীর একার পূজা নয়। নটী শুধু তার ব্যাখ্যা ক'রে গেল। পূজার জন্যই সে নাচেনি, নাচই তার পূজা হয়ে উঠল, কেননা শিল্পীরূপে সে তার সেই নাচের ভিতর নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল।

এর পরবর্তী সময় থেকে আবার নানা পরীক্ষার পথে চলেছি। দুতিনটি বছর কেটে গেল প্রায় নিষ্ফল ভাবেই, এবং এই সময়ের মধ্যে যে সব কাজ করেছি তা উল্লেখযোগ্য নয়। তার মধ্যে ফোটোগ্রাফি ছিল, বীমা অফিসের প্রচারকের কাজ ছিল; বলাইচাঁদ এই সময় কলকাতা চ'লে আসে ডাক্তার চারুব্রত রায়ের কাছ থেকে ল্যাবরেটার প্র্যাকটিসের আঙ্গিকগুলো জেনে নিতে। সুতরাং আরও একবার তার সঙ্গে মিলতে পেরে খুব ভাল লাগল। আমি তখন (১৯২৮ ডিসেম্বর) হ্যারিসন রোডের স্টুডিওর বাড়িতে থাকি। বলাই ইণ্টারন্যাশন্যাল বোডিং থেকে আমার সঙ্গে চলল রাত্রিটা আমার সঙ্গে কাটাবে ব'লে। জ্ঞানরঞ্জন রাউত রায়

রাত্রি ১১ টার সময় আমাদের দুজনকে একত্র বসিয়ে একখানা ফোটোগ্রাফ তুলে দিল, সেখানা আজও আছে। এর আগে ১৯২৫ সালে বলাই আমি সমরেশ ভট্টাচার্য ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (বলাইয়ের ভাই) ও শৈলেশ মৈত্র—পথে ঘুরতে ঘুরতে খেয়াল হ'ল একত্রে ফোটো তোলালে মন্দ হয় না। তখনই চারু গুহের স্টুডিওতে ঢুকে পড়লাম। অনেক মধুর স্মৃতিবিজড়িত বলেই ছবি দুখানার কথা না লিখে পারা গেল না।

বলছিলাম ১৯২৮ সালের কথা। হ্যারিসন রোড ধ'রে চলতে চলতে সেদিন সেই রাত্রি প্রায় এগারোটায় বলাইয়ের মাথায় কিছু পাগলামি জাগল। তার পায়ে সদ্য কেনা একজোড়া উৎকৃষ্ট জুতো ছিল, চট ক'রে সে সেই জুতো জোড়া খুলে ফেলে একটা দোকানের দরজায় খাড়া ক'রে রাখল এবং বলল. দেখা যাক চুরি হয় কিনা। আমি বললাম, চুরি তো হবেই। বলাই বলল, তবু দেখা যাক, সকালে উঠে এসে দেখব কি হয়েছে।

সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল। খালি পায়ে সেখানে এসে, যা ঘটবে ভাবা গিয়েছিল, তাই ঘটেছে দেখা গেল। জুতো যে চুরি হবেই এটি এত কষ্ট ক'রে পরীক্ষা করার সে দিন খুব যে প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল তা আমার মনে হয় না, কিন্তু বলাইয়ের এইটি হচ্ছে চরিত্র।

এই সময় রাজবাড়ি থেকে মন্মথনাথ পাল সম্পাদিত একখানি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হয়, তার নাম এখন আর মনে নেই। রাজবাড়ি হচ্ছে গোয়ালন্দ মহকুমার প্রধান শহর, এ জায়গার কথা আগে বলেছি। দুটি হাই স্কুল এবং আদালত ইত্যাদিতে মিলে জায়গাটি বেশ বড় ছিল।

রাজবাড়ির এই সাপ্তাহিক কাগজে একদিন একটি প্রবন্ধ দেখি—প্রবন্ধ লেখক রামচরণ মৈত্র এম. এ। তিনি এই প্রবন্ধে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে বলে-ছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, কোনো এক প্রখ্যাত ব্যক্তি একটি মেয়েকে সিগারেট খেতে দেখেছেন—অতএব স্ত্রীশিক্ষা খারাপ। লেখক আমার পরিচিত ছিলেন, এখন তিনি কি অবস্থায় কোথায় আছেন জানি না।

তাঁর প্রবন্ধে যুক্তিতে যে ভুল ছিল আমি শুধু সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম পাল্টা এক প্রবন্ধ লিখে। তারপর থেকে আমাদের বাদ প্রতিবাদ প্রতি সপ্তাহে চলতে থাকে প্রায় ছমাস ধ'রে।

আমি বলেছিলাম শিক্ষার সঙ্গে সিগারেট খাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার, যদি কারো সামর্থ্যে কুলোয় এবং প্রবৃত্তিতে না আটকায়, তবে তার সেই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে এ রকম আলোচনা সঙ্গত নয়।

বলা বাহুল্য এর প্রতিবাদে ভারতীয় আদর্শের দোহাই দিয়ে আরও খারাপ কথা শুনতে হ'ল আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের সম্পর্কে। অতঃপর আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম ভারতীয় আদর্শের কথা না তোলাই ভাল, কেননা প্রাচীন ভারতে মেয়েদের তৎকালোপযোগী যে সব ব্যবহার অনুমোদিত ছিল, তাই বরং বর্তমানের চোখে বেশি খারাপ লাগা উচিত। আমার এ সব কথা প্রমাণের জন্য প্রাচীন সমাজের কথা অনেক পড়তে হয়েছিল তখন। আমার বক্তব্য ছিল, সমাজ এক একটা যুগে এক একটা চেহারা পায়, তা অনিবার্য পরিবর্তনেরই ফল, ইচ্ছে করলেই সময়ের কাঁটাটা ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। এই জাতীয় সব তত্ত্ব কথার অবতারণা করেছিলাম। তখন বয়স ছিল কম, তর্কের প্রবৃত্তি ছিল অতিশয় উগ্র, তাই হয় তো তর্কের ঝোঁকে মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে থাকব। তর্কের খাতিরেই তর্ক করলে যা হয়। যাই হোক এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হচ্ছে এই যে আমাদের বাদপ্রতিবাদ দিয়েই সেই ছোট্ট কাগজখানা চলছিল তখন। তারপর মাস ছয়েক পরে যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন কাগজও উঠে গেল।

১৯৩০ বা কাছাকাছি সময়ে ফরাসী ভাষা শেখার জন্য প্রাথমিক বই কিছু কিনলাম।—এর ফল শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল তা প্রকাশ ক'রে বলবার মতো নয়, কিন্তু ফরাসী ভাষা শেখার ইচ্ছেটা হয়েছিল কেন, সেটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমি যখন ছোট, সে সময় রতনদিয়াতে এলে, শশীভূষণ চক্রবর্তী নামক এক ভদ্রলোককে বাবার কাছে আসতে দেখতাম প্রতিদিন। তাঁর মাথাটি ছিল বড়, চোখ দুটিও বেশ বড়, খাটো ক'রে ছাঁটা চুল, মুখে একটা দৃঢ়তার ছাপ। সব সময়েই তাঁর হাতে একখানা "বেঙ্গলী" কাগজ থাকত।

তাঁর পরিচয়—তিনি চন্দনা নদীর ওপারে অবস্থিত হাটগ্রাম নামক গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলের পণ্ডিত। বাবার কাছে শুনেছিলাম তিনি ইংরেজী

খবরের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে ইংরেজী শিখছেন। শুনে অবাক হয়েছিলাম। ঘটনাটি মনের উপর এমন একটি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে সম্ভবত এই কারণেই আমি স্কুলে পড়তে পড়তে লণ্ডনের 'দি বয়েস ওন পেপার' ও পরে কলকাতার দ্বি-সাপ্তাহিক 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস'-এর গ্রাহক হয়েছিলাম। যাই হোক কয়েক বছর পরে শুনতে পেলাম শশীভূষণ চক্রবর্তী পাঠশালার পণ্ডিতি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চ'লে গেছেন।

আমি যখন বি. এ. পড়ি তখন থেকে আবার তাঁকে মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসতে দেখতাম। শুনলাম তিনি ইংরেজীতে পাকা পণ্ডিত হয়েছেন এবং কলকাতায় এসে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। আরও শুনে স্তম্ভিত হলাম তিনি কলকাতায় বি. এ. ছাত্রকে প্রাইভেট পড়ান এবং কলকাতায় টিউশন ক'রে বেশ উপার্জন করেন।

খুবই আশ্চর্যজনক বোধ হ'ল। গ্রাম্য ছাত্রবৃত্তি স্কুলের পণ্ডিত আপন গরজে অন্যের সাহায্য না নিয়ে ইংরেজী ভাষা ভাল ভাবে আয়ত্ত করেছেন, এ কেমন ক'রে ঘটল, ভেবে কূলকিনারা পেলাম না। শুধু তাই নয়, আরও চার পাঁচ বছর পরে তাঁর কাছে শুনে স্তম্ভিত হলাম—তিনি ফরাসী ভাষাও নিজের চেষ্টায় খুব ভাল ভাবে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন।

বাড়ি ছিল তাঁর রতনদিয়া থেকে কিছু দূরে একটি গ্রামে। এক দিন অন্য কোথায়ও যাবার পথে পিঠে এক বোঝা নিয়ে এসে উঠলেন আমাদের বাড়িতে। চটের থলে একটি—প্রায় আধমণ ভারি হবে। থলে থেকে সব বিড়ালই বেরিয়ে পড়ল একে একে—সবই ফরাসী বই।

তিনি এখন ফরাসী ভাষায় লেখা যে-কোনো বই অতি সহজে বুঝতে পারেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, উচ্চারণ শিখলেন কি ক'রে?

আমার উপর তিনি চটে গেলেন এ কথা শুনে। বললেন উচ্চারণে আমার দরকার কি? আমি কি ফরাসী দেশে যাচ্ছি, না ফরাসীদের সঙ্গে আলাপ করছি? উচ্চারণ শিখে টিউটর রেখে কি এ ভাষা শেখা আমার পোষাত? কিন্তু আমি ঠকিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী সাহিত্য দর্শন পড়া, সে উদ্দেশ্য আমার সফল হয়েছে—আমি ওদের সব বই এখন পরিষ্কার বুঝতে পারি। তুইও শিখে ফেল ফরাসী ভাষা।

আমি বললাম, আমি যদি কখনো শিখি তবে খাঁটি ফরাসী উচ্চারণ শিখে নেব আগে। এ কথাটা বললাম কারণ উচ্চারণ না শিখে ভাষা শেখার বিরোধী ছিলেন বাবা। তিনি বহু সাধনা ক'রে পারসিক ভাষা উচ্চারণ সমেত শিখেছিলেন এবং ইংরেজী পড়তেন এবং বলতেন বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে। তাই উচ্চারণ বাদ দিয়ে ভাষা শেখার কল্পনা আমি করতে পারিনি।

শশীভূষণ বললেন, সে আশায় ব'সে থাকলে তোর কোন দিনই শেখা হবে না।

আমার সম্পর্কে তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। যে দিন অবসর আছে মনে ক'রে বই কিনে পড়তে আরম্ভ করলাম, সেদিন দেখি শিক্ষক ভিন্ন উচ্চারণ শেখা প্রায় অসম্ভব। আর তখন শিক্ষক রেখে ভাষা শেখার গরজও ছিল না। উপরের কোনো চাপ বা বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও যাঁরা বিদেশী ভাষা আপন গরজে শিখতে উৎসাহিত হন, তাঁদের মতো মনের জোর তখন আমি খুজে পাইনি। আজও আমি সেই সৌম্যদর্শন প্রবল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন শশীভূষণ চক্রবর্তীর বিদ্যাসাগরী মূর্তিটি বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এক অখ্যাত পল্লীর এক ছাত্রবৃত্তি স্কুলের পণ্ডিতের এই বিবর্তন সামান্য ঘটনা নয়।

গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছি ১৯৩০ থেকে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি থেকে প্রকাশিত বঙ্গলক্ষ্মীর সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর। সম্পাদনার কাজ দেখাশোনা করতেন কবি রাধাচরণ চক্রবর্তী। তিনি আমার লেখা খুব পছন্দ করতেন এবং তাঁরই অনুরোধে সেখানে অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখি। বঙ্গলক্ষ্মী কাগজ তখন বেশ পুষ্ট ছিল, প্রচারও ছিল ভাল। এই কাগজে 'ধর্ম গেল' 'যত্নে রূপং'—, 'স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ', 'রবীন্দ্র শিল্প' প্রভৃতি রচনা ছাপা হয়। এর অধিকাংশই রাজবাড়ির সেই সাপ্তাহিক কাগজের দ্বন্দ্বের পরবর্তী অধ্যায়। সে কাগজে যা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ, তা এ সব রচনায় অনেকটা সংযত হয়ে এসেছে, যদিও সবটা নয়। সর্দা বিল উপলক্ষে তখন ভীষণ আন্দোলন চলেছিল তারও কিছু ছাপ পড়েছিল মনে। একটুখানি উদ্ধৃত করি ধর্ম গেল প্রবন্ধ থেকে।

"......সকলেরই ভয় ধর্ম গেল। সতীদাহ নিবারণের সময় চিৎকার উঠিয়াছিল ধর্ম গেল। বিধবা বিবাহ প্রচারের সময় চিৎকার উঠিয়াছিল ধর্ম গেল। তারপর কত বৎসর অতীত হইল, আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও শিশুবিবাহ নিবারণ উপলক্ষে সেই একই চিৎকার শোনা যাইতেছে—ধর্ম গেল।

"সতীদাহ নিবারণে, বিধবাবিবাহ প্রচলনে অথবা শিশু বিবাহ উচ্ছেদে ধর্ম যায় কেন, এবং ইহার বিপরীত হইলেই ধর্ম থাকে কেন, তাহা বুঝিয়া দেখা দরকার। আমরা যাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া মান্য করি, তাঁহাদের মতে যাহা স্ত্রীজাতির উন্নতি বিধায়ক দেখা যাইতেছে তাহাই আমাদের ধর্মনাশক।"

সাড়ে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধের এটি আরম্ভ মাত্র। এই ছিল সাতাশ বছর আগের আমার লিখনভঙ্গি। আক্রমণাত্মক ভাবের কিছু কিছু আভাস এ প্রবন্ধেও আছে।

আমার বাবার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। ম্যালেরিয়ার মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও তাঁকে ম্যালেরিয়ায় ভুগতে দেখিনি এক দিনও। দৃষ্টিশক্তিও অটুট ছিল, কখনো চশমা পরতে হয়নি। চীনেবাড়ির কালো চটের স্প্রিং-সংযুক্ত জুতো পাওয়া যেত আগে, দাম সম্ভবত দেড় টাকা, তাই তাঁকে পরতে দেখেছি বরাবর। শীতকালে উলের বা ফ্ল্যানেলের কোনো কিছুই পরতে দেখিনি, অথচ সর্দি কাসি হয়নি কখনো।

তাঁর অসুখ হল ৬০ বৎসর বয়সে, এবং সেই শেষ অসুখ। ১৩৩৮ (১৯৩১) জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আমাদের পরিবারে এই প্রথম মৃত্যু নিজ চোখে দেখলাম। মৃত্যু সংবাদে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে আমাকে লিখলেন—

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হইলাম। একদা তিনি আমার সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার রচনা নৈপুণ্যে বিস্ময় বোধ করিয়াছি। সাধারণের কাছে তাঁহার লেখার যথেষ্ট প্রচার হয় নাই, তিনি জনতা হইতে দূরে ছিলেন—আশা করি তাঁহার কীর্তি সাহিত্যক্ষেত্রে অগোচরে থাকিবে না।

তোমাদের জন্য আমি সান্ত্বনা ও কল্যাণ কামনা করি।

ইতি ৫ আষাঢ় ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাল্যকাল থেকে পিতৃস্নেহে বেশি পুষ্ট ছিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি, অতএব তাঁর মতো সহৃদয় এবং শুভার্থী আমার জীবনে আর কেউ ছিলেন ব'লে আমি জানতাম না।

রবীন্দ্রনাথ বাবার মৃত্যুতে আমাদের জন্য সান্ত্বনা কামনা করেছিলেন এটি বড় কথা। কিন্তু তাঁর অপেক্ষিত মৃত্যু সম্পর্কে আমি আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমি জানতাম এই মৃত্যুজনিত আঘাত আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করবে, তাই কিছুদিন ধ'রে মৃত্যু কি, এই কথাটি ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। মৃত্যুর স্বরূপ কি, মৃত্যু কেন, প্রভৃতি অনেক কথা মনে আসছিল। মৃত্যুর স্বরূপটি মনের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে তুলছিলাম।

মৃত্যু কি, এ প্রশ্ন এর ঠিক দশ বছর আগে একবার আমাকে বিচলিত করেছিল। শান্তিনিকেতনের যুগে একখানা খাতায় এ সম্পর্কে গোটাকত প্রশ্ন লিখেছিলাম, অনেকটা খসড়া আলোচনার আকারে। ভেবেছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হয় নি।

আমার মনে যে সব যুক্তি দেখা দিয়েছিল তা প্রাথমিক একক কোষ প্রাণীর স্বরূপ জানার পরের ধাপ থেকে এগিয়ে গেছে। একটি অ্যামিবা নামক একক কোষ আদিম প্রাণীর মৃত্যু হয় না—তার জীবনের পরিণতি ঘটলে সে নিজেকে দু ভাগে ভাগ ক'রে আবার নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করে। এ বিস্ময় আমার মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমার মনে হ'ল তা হ'লে মানুষেরও মৃত্যু নেই। অ্যামিবার জীবন সরল তাই ওর 'জন্ম' আর 'মৃত্যু' দুটোই খুব সরল। আসলে নতুন জন্মও নয়, মৃত্যুও নয়, একই প্রাণী পুরনো হলেই নিজেকে ভাগ ক'রে নতুন হচ্ছে। মানুষের দেহ জটিল ব'লে তার জন্মের জন্য দুটি প্রাণীর মিলন এবং তার পরিণতির জন্য দুটি দেহকে শ্মশানে যেতে হচ্ছে। ওটা তার আপাত-মৃত্যু। সে মরেনি, সে আপন উত্তরপুরুষের মধ্যে নিজেকে ভাগ ক'রে বেঁচে রইল। অ্যামিবা নামক প্রাণীতে প্রাণধারা যে রীতিতে চলেছে, মানুষের বেলায় সে রীতিটি বাদ যাবে কেন? এই যে নিজেকে ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে বিলীন করা, এই রীতি শুধু অ্যামিবার বেলায় খাটবে, মানুষের বেলায় খাটবে না, এটি মন মানতে চাইল না। আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল মানুষের বেলাতেও

ঠিক ঐ একই ব্যাপার ঘটছে, শুধু তার দেহ অত্যন্ত জটিল ব'লে পাঁচজনের সামনে ফস্ ক'রে নিজেকে দুভাগে ভাগ করতে পারে না, সেই জন্যই তার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ব্যবস্থাটাও একটু জটিল। একটি খোলস যেন খুলে প'ড়ে গেল। কিন্তু তাতে তার সত্তার কোনো ক্ষতি হ'ল না, কেননা সে তার উত্তর-পুরুষের মধ্যে বেঁচে রইল। অ্যামিবার সরল দেহ, তাই তার আর খোলস নিক্ষেপের দরকার হয় না। মানুষের দেহ জটিল তাই তার জীবনের পথে জন্ম ও মৃত্যু নামক দুটি কৌশল সৃষ্টি করতে হয়েছে, যাতে জীবন-ছন্দের গতি বাধা না পায়। কোনো এক ব্যক্তি উত্তরপুরুষ বিবর্জিত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে সমগ্র মানবতার কিছু ক্ষতি হয় না। হাজার বছর আগে যে পাখী উড়েছে বাংলার আকাশে, আজও সেই পাখীই উড়ছে। হাজার বছর আগে যে মানুষ সেই পাখীর ডাক শুনেছে, আজও সেই মানুষই সেই পাখীর ডাক শুনছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফাল্গুনী নাটকে যে কথাটি বলেছিলেন তারও অর্থ যেন আমার-পাওয়া জীবনমৃত্যুর অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গেল।

> 'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম
> বারে বারে
> ভেবেছিলাম ফিরব না রে।
> এই তো আমার নবীন বেশে
> এলেম তোমার হৃদয় দ্বারে।"

যুক্তি শাস্ত্র অনুযায়ী ভাবতে গেলেই এ কথাটা আমার মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মানুষের বা মনুষ্যেতর কোনো প্রাণীরই মৃত্যু হয় না, ও কেবল দেখার ভুল। জীব দেহের আবির্ভাব ও তিরোধান একটি চাকার পাক মাত্র, এই চক্র তাকে ঘুরতেই হবে, এবং ঘোরা শেষ হ'লে দেখা যাবে সেই ব্যক্তি-দেহটি আর নেই, তার স্থানে নবীনের আবির্ভাব ঘটেছে। নবীন বেশে যে আসে তার আবর্তন শেষ ক'রে সে চলে যায়, যাবার সময় আর এক নবীনকে সে রেখে যায়।

যুক্তির পথে এই ছবিটিই দেখতে পাওয়া যায়—অবশ্য যুক্তির বাইরে বিরাট এক অন্ধকার জগৎ, সেখানে প্রবেশ করি এমন সাধ্য আমার নেই। তাই কোন্‌টা যে সত্য তা নিঃশেষে জানবার উপায় নেই। তবু নিজের

সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যই নিজের বুদ্ধিতে একটা কিছু ধারণা ক'রে নিতে হয়েছিল। এটি হয় তো একমাত্র আমারই সত্য, তবু আমার পক্ষে যুক্তির পথে যেটুকু যেতে পারি তার বেশি যেতে মন সরে না। তাই আমি আজও বিশ্বাস করি মৃত্যুর পর তার আত্মা বা প্রেতদেহ নামক কোনো বস্তু দেহের বাইরে বেরিয়ে যায় না, কেননা ও রকম কোনো বস্তুই নেই।

জীবন মৃত্যুর এই রূপটি আরও স্পষ্ট ক'রে ভেবে দেখবার জন্য চার বছর আগে (১৯১৩) মাসিক বসুমতীতে আমি একটি বড় প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটির নাম "জাগিল কি ঘুমালো সে।" (পরে এটি আমার "ম্যাজিক লণ্ঠন' নামক বইতে সংকলিত হয়েছে)।

মনকে এই যুক্তিতে চালিত ক'রে অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যু সম্পর্কে আমার ধারণা, আমার মনে এমনই দৃঢ় হয়ে উঠল যে চরম মুহূর্তে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হইনি। মনে হয়েছিল, একটা চিরকালের সত্য, যা অমোঘ, যা অন্যায় নয়, যা আমাদের কল্যাণের জন্যই ব্যবস্থিত, তার জন্য দুঃখ করব কেন। মনকে স্থির রাখবার এই মন্ত্র, এটি বার বার জপ করতে হয়, নইলে মন হঠাৎ ভেঙে পড়তে পারে। যেমন হয়েছিল আমার ১৯৪১ সালে। তখন আমি শয্যাশায়ী, কারবাঙ্কল-এর ব্যথায় ম্রিয়মাণ, এমন সময় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হ'ল। তাঁর গুরুতর পীড়ার সংবাদ জেনেও তখন মনকে তৈরি করতে পারিনি, তার জন্য বেগ পেতে হয়েছিল। ওঠবার ক্ষমতা নেই, রেডিওতে শুনছি, আর দুচোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

অপ্রস্তুত থাকলে প্রিয়জনের মৃত্যুতে আঘাত লাগে। মন আবেগে ভেঙে পড়ে, নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়।

আমার পিতার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারে দ্বিতীয় মৃত্যু ঘটল ১৯৫৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর।—আমার স্ত্রীর মৃত্যু। এর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি চলছিল। অনেক দিন পরে আরও একবার মৃত্যুকে বিশ্বের অমোঘ বিধানের পটভূমিতে অবিরাম মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হ'ল। পরিণাম অপেক্ষিত ছিল। পূব থেকেই মৃত্যু ঘ'টে গেছে ধ'রে নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম। মন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তবু তার কাছে আমার উপলব্ধিকে ব্যর্থ হতে দিইনি।

পৃথিবীর সর্বত্র ঠিক এমনি বিচ্ছেদ ঘটছে প্রতি সেকেণ্ডে। সবার ক্ষেত্রেই ঐ একই ইতিহাস, বহু স্মৃতি পিছনে ফেলে, বহু আশা অপূর্ণ রেখে,

প্রতি মুহূর্তে কত লোক যে ছেড়ে যাচ্ছে এ সংসার। সবার মৃত্যু থেকে আমার প্রিয়জনের মৃত্যুকে পৃথক ক'রে না দেখে সবার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি সমস্ত আবেগকে চেপে রেখে। রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করেছি, বহু মৃত্যুর অপরিসীম বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি স্থির ভাবে এগিয়ে গেছেন। তাঁর কথা স্মরণ ক'রে জোর পেয়েছি, তাঁর বাণী আমার মনে বল সঞ্চার করেছে। জাগিল কি ঘুমালো সে কে দেবে উত্তর?

প্রিয়বস্তুকে প্রতিদিন আমরা হারাতে হারাতে চলেছি—সর্বত্রই তার একই চেহারা। এর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হওয়া বৃথা। এই মৃত্যুর বিরাট পটে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি আমার জীবনের হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি। স্মৃতিচিত্রণ লিখতে লিখতে কতবার মনের উপর থেকে বয়সের ভারী বোঝাটা কখন সরে গেছে, আমি আজকের (যখন এই রচনা লিখছি।) হেমন্তকালের সোনালী রোদের মতোই উদাসকরা রোদে পদ্মার তীরে তীরে ঘুরে বেড়িয়েছি। তার পর হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেছে, বাস্তবে ফিরে এসেছি, বেদনায় মন ভারী হয়ে উঠেছে।

কোথায় আমার সেই কৈশোর? কোথায় আমার সেই বালক আমি? সেও তো আমার পৃথক একটা সত্তা, আমার জীবনের সকল মাধুর্য তাকে ঘিরে পুষ্ট হয়েছিল, অথচ তাকে এ জীবনের মতো হারিয়েছি। সে আমার জীবনে সবচেয়ে মধুর এবং প্রিয় ছিল, অথচ তাকে আর ফিরে পাব না! কল্পনায় মাঝে মাঝে সে বয়সে ফিরে যাব, রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি'র সেকেণ্ড মাস্টার যেমন সুরবালা সম্পর্কে বলেছিল প্রায় তেমনি তার সমস্ত স্বাদগন্ধ সমস্ত মনেপ্রাণে অনুভব করব, কিন্তু কখনো আর সেই-আমিকে ছুঁতে পাব না।

এও প্রিয়জনের মৃত্যু। জীবনে বার বার এ মৃত্যু ঘটেছে। এ মৃত্যুকেও সাধারণ মৃত্যুর সঙ্গে আমি এক ক'রে দেখছি। সব মৃত্যুর জন্যই দুঃখ হয়, কারণ সেটি সেন্টিমেণ্টের ব্যাপার, এবং সেন্টিমেণ্ট মনের একটি বিশিষ্ট গুণ; কিন্তু তবু মনকে ব্যক্তিগত মৃত্যু-দুঃখ থেকে সরিয়ে তার সম্মুখে বিশ্ববিধানের স্বরূপটি মেলে ধরতে পারলে মৃত্যু-দুঃখ ব্যাপ্তির মধ্যে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে যায়। যখনই মন দুঃখবেদনায় ভেঙে পড়তে চাইবে তখনই পাগলা মেহের আলির ভূমিকায় নেমে 'তফাৎ যাও' 'তফাৎ যাও' ব'লে চিৎকার করতে হবে। বলতে হবে "সব ঝুট হায়—সব ঝুট হায়।" এটি

মনের একটি ব্যায়াম মাত্র। খুব শ্রমসাপেক্ষ, কিন্তু নিশ্চিত ফলপ্রসূ। এবং সম্ভবত এ ব্যায়াম পুরুষের পক্ষেই সহজ, মেয়েদের পক্ষে কঠিন।

এবারে ১৯৩১ সালে ফিরে যাই। পিতার মৃত্যুর পর আমি কলকাতা চলে আসি এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ বাস করতে থাকি। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন বাবার একজন ভক্ত, তিনি আমার কাছে এ সময়ে প্রায় প্রতিদিন আসতেন আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে আজকের দিনে লোকে মানময়ী গার্লস স্কুলের লেখক ব'লেই জানে, তাঁর অনেক ব্যঙ্গ গল্পের কথা অনেকের হয় তো জানা নেই। তাঁর 'থার্ড ক্লাস'-এ যে সব গল্প আছে তাতে বঞ্চিত মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর বড় পরিচয় তিনি নিজে ছিলেন উদ্যোগী সমাজসেবক। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নিয়ে ছিল তাঁর সমাজ। তিনি তাদের দরদী বন্ধু ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি কথাসাহিত্যে বা নাট্যসাহিত্যে বা সমাজের উন্নতির জন্য যা করতে পারতেন, তা করা হ'ল না, তবু যে বিভাগে যে টুকু দান তিনি রেখে গেছেন তার মূল্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রই আমাকে বললেন, তোমার বাবার মৃত্যু-সংবাদটি ছাপা হওয়া উচিত। তাঁর নির্দেশে সংক্ষিপ্ত একটি সংবাদ রচনা করলাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিখানাও জুড়ে দিলাম তার সঙ্গে। তার পর বাবার একখানি ফোটোগ্রাফ ও হাতের লেখার নমুনা সহ সংবাদটি নিয়ে রবীন্দ্র মৈত্র আমাকে বললেন, চল্ আমার সঙ্গে।

আমরা দু জনে সোজা প্রবাসী অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রবীন্দ্র মৈত্র সে সব এক যুবকের হাতে দিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র ওটি ছাপতে বললেন। যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন এঁর নাম সজনীকান্ত দাস। আমরা সেখানে দু তিন মিনিট মাত্র ছিলাম। পরিচয় হ'ল নাম মাত্র। তিনি আমাকে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস ছিল তখন মির্জাপুর স্ট্রীটে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৩১-৩২ সালেই আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম লিখি। কিছু দিন আগে উপাসনা কাগজ নতুন ভাবে আরম্ভ হয়েছে সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের মালিকানায়। স্বত্ব হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব সম্পাদক

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সহকারী সম্পাদক কিরণকুমার ঠিকই রইলেন। উপাসনা কাগজে প্রথম লিখেছি ১৯২০ সালে। আবার প্রায় এক যুগ পরে সে কাগজে লিখতে আরম্ভ করলাম নিয়মিত।

১৯৩২ সালে আমি ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএর বিপরিত দিকে হ্যারিসন রোডে অবস্থিত রজনী ফার্মাসির পিছনের একটি ঘর নিয়ে বাস করতে থাকি। রজনী ফার্মাসির স্বত্বাধিকারী ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ দাস এম, বি, আমার বন্ধু। এই সময় অল্পদিনের জন্য আমি একটি বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রচার বিভাগে কাজ করি। এই বীমা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটি চীফ এজেন্সি। চীফ এজেণ্ট দুজন, ফরিদপুরের জমিদার লাল মিয়া (চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন) ও রাজবাড়ির মণীন্দ্রভূষণ দত্ত। প্রতিষ্ঠানের নাম চৌধুরী, দত্ত অ্যাণ্ড কোঃ।

আমার নতুন বাসস্থানও একটি বড় গুণীজনের আড্ডা। সে আড্ডার মূলকেন্দ্র ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ দাস। তাঁর সহযোগী ডাক্তার ধীরেন্দ্রভূষণ বসু এম. বি. ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারতেন। এ আড্ডায় অনেক ডাক্তার এবং রোগীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সত্যেন্দ্র দাস, ধীরেন্দ্র বসু, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, জার্মান কেমিস্ট দেবেন সেন প্রভৃতি সন্ধ্যার পরে পৃথক একটি ঘরে ব্রিজ খেলতেন। কদাচিৎ লোকাভাবে আমাকেও সে খেলায় যোগ দিতে হয়েছে। অতগুলি ধর্মনিষ্ঠ খেলোয়াড়ের মধ্যে নিষ্ঠাহীন আমি খুব বিপন্ন বোধ করতাম। ও খেলায় আমার আকর্ষণ হ'ল না কখনো।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি আমার বাসস্থানের কাছাকাছি উঠে আসাতে (মির্জাপুর স্ট্রীটে) ওখানে প্রায় যেতাম। নিজে লিখে অথবা লেখা সংগ্রহ ক'রে দিয়ে সম্পাদিকাকে সাহায্য করেছি। এই বাড়িতে আগে এসেছিলাম ১৯১২-১৩ সালে, এখানে ছিল কে. ভি. সেন ব্লক মেকার এবং বণিক প্রেস। এটি এককালে ছিল রিপন কলেজ। সরোজ-নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত স্কুলে কয়েক বছর আমাকেই প্রশ্নপত্র তৈরি ক'রে দিতে হয়েছে। কথাটি সম্পূর্ণ ভুল হয়ে গিয়েছিল, একখানা পুরনো চিঠি হঠাৎ চোখে পড়ায় এখন কিছু কিছু মনে পড়ছে সে কথা। চিঠিখানা ধীরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এম. এ. লিখিত। লেখার তারিখ ২৩।১১।৩৪। তিনি লিখছেন—

"প্রতিবৎসর এমনি সময় আমরা একবার আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হই। আমাদের স্কুলের পরীক্ষা নিকটবর্তী। আপনাকে একটি ক্লাসের প্রশ্ন করিবার জন্য পুস্তক পাঠাইয়াছি। কোন্ কোন্ বিষযে কতদূর পর্যন্ত প্রশ্ন করিতে হইবে তাহা পুস্তকের সহিত প্রেরিত একটি স্লিপে লিখিয়া দিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রশ্নগুলি একটু শীঘ্র করিয়া দিলে বড়ই বাধিত হইব"………

ধীরেনবাবু ঐ সমিতির একজন কর্মী ছিলেন। আর একজন কর্মী তারাদাস মুখোপাধ্যায়, পরে "ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়" ছদ্মনামে সিনেমা ও সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হয়েছিল। শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তিনি ছিলেন সবার বড়মা। ধীরেন্দ্র সিংহ এখন আর জীবিত নেই। আমার পরিচিতের মধ্যে আর বেচে নেই প্রতিভা সেন। বড়মা বর্তমানে বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রমে কর্ত্রীরূপে পুরীতে বাস করেন। আর এক শিক্ষয়িত্রী ছিল হেমনলিনী মল্লিক। সে এই নারীমঙ্গল সমিতির জন্যই যেন চিহ্নিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। শুনেছি সে এখনও এর নিষ্ঠাবতী সেবিকা। এই নারীমঙ্গল সমিতিটি তখন কর্মতৎপরতায় জমজমাট ছিল। গুরুসদয় দত্তের জীবিতকালে নারীদের এটি ছিল একটি শক্তিকেন্দ্র। আজ এর কি অবস্থা হয়েছে জানি না।

হ্যারিসন রোডের সেই রজনী ফার্মাসি সংলগ্ন ঘরে থাকতে লাল মিয়া একদিন এসে প্রস্তাব করলেন তিনি একখানি বার্ষিক পত্রিকা বা'র করবেন, তার ভার নিতে হবে আমাকে। বার্ষিক পত্রিকার নাম হবে রূপ ও লেখা, (না রূপ ও রেখা মনে নেই) সম্পাদিকা জাহান-আরা বেগম চৌধুরী। সে সময় লাল মিয়ার সঙ্গে ওদের পরিবারের বন্ধুত্ব। আমি সম্পাদনার ভার নিলাম। প্রায় এই সময়েই উপাসনা কাগজের রূপান্তর ঘটেছে, তার নতুন নাম হয়েছে বঙ্গশ্রী। সম্পাদকও নতুন, সজনীকান্ত দাস। সাবিত্রীপ্রসন্ন আর রইলেন না, রয়ে গেল কিরণকুমার রায়।

বঙ্গশ্রীর নতুন সাহিত্যসমাজ, আমি বাইরের লোক। এ দুয়ের মধ্যে জোড়াসাঁকো রচিত হ'ল রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও কিরণকুমার রায়ের মাধ্যমে! লেখা সংগ্রহের জন্য সেখানে যেতে হ'ল কয়েক বার। বার্ষিক পত্রিকা-খানিতে প্রত্যেক লেখার সঙ্গে লেখক বা লেখিকার ফোটোগ্রাফ ছাপতে

হবে এই ছিল ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ও সজনীকান্ত দাসের ফোটোগ্রাফ এক স্টুডিও থেকে তুলিয়ে নেওয়া হ'ল, বঙ্গশ্রীর বাড়ির এক পাশে কালীপদ নামক এক যুবকের একটি স্টুডিও ছিল, সম্ভবত সেইখান থেকেই। মোটের উপর কাগজখানা সুমুদ্রিত হয়েছিল, ভিতরের লেআউট প্রত্যেকটি পাতায় আমি নিজে খুব যত্ন ক'রে করেছিলাম।

এই কাগজ প্রকাশিত হবার পরই ইং ১৯৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের কোনো একটা দিনে আমি বঙ্গশ্রী অফিসে উপস্থিত ছিলাম—সজনীকান্তের সঙ্গে তখনও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তিনি আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, শনিবারের চিঠির সম্পূর্ণ ভার আমি আপনাকে দিতে চাই, আপনি এর সম্পাদনা করুন। রবি মৈত্রেরই সম্পাদক হওয়ার কথা, কিন্তু তাঁকে সমাজের কাজে বাইরে বাইরে থাকতে হয়, অতএব আপনাকেই এ ভার নিতে হবে।

আমি তো এ প্রস্তাবে স্তম্ভিত। শনিবারের চিঠি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে উত্তেজনা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা কি আমি বজায় রাখতে পারব? সম্পূর্ণ একার চেষ্টায়? সজনীকান্ত বললেন কোনো চিন্তা নেই, সবাই সাহায্য করবে। যেদিন প্রস্তাব তার পর দিন থেকেই কাজে লেগে গেলাম। ১৩৩৯ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রথম আমার নাম ছাপা হ'ল সম্পাদকরূপে। সজনীকান্ত সেই সংখ্যায় আপন স্বাক্ষরে আমাকে পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কাজের সুবিধার জন্য আমি হ্যারিসন রোড থেকে উঠে এলাম শনিবারের চিঠির অফিস বাড়িতে, ৫-সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে। জায়গাটা মানিকতলা ব্রিজের কাছে। আমার সহকারী রইলেন শ্রীপ্রবোধ নান। তিনি শনিবারের চিঠির হিসেবও রাখতেন এবং কৌতুক গল্প লিখতেন।

পৌষ ১৩৩৯ সংখ্যা শনিবারের চিঠি হচ্ছে পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা। তখন আশ্বিন থেকে বর্ষারম্ভ ছিল এ কাগজের। এই সংখ্যার সূচিপত্রটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

(১) নিবেদন—সজনীকান্ত দাস, (২) ডায়েরী—শ্রীমতী সত্যবাণী দেবী, (৩) বিবাহচ্ছেদ—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিপ্রিয় বসু, (৪) রূপজীবিনী—শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী, (৫) আর এক দিক (উপন্যাস)

—শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন, (৬) মনজুয়ান—স্কট টমসন (শ্রীপ্রমথনাথ বিশী), (৭) অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ—শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার, (৮) পাঁচ পৃষ্ঠা কার্টুন ছবি—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, (৯) ঘৃতকুম্ভ (দ্বিতীয় পর্ব)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (১০) নৌকা-খণ্ড (ব্যঙ্গ গল্প)—পরিমল গোস্বামী, (১১) সংবাদ সাহিত্য—শ্রীসজনীকান্ত দাস ও পরিমল গোস্বামী।

প্রমথনাথ বিশী 'মনজুয়ান' পর্যায়ের ব্যঙ্গ কবিতায় ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন 'স্কট টমসন'। প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী 'প্রচল' ছিলেন।

তখন কাগজ ছাপতে খরচ বেশি হ'ত না। দুটাকা চার আনা রীমের কাগজ ব্যবহৃত হ'ত। ঘরে কম্পোজ করা প্রতি ফর্মা চার টাকা এবং বাইরের প্রেস থেকে ছাপা খরচ প্রতি ফর্মা (১০০০) দেড় টাকা। শনিবারের চিঠি তখন ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠার ফর্মায় সম্পূর্ণ হ'ত।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট থেকে নিকটতম ট্রাম লাইন হচ্ছে পুরো দশ মিনিট হাঁটা পথের দূরত্বে—কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। সার্কুলার রোডে তখন ট্রাম ছিল না, বাসের যে ব্যবস্থা ছিল তা অত্যন্ত বিরক্তিকর। সে জন্য রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে বড় আড্ডা কিছু জমত না। মাঝে মাঝে জমত। আসল আড্ডা জমতে আরম্ভ করল ধর্মতলা স্ট্রীটে, বঙ্গশ্রী অফিসে। সার্কুলার রোডে বাস্ থাকা সত্ত্বেও আমার পক্ষে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে এসে ট্রামে যাতায়াত সুবিধাজনক মনে হ'ত। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট থেকে সুকিয়া স্ট্রীট ধ'রে সার্কুলার রোড পার হয়ে খালধারে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট পর্যন্ত রিকসা ভাড়া তখন ছিল চার পয়সা। বঙ্গশ্রী অফিস থেকে ফেরবার পথে অধিকাংশ দিনই রিকশায় যেতাম, এতে মোটের উপর খরচ বেশি হ'ত, তবু তখনকার দিনে বাসে চলা আমার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর বোধ হ'ত।

পৌষ মাসে শনিবারের চিঠির সম্পাদনা ভার নিলাম। আমার বড় সহায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। দিন পনেরো পরে রংপুর গেলেন তিনি, তার পর পৌষ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরেই (মাসের শেষে প্রকাশিত হ'ত), একখানা পোস্টকার্ড তাঁর মৃত্যু সংবাদ বহন ক'রে আনল। সেটি সম্ভবত মাঘ মাস। এ রকম জ্বলজ্যান্ত একটি মানুষ, যাঁর ভবিষ্যৎ সবেমাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁর এই হঠাৎ মৃত্যু আমাদের সবারই মনে একটা গভীর বিষণ্ণতার ছায়াপাত করল।

রংপুর যাবার আগে, আমি তখন ট্রামে, তিনি নিচে থেকে চেঁচিয়ে বলছেন, কোনো চিন্তা করিস না, ঘৃতকুম্ভের কিস্তি আমি ঠিক সময়ে তোকে দেব। সে ধ্বনি এখনও কানে বাজে। 'ঘৃতকুম্ভ' নামক একটি উপন্যাস তিনি ধারাবাহিকভাবে শনিবারের চিঠিতে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

পরবর্তী মাঘ মাসের শনিবারের চিঠিতে প্রথম পাতায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলাম, এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম আগামী ফাল্গুন সংখ্যা রবীন্দ্রসংখ্যা রূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

মৃত্যু সম্পর্কে বার বার আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। মাঘ মাসের (১৩৩৯) শনিবারের চিঠির প্রসঙ্গকথা লিখতে গিয়ে দেখি প্রসঙ্গত মৃত্যুর কথা এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মৃত্যুর আভাস জেগেছিল কি মনে?

আমি লিখেছিলাম—

"...মানুষ শ্রদ্ধা করিয়া যাহা বাঁচাইয়া রাখে তাহাই বাঁচে—কেননা মিউজীয়াম গড়িয়া তাহাতে যাবতীয় মৃতবস্তুকে রক্ষা করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। বিশ্বস্রষ্টা নিজেই তাঁহার সকল সৃষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ব্যগ্র নহেন। তাহা যদি হইত তাহা হইলে সৃষ্টির ধারা শুদ্ধ হইয়া থাকিত—নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন হইত না। সুতরাং মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল।...... কিংবা হয় তো বাস্তবিক মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, সৃষ্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশকেই আমরা মৃত্যুরূপে দেখি।......সৃষ্টির দৃশ্য অংশ যেটাকে আমরা জীবন বলি, তাহারই ধারা প্রবহমান রাখিবার জন্য জীবনের আকুলতা।......(মাঘ, ১৩৩৯, পৃঃ ৫৮১)।

এই সংখ্যাতেই সজনীকান্ত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে "রবীন্দ্রনাথ মৈত্র" শিরোনামায় সাড়ে চার পৃষ্ঠাব্যাপী এক কবিতা লিখলেন। কবিতাটিতে মনের বেদনার চমৎকার প্রকাশ আছে।

..."বন্ধু বন্ধু মোর—
কোথা তব মুখ, কোথা বাণী তব, বজ্রকঠিন বাণী,
থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধ আবেগে ভাব গদগদ ভাষা,
অশ্রুজড়িত চাপা কণ্ঠের স্বর—
তোমার আঁখির নীল
আয়ত চক্ষে বুকের নীলাভ জ্বালা,
কোথায় বন্ধু অবিন্যস্ত মাথার বিরল কেশ
দেখিতে যে নাহি পাই—
মৃত্যুর কালো ছায়া
এত কি নিরেট নিবিড় অন্ধকার!"........

প্রতিশ্রুত রবীন্দ্র মৈত্র সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হ'ল। ফাল্গুন সংখ্যা। এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র সম্পর্কে লিখলেন—মোহিতলাল মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র), সজনীকান্ত দাস, কৃষ্ণধন দে, ও আমি।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাড়িতে আড্ডা না জমার কারণ আগেই বলেছি—বঙ্গশ্রীর অষ্টপ্রাহরিক আড্ডা। অগত্যা আমাকেই সেখানে যেতে হ'ত প্রতিদিন বিকেলের দিকে।—একটা-দুটোর সময় থেকেই ভিড় আরম্ভ হয়ে যেত।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে থাকতে একটি অদ্ভুত চরিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়, এঁর নাম নিখিলচন্দ্র দাস। পূর্ববর্ণিত কয়েকটি অদ্ভুত চরিত্রের মতো এ চরিত্রেরও অনুকরণ হয় না, এবং আমার বিশ্বাস সংসারে এর আর দ্বিতীয় নেই।

আমার বোন মঞ্জু, নিখিলচন্দ্রের মেয়ে বিজয়ার সঙ্গে একত্র পড়ত তখন ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে। মঞ্জু মাঝে মাঝে বিজয়ার সঙ্গে তাদের বাড়িতে যেত, আমি তাকে আনতে যেতাম। এই উপলক্ষে নিখিলবাবুর সার্কুলার রোডের বাড়িতে গিয়েছিলাম দু একবার।

নিখিলবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। এমন গম্ভীর লোক সহজে দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে ব্যায়ামের জন্য দুএকটি রিং ঝুলছে। ডেস্কে কয়েকখানি ইংরেজী বই। শুনলাম কারলাইলের ভক্ত। এ রকম গম্ভীর লোকের সঙ্গে আমিও যথাসাধ্য গাম্ভীর্য বজায় রেখে কথা বলেছি। ভেসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিকে নিরাপদ মনে ক'রে পম্পেই শহরের লোকেরা যেমন তাকে সামনে নিয়ে বাস করত, নিরাপদ মনে ক'রে নিখিলবাবুকে সামনে নিয়ে আমিও তেমনি কয়েক দিনের কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি। অবশেষে একদিন হঠাৎ আপাত-নিরাপদ আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হ'ল। কি ক'রে হ'ল তা পরে বলছি। কারণ আগে আর একটি ঘটনা বলা দরকার। এটি হবে তার ভূমিকা। আসল চরিত্রটি পরে উদ্‌ঘাটিত হবে।

১৯৩৩ সালের প্রথম দিকেই আমি হঠাৎ গলার অসুখে বিব্রত হয়ে পড়লাম। গলার ভিতরে হ'ল দানাদার ফ্যারিঞ্জাইটিস, সঙ্গে জ্বর, কিছুতে

তাকে দমন করা সম্ভব হ'ল না। বলাইকে আগেই চিঠি দিয়েছিলাম, সে বলল চ'লে এসো ভাগলপুরে। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট থেকে ভাগলপুর এক রাত্রির পথ। ট্রেন দেরিতে যাওয়াতে কিঞ্চিৎ বেলা হয়ে গিয়েছিল পৌঁছতে। গায়ে জ্বর ছিল ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের উপরে।

আমার সঙ্গে একখানি প্রেসক্রিপশন ছিল, সেই ওষুধই খাচ্ছিলাম। বলাই সেখানা দেখে হাসতে লাগল। বলল ওতে কিছুই হবে না, এখানে আমার মতে চলতে হবে।

বলাই তখন ওখানে নতুন ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছে, একখানা ভাড়া বাড়িতে থাকে, তারই একটি ঘরে ল্যাবরেটরি। আমার উপর আদেশ হ'ল ওষুধ খেতে পাবে না, স্নান ক'রে প্রচুর মাংস দিয়ে ভাত খাও, আমি দায়ী রইলাম তোমার স্বাস্থ্যের জন্য।

এতটা জ্বরে—আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বলাই সীরিয়াস। সে আমার কোনো কথা কানেই তুলল না, সে আমার চিকিৎসা সম্পর্কে অটোক্র্যাটের ভূমিকা গ্রহণ করল।

আমি তখন সিগারেট খেতাম, বলাইয়ের আদেশে সেটি সেই দিনই বন্ধ করতে হ'ল। তারপর থেকে চলল আমার চিকিৎসা, অর্থাৎ প্রচুর খাওয়া এবং ঘুমনো। পনেরো দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য ফিরে গেল, তখন আমাকে ক্যালসিয়াম ব্রোমাইড ইন্ট্রাভিনাস্ ইনজেকশন দিতে লাগল সপ্তাহে ৩টে। মোট ৭টি নিয়েছিলাম। এক মাসে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। যখন কলকাতা ফিরে আসার অনুমতি পাওয়া গেল, তখন বলাই বলল "এবারে সিগারেট খাও।" আমি বললাম, "আর খাব না, খাবার ইচ্ছেও নেই আর।" বলাই বলল, "সে কি হয়,—এই নাও", ব'লে একটি সিগারেট ধরিয়ে দিল। ছেড়ে দেওয়া স্থির ক'রে ফেলে-ছিলাম মনে মনে। সুবিধে হবে বিবেচনায় বরারিতে পালিয়ে গেলাম। বরারি ভাগলপুরের মধ্যেই, গঙ্গার ধারে। সেখানে হাসপাতালে বলাইয়ের ভাই ভোলানাথ ডাক্তার। সে সবটা কাহিনী গম্ভীর ভাবে শুনে উৎকৃষ্ট তামাক সেজে গড়গড়ার নলটি আমার মুখে লাগিয়ে দিল।

তৃতীয় পর্ব

চতুর্থ চিত্র

ভাগলপুরে বলাইচাঁদের বাড়িতে যে ঘরে ল্যাবরেটরি ছিল, তারই পাশে রোগীদের বসবার জায়গা। দেহ-নিষ্কাশিত বস্তু সমূহের পরীক্ষা তখন ভাগলপুরে সম্ভবত একমাত্র এখানেই হ'ত।

এক দিন রাত্রে এক শীর্ণ বৃদ্ধ এসে হাজির। সে এসেছে পাড়াগাঁ থেকে, যক্ষ্মায় ভুগছে সন্দেহে কোনো ডাক্তার তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বলাই তার থুথু সংগ্রহ ক'রে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'ল। রোগীর আর সে রাত্রে ফিরে যাবার কোনো উপায় রইল না, সেইখানেই শুয়ে রইল। ভীষণ কাসছিল রোগী। সমস্ত রাত ধ'রেই কেসেছে সেই ছোট্ট ঘরখানায়। বলাই রাত্রেই তার থুথু পরীক্ষা করল এবং রিপোর্ট লিখে রাখল। স্পিউটামে অসংখ্য যক্ষ্মা জীবাণু। বলাই আমাকে সেই স্লাইড দেখাল মাইক্রোস্কোপে। নীল পটে লাল জীবাণু—এত, যে গোনা যায় না। বীক্ষণক্ষেত্রের স্তর বদলালেও তেমনি অসংখ্য জীবাণু। এটি কি ভাবে স্লাইড প্রস্তুত করতে হয়, তা সে আমাকে আগেই শিখিয়েছিল, এবং শুধু এটির নয়, তার দেখা যাবতীয় জীবাণু, আমাকে দেখাত এবং বুঝিয়ে দিত। বিভিন্ন জাতের ম্যালেরিয়ার জীবাণু, স্ট্রেপটোককাস, স্ট্যাফাইলোককাস, এবং দুচার রকম জীবন্ত জীবাণু—ফাইলেরিয়া সহ। উপরন্তু রক্তপরীক্ষার যাবতীয় অঙ্গগুলি সে দেখিয়েছিল আমাকে। প্রতিদিন এ সব দেখে দেখে এ বিষয়ে পূর্ব কৌতূহল আমার আরও বেড়ে গিয়েছিল। দেখাবার উৎসাহ বলাইয়ের খুব বেশি ছিল।

নিজে যা দেখেছি, জেনেছি বা উপলব্ধি করেছি—তার বিস্ময় অন্যের মনে সঞ্চার করার প্রবৃত্তি থেকেই তো সাহিত্যের জন্ম। বিস্ময় যখন মনের আধার ছাপিয়ে যায়, তখন তা অন্যের মনে কমিউনিকেট না করা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই—এটাই হল সাহিত্য-সর্জনের মূল কথা। আমাদের দেশের যারা বড় বড় বিজ্ঞানী, তাঁদের মনে বিশ্বরহস্য খুব যে বিস্ময় জাগায় তা মনে

হয় না. কারণ তাদের বিস্ময় সাধারণ পাঠকের কাছে পৌছে দেবার ইচ্ছা তাঁদের জাগে না। এ প্রবৃত্তি শুধু ইউরোপের বড় বড় বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায়, এবং তাঁরা নিজেরা সবজনপাঠ্য বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা করেন, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা রস সাহিত্যের সীমানায় পৌছয়।

গ্রাম থেকে আগত সেই বৃদ্ধের স্পিউটামের স্লাইড দেখে আমি স্তম্ভিত এবং কিঞ্চিৎ আতঙ্কগ্রস্তও। স্লাইড থেকে আমার দৃষ্টি ফিরল পাশের ঘরখানায়। স্পষ্ট দেখলাম কোটি কোটি যক্ষ্মাজীবাণুতে সে ঘর ভরে উঠেছে, এবং আমি তার পাশেই ব'সে আছি।

ল্যাবরেটরির সংলগ্ন সে ঘর, মাঝখানে কোনো পার্টিশন নেই। এর পর যে ঘটনাটি ঘটল তাতে আমি প্রায় শিউরে উঠলাম।

বৃদ্ধ রোগিটি সকালে রিপোর্ট নিয়ে চ'লে যাবার একটু পরেই বলাইয়ের শিশুপুত্র (অসীম)-কে দেখি সেই ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে! আমি বলাইয়ের এই উদাসীনতায় তাকে কিছু তিরস্কার করলাম।

বলাই নির্বিকার। বলল, তাতে আর কি হয়েছে।

অবশেষে এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা শুনতে হ'ল। শুনলাম আমরা সর্বদা সব রকম জীবাণুর ভিতর বাস করছি, ওদের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই, কিন্তু কার পক্ষে কোন্ জীবাণু কখন ক্ষতিকর হয়ে উঠবে তা আমরা কেউ জানি না। অতএব অযথা দুশ্চিন্তা না ক'রে আর এক কাপ চা খাও।

শিশু-অসীম মনের আনন্দে তখনও সে ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

বলাইয়ের দীর্ঘ বক্তৃতায় যুক্তির ভুল ছিল না কিছু। বেশ ভালই লাগল এ বিষয়ে নতুন দৃষ্টি লাভ ক'রে। কিন্তু তবু যে যক্ষ্মা রোগী সে ঘরে সমস্ত রাত লক্ষ লক্ষ জীবাণু ছড়িয়ে গেছে, সে ঘরে আপন শিশুসন্তানকে হামাগুড়ি দিতে দেখেও আপন মতে এতখানি নির্ভরশীল হওয়া কি সম্ভব? এ প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল। কিন্তু বলাই সে কথা আমলই দিতে চায় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি তার বিশ্বাসের সঙ্গে তার ব্যবহারের কোনো বিরোধ নেই।

এখানে শুধু একটি কথা বলা দরকার যে যে-শিশুকে সে দিন যক্ষ্মা জীবাণুর অরণ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে দেখে ভয় পেয়েছিলাম, সে

কিছুকাল হ'ল মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট হয়েছে, এবং হয় তো ভবিষ্যতে কোনো দিন সে সেই যক্ষ্মারোগীর ছেলের স্পিউটাম নিয়ে মাইক্রোস্কোপে বসবে।

ভাগলপুরে থাকতে আর একটি রসিক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তখন। তাঁর নাম আশুদে। প্রায় তখন থেকেই অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর কৌতুক রচনা প'ড়ে আসছি নিয়মিত। আশুদের নাম ও পদবী তিনি নিজেই জুড়ে Asude হয়েছেন, বাংলাতে আমিও দুটি জুড়ে দিচ্ছি, এবং স্বীকার করছি কৌতুক সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি নেই। লেখাতে আজও তিনি সমান সরস এবং সজীব। তাঁব কাহিনীগুলি তাঁর নিজস্ব বর্ণনা-ভঙ্গিতে না শুনলে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। বর্ণনা সহ কাহিনীগুলি সবই ত্রিমাত্রিক বা থার্ড ডাইমেনশন যুক্ত। তিনি যখন বলতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর চুল থেকে (মাথায় সামান্য যে কগাছা আছে তা থেকেই) পায়ের নখ পর্যন্ত সমগ্র দেহটা কৌতুক সৃষ্টিতে যোগ দেয়। তদুপরি তাঁর কণ্ঠ! বয়স ষাট থেকে নব্বুইয়ের মধ্যে ঠিক কোন্ বিন্দুতে এসে থেমেছে, চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

তাঁর কণ্ঠ কৌতুকের আবহ সৃষ্টিতে অতুলনীয়। যেন এঁর জীবনটাই কৌতুক, অবশ্য যে জীবনটা চাঁদের আলোকিত দিকটির মতো সর্বদা আমাদের দিকে মেলে ধরেছেন। দুঃখের কথা তাঁর মুখে শুনিনি। সম্ভবত তাঁর গলনালিতে এমন কোনো মুষল আছে যার আঘাতে নিষ্ক্রমণের পথে সকল দুঃখ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে কৌতুকহাস্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ভাগলপুরে আসার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় এবং যতবার সেখানে গিয়েছি, আশুদে-হীন দিন একটিও কাটেনি। এক সঙ্গে দুচার ঘণ্টা তিনি বিরামহীনভাবে আসর জমিয়ে রাখতে পারেন। ইংরেজী বাংলা দুইই সমান চলে, উপরন্তু হিন্দি তো আছেই। এ রকম উত্তেজক এবং মনোহর কৌতুক সৃষ্টি দুর্লভ। এ কথা আমি যন্ত্রে মেপে বলছি।

হিউমার মাপা কোনো যন্ত্র নেই, মনে হ'তে পারে অনেকের। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। যন্ত্র আছে।

দুজন জার্মান পদার্থবিৎ, গাইগার ও ম্যুলার, এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তা দিয়ে কোনো জিনিসে কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা আছে তা মাপা যায়। যন্ত্রটি 'গাইগার কাউন্টার' নামে খ্যাত। হিউমার মাপেরও তেমনি একটি

জীবন্ত যন্ত্র আমি ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে আবিষ্কার করেছি। ইতিপূর্বে আমি এই মানবিক যন্ত্র নিখিলচন্দ্র দাস সম্পর্কেই কিছু আভাস দিয়েছিলাম।

এই যন্ত্র দিয়ে কলকাতায় ব'সে আশুদের হিউমারও মাপা হয়েছে একাধিকবার। জানতে পারা গেছে এ যন্ত্রের উপর আশুদের হিউমারের প্রতিক্রিয়া এমন মারাত্মক যে তার কাছাকাছি এলে যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। যন্ত্রের কাঁটার বদলে সমগ্র যন্ত্রটি লাফাতে থাকে এবং তা ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। জ্বর মাপা যন্ত্রের পারা যেমন অতি-উত্তাপে যন্ত্রের মাথা ভেদ ক'রে বেরিয়ে যায়, এও ঠিক তেমনি।

আশুদের কুলকুচিবাবু, শূটার শশী, প্রভৃতি গল্প সেই সময় শুনেছিলাম। সে সব গল্পের প্লট প্রকাশ ক'রে লাভ নেই, গানের সুরটাই যেখানে গানের পরিচয়, সেখানে গানের কথাগুলো আবৃত্তি ক'রে কিছুই বোঝানো যায় না। মনে রাখতে হবে আশুদে অভিনয় বিদ্যায় পাকা, এবং তিনি প্রসিদ্ধ ম্যাজিশিয়ান।

১৯৩৩ সালের কথা বলছিলাম। কিন্তু এবারের আসার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথম উদ্দেশ্য আগেই বলেছি—প্রাণরক্ষা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মান রক্ষা। বলাইয়ের রচনা শনিবারের চিঠিতে আমি ছাপব, এই আমার ইচ্ছা। তার কৌতুক সৃষ্টির ক্ষমতার সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম, তাই আমি জানতাম তাকে দিয়ে লেখাতে পারলে তা পাঠকদের বিশেষ উপভোগ্য হবে, আমিও তৃপ্ত হব।

কিন্তু বলাই অনেকদিন লেখা ছেড়ে দিয়েছে, তার ভিতরকার লেখকটি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ ক'রে মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে। সুদীর্ঘ আট বছর ধ'রে প'ড়ে আছে। অতএব এবারে ডাক্তারির পালা আমার। আমি ধীরে ধীরে মূর্ছিত লেখকটির গুপ্তাবাসে ঢুকে তার হৃদ্‌যন্ত্রে মাসাজ করতে আরম্ভ করলাম। যন্ত্র চাঙ্গা হয়ে উঠল।

নির্ঝরের দ্বিতীয়বার স্বপ্নভঙ্গ! লেখা বেরোতে লাগল উন্মত্ত স্রোতের মতো।

শুধু আমার স্বাস্থ্য ভাল করা নয়, বলাই নিজেও তখন স্বাস্থ্য চর্চা করছিল প্রাতর্ভ্রমণ ক'রে। বলাইয়ের "প্রাতঃ" প্রায় ইংরেজী মতের প্রাতঃ। ভোর ৩।-৪টেই উঠে পড়ত। বলাই তার স্ত্রীসহ বেরোবে

আমারও এতে কল্যাণ হবে, শুনলাম। দু তিন দিন গিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে। বেশ কিছুদূর হেঁটে আমরা ক্লান্ত হয়ে গিয়ে পৌছতাম বলাইয়ের বন্ধু শ্রীপাঁচুগোপাল সেনের বাড়িতে। (হয় তো বা ক্লান্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেই যাওয়া হত!) তিনি ভাগলপুর জেলের বয়ন শিক্ষক ছিলেন। মার্কিন মুলুক থেকে তিনি বয়ন বিদ্যায় পক্কতা অর্জন ক'রে এসেছিলেন। প্রাণখোলা মানুষ। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী উষালতিকা সেন আতিথেয়তায় ছিলেন মুক্ত হস্ত। তিনি যত্ন ক'রে উৎকৃষ্ট চা এবং তার অনুষঙ্গ রূপে মাখন টোস্ট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে এনে আমাদের প্রলুব্ধ করতেন। বিলিতি ভঙ্গিতে খাঁটি ভারতীয় আতিথেয়তা, যেন তাঁরাই ধন্য হচ্ছেন এই রকম ভাব। কে ধন্য হচ্ছিল তা মনে মনেই রয়ে গেল। শ্রীমতী উষালতিকা সেন বর্তমানে কলকাতা লেক টেরেসে অবস্থিত চিলড্রেনস কর্নারের রেক্টেস। এটি তাঁর সাধনার ক্ষেত্র।

ভাগলপুরে এদের কথা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে সম্ভবত এই কারণে যে আমি জীবনে ঐ একবারই মাত্র জেলে গিয়েছি। তা ভিন্ন এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে এঁরা যে মাখন খাইয়েছিলেন তার সঙ্গে কৌশলে কিছু নুনও খাইয়েছিলেন।

ভাগলপুরের জলকলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিজয়রত্ন বসু আর একটি মনোহর চরিত্র। তিনি আমাদের বিজয়দা। কোনো অতিথি অভ্যাগত বা বন্ধু তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি তাঁকে কি ভাবে পরিচর্যা করবেন তার জন্য—আমাদের সকল পরিচিত মাত্রার অনেক বেশি—অস্থির হয়ে ওঠেন। ভীষণ ব্যস্তসমস্ত ভাব। মনে হয় ব্যস্ত হয়ে ওঠাই তাঁর সর্বপ্রধান কাজ। বহু ব্যস্ততায় ফলে অনেক সময় ক্রিয়া লঘু হয়—বহু আরম্ভের মতোই, কিন্তু বিজয়দার তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি ব্যস্ত হ'তে পারলেই খুশি। নিজহাতে কাউকে কিছু করতে দেবেন না, করতে গেলে ছুটে গিয়ে নিজে ক'রে দেন। ভোলানাথের (বলাইয়ের ভাই, বরারী হাসপাতালের ডাক্তার)—কাছে শুনেছি বিজয়দার এক অতিথি স্নানের সময় হ'লে বলেছিলেন, "এবারে স্নান ক'রে আসি?" কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বিজয়দা অভ্যাসবশত হঠাৎ ব'লে ফেলেছিলেন—"না, না, আপনি কেন করবেন, আমি করছি।" এঁর সঙ্গে সবার বন্ধুত্ব। সর্বদা অন্যের জন্য কিছু ক'রে দেওয়ার সদিচ্ছা এর সমস্ত স্নায়ুতে ডাইনামো চালাচ্ছে।

বলাইয়ের অনেকগুলো লেখা নিয়ে ভাগলপুর থেকে বিদায় নিলাম। বনফুলের স্বাক্ষরে প্রথম লেখা বেরলো বৈশাখ (১৩৪০) সংখ্যায়, নাম "ভাদুড়ি"; আরও একটি, নাম "আশাহতা," কিন্তু এটি অস্বাক্ষরিত। এর পর থেকে প্রতিমাসে স্বনামে বেনামে গদ্য এবং পদ্য দুইই বেরোতে লাগল। ১৩৪০ এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হ'ল "জনপ্রিয় জনার্দন"। এ জাতীয় লেখাগুলি সবই ছোট গল্প বা নক্সা, ছন্দে লেখা।

জনার্দন একটি স্কুলের ছেলে। তার দুটি পৃথক জীবন—একটি পাবলিক ও অন্যটি প্রাইভেট। প্রাইভেটটি শেষ অধ্যায়ে উদ্ঘাটিত। সে পাড়ার সবার কাজে লাগে, তাকে না হ'লে কারোই চলে না। ছেলেটিও পরোপকারের জন্য সদা প্রস্তুত। ইঙ্গিত পাবামাত্র ছুটে যায়। কিন্তু তার বাড়িতে তার বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কটি খুব মধুর নয়। শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে তার বাবা তার পিঠে ক্রমাগত জুতো মারছেন আর উত্তেজিতভাবে নানা প্রশ্ন ক'রে চলেছেন—কতবার আর সে ম্যাট্রিক ফেল করবে, তার জুলফি এত লম্বা কেন, ইত্যাদি। অতঃপর নৈতিক শাসন চরমে উঠল, তিনি পুত্রের পশ্চাদ্দেশে লাথি মারতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোমর ভাঙার উদ্দেশ্যে শেষ লাথিটি উদ্যত করতেই জনার্দন স্কিপ ক'রে সার্কাসি কায়দায় তার বাবাকে স্যালিউট ক'রে পালিয়ে গেল।

এই হল জনার্দনের প্রাইভেট লাইফ।

মোট কাহিনীটির বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন ছন্দে লেখা, কৌতুকরসে থল-থল করছে। আবৃত্তির পক্ষে লোভনীয়রূপে সুন্দর।

এ সম্পর্কে এতটা লেখার উদ্দেশ্য এই যে এই কাহিনীটি উপলক্ষ ক'রেই হিউমার মাপা মানবীয় যন্ত্র আমি প্রথম আবিষ্কার করি। এমন জীবন্ত 'হিউমার কাউণ্টার' পৃথিবীতে আর নেই।

অত্যন্ত গম্ভীর, কাঁচাপাকাচুল, কারলাইল ভক্ত নিখিলচন্দ্র দাস ছিলেন এক মার্কিন পুস্তকব্যবসায়ীর প্রতিনিধি।

১৩৪০এর অগ্রহায়ণ মাস, ইংরেজী ১৯৩৩, নভেম্বর। অল্প পরিচিত নিখিলবাবু আমার কাছে এসেছিলেন এক দিন। নানা বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল, কারলাইল সম্পর্কেই বেশি। প্রসঙ্গত বনফুলের কথা উঠল। জনপ্রিয় জনার্দন কবিতাটি আমার হাতে ছিল, সেটি তাঁকে পড়ে শোনালাম।

শুনতে শুনতে তিনি অস্থিরভাবে হাসতে লাগলেন, এক একবার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলেন উত্তেজিত ভাবে। তার পর শেষ কটি লাইন পড়ার সময় নিজেকে আর কোনো দিকেই ধ'রে রাখতে পারলেন না, হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াতে লাগলেন।

পড়েছিলাম একটু থিয়েটারি ভঙ্গিতে।

আমার চোখে এ এক অভিনব দৃশ্য। যাঁকে কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত ঘোর দার্শনিক মনে ক'রে খুব ভেবে ভেবে কথা বলেছি, তাঁর এ কি মূর্তি! হাস্যরস যে কারো দেহে মনে এমন ক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু দেখেশুনে হিউমারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা এবং আমার নিজের সম্পর্কে আশঙ্কা জেগে উঠল আমার মনে।

নিখিলবাবু হাসছেন আর মেঝেতে গড়াচ্ছেন, আর সেই সঙ্গে গড়াচ্ছেন টমাস কারলাইল, আর গড়াচ্ছে তাঁর "সারটর রিসারটাস," "হীরোস অ্যাণ্ড হীরো ওয়ারশিপ," "ফ্রেঞ্চ রিভোল্যুশন," "পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট" ইত্যাদির তত্ত্বে পুষ্ট একটি মগজ। স্বয়ং টমাস কারলাইলকে আমার সামনে হাসতে হাসতে গড়াতে দেখলে বিস্ময়ে যে পরিমাণ চমকে উঠতাম, তাঁর ভক্তকে দেখেও সেই পরিমাণ চমকিত হলাম।

আমিও গম্ভীর হয়ে থাকিনি।

পরদিন নিখিলবাবু আবার আমার কাছে এসেই বললেন "ঐ কবিতাটার শেষ কটা লাইন আবার পড়ুন তো।" আমি সবটা কাহিনীই আবার পড়লাম।

কারলাইল পুনরায় ধূলি ধূসরিত হলেন।

গত ২৫ বছরে নিখিলবাবুর উপর হিউমারের প্রতিক্রিয়ার একটি সুস্পষ্ট বিবর্তন ঘটেছে।

প্রথমে ছিল শুধু মাটিতে গড়ানো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হাসতে হাসতে পাশের লোককে মারা।

তৃতীয় পর্যায়ে টেবিল চেয়ার ওল্টানো এবং সম্ভব হ'লে ভেঙে ফেলা।

চতুর্থ পর্যায়ে নখ এবং দাঁতের ব্যবহার।

পঞ্চম পর্যায়ে নিজেকে আহত করা। কোনোটা বাদ দিয়ে নয়; পরবর্তী পর্যায়গুলি পরপর যোগ করা হয়েছে প্রথমটির সঙ্গে। সমালোচনা সাহিত্যের ভাষায় বলা যায় হিউমার-জাত মার-বিদ্যায় এগুলো অতি মূল্যবান সংযোজন।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে যখন শনিবারের চিঠির অফিস ছিল তখন থেকে এর আরম্ভ: বলা বাহুল্য নিখিলবাবুকে মেঝেতে গড়াতে দেখে আমিও খুব হেসেছিলাম। আমাকে হাসতে দেখলেন নিখিলবাবু পর পর দু দিন।

তৃতীয় দিনে আমার গায়ে হাত তুললেন।

দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি তাঁর এই প্রতিক্রিয়া-বিবর্তনের। ১৩৪০-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা শনিবারের চিঠি নতুন ঠিকানা ২৫.২ মোহনবাগান রো থেকে প্রকাশিত হ'তে থাকে। জায়গাটি ট্রাম ও বাস লাইনের কাছে হওয়াতে সকালের দিকে এখানে বেশ বড় আড্ডা জমত। রবিবারে সে আড্ডা অনেক সময় ঘর ছাপিয়ে যেত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুশীলকুমার দে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল হোম, প্রমথনাথ বিশী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী, কৃষ্ণধন দে প্রভৃতিতে ছোট্ট ঘরখানা ভ'রে উঠত। উৎসাহ অফুরন্ত, সাহিত্য শিল্প রাজনীতি সমাজনীতি বেপরোয়া আলোচনা চলছে। মোহিতলাল মজুমদার এলে তাঁর কাব্যপাঠে সবটা সময় কেটে যেত অনেক দিন। শৈলজানন্দের অনুচর সুবল মুখোপাধ্যায় ভাল পড়তে পারত, কণ্ঠ-শ্রমটা তার উপর দিয়েই যেত অনেক সময়। কীর্তি মিত্র লেনের বাড়ি থেকে আসা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কেও দেখা যেত কদাচিৎ। শনিবারে ব্রজেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এলে সেদিন বাক্‌স্বাধীনতার অনুমতি চেয়ে নিতেন হাসতে হাসতে। বলতেন আজ শনিবার, অতএব—

আশুদে কলকাতা এলে আমার কাছে আসতেন, শনিবারের চিঠিতে তাঁর অনেক লেখা আমি ছেপেছি। আশুদে যেখানে উপস্থিত সেখানে একমাত্র বক্তা তিনিই, নতুন ধরনের আবহ সৃষ্টিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য সর্বগ্রাসী। একদিন আশুদের সঙ্গে নিখিলবাবুর দেখা হয়ে গেল এখানে। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দশ সেকেণ্ডের মধ্যে এক বিপর্যয় কাণ্ড! পুরো দু ঘণ্টা ধ'রে কি ধস্তাধস্তি! আশুদের হাসাবার ক্ষমতা এবং নিখিলবাবুর হাসবার ক্ষমতা—এ দুইয়েরই পরিচয় দিয়েছি। সহজেই বোঝা উচিত এই দুজনের অপরিচয়ের বাধা দূর হ'তে এক মিনিটও লাগা উচিত নয়। লাগেও নি। মুহূর্তে পূর্ব-অপরিচয়ের সকল সঙ্কোচ ঘুচে উভয়ের মধ্যে একটা গভীর

আত্মিক যোগাযোগ ঘটে গেল। যেন দুজনে কতকালের প্রাণের বন্ধু। দুঘণ্টা ধ'রে নিখিলবাবু নামক একটি দুর্দান্ত বনভ্যালসিভ র‍্যাশন্যাল অ্যানিম্যালকে সামলাতে হ'ল উপস্থিত সবার সমবেত চেষ্টায়। দুজন দুদিকে ব'সে তাঁর দুটি হাত টেনে বগলদাবা ক'রে ধ'রে রইলেন। দুটি প্রবলতর ম্যানপাওয়ার আবদ্ধ হয়ে রইল ঐ কাজে। নিখিলবাবু অগত্যা দুটি পা ছুঁড়তে লাগলেন শূন্যে, খুবসম্ভব পা দুটো যেন তাঁর মোটরের দশগুণ বেগে দুটি শেলাইয়ের কলের দ্রুত [illegible] করছে।

থিয়েটারে ব'সে একদিন এই রকম হয়েছিল। প্রমথনাথ বিশীর ঋণংকৃত্বা হচ্ছিল, সমস্ত ক্ষণ প্রেমশচন্দ্র [illegible] ও আমি তাঁর দুখানা হাত দুধার থেকে বগলদাবা ক'রে টেনে ধ'রে রেখেছিলাম। কিন্তু পা দুখানাকে ঠেকাতে পারিনি। সে সময়ে মনে হয়েছিল যেন একটা শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ব্যাটারি তাঁর কোমরে বাঁধা আছে মাদুলির মতো, সেই ব্যাটারির দুদিক থেকে তার বেরিয়ে মোজার নিচে দিয়ে [illegible] ঢুকেছে। দুখানা হাত চেপে ধরলে তা স্বয়ংক্রিয় ভাবে 'সুইচ-অন' হয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্যালভ্যানি আর ব্যাঙের পায়ের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা মনে পড়ে।

ছোট একখানা অস্টিন গাড়ি ছিল নিখিলবাবুর। তিনি নিজেই চালাতেন। সেই গাড়িতে, চলন্ত অবস্থায় স্টিয়ারিং ছেড়ে পাশে-বসা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ডানহাত খানা হঠাৎ তুলে নিয়ে দুহাতে ধ'রে যেমন ক'রে লোকে ভুট্টা খায়, তেমনি ক'রে একদিন কামড়াতে লাগলেন। কারণ আমি পিছনের আসনে ব'সে সামান্য একটি হাসির কথা বলেছিলাম। স্টিয়ারিং ছেড়ে চলতি গাড়িতে হাসা ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়ার বিপদ বোধ করি তিনি পরে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই একদিন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী (ইণ্ডিয়ান মেডিকাল অ্যাঃ প্রকাশিত "ইওর হেলথ" মাসিকের সহকারী সম্পাদক) বসেছিল নিখিলবাবুর পাশে। আমি পিছনে। আমি কদাচিৎ তাঁর পাশে বসেছি। বসলেও কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করি। কারলাইলের কথায় এখন আর কাজ হয় না, কারলাইলকে তিনি নিজেই ভেঙে ধুলোয় ছড়িয়েছেন। (ইমারসনকে ধরব কিনা ভাবছি।)

আমরা তিনজন চলছিলাম চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধ'রে বাগবাজারের দিকে। এমন সময় আমার কোনো একটি কথায় বারুদে আগুন জ্বলে উঠল। হাসতে হাসতে নিখিলবাবু পথের একপাশে গিয়ে গাড়ি থামালেন। সুধাংশু আতঙ্কিত হয়ে তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল ফুটপাথে। নিখিলবাবু ঝাঁপিয়ে প'ড়ে হাস্যরত অবস্থাতেই তাকে অনুসরণ করলেন এবং তাকে গিয়ে মারলেন। তার পর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গাড়িতে এসে উঠলেন, সুধাংশু তাঁকে অনুসরণ করল। গাড়ি চলতে লাগল গম্ভীরভাবে। সেফটি ভালভ ঠেলে অতিরিক্ত বাষ্প বেরিয়ে গেছে, অতএব কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। সমস্ত ঘটনাটি ঘটতে লেগেছিল মাত্র এক মিনিট।

এ রকম বহু ঘটনা আছে।

ওয়েলিংটন স্কয়ারে নলিনীকান্ত সরকার ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে নিখিলবাবুর দেখা হয়ে গেল। নিখিলবাবু গাড়ি থেকে নেমে আলাপ করতে লাগলেন ওঁদের সঙ্গে। পাশে ট্রাম দাঁড়িয়ে। ট্রাম ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা দুজনে একটা হাসির কথা ব'লে ট্রামে উঠে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন নিখিলবাবু একাই হাসছেন এবং বাগানের রেলিঙের উপর ঘুসি চালিয়ে হাত ক্ষতবিক্ষত করছেন।

ঘটনাস্থল অল-ইণ্ডিয়া রেডিও। গত যুদ্ধের আগের ঘটনা। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অজিত চট্টোপাধ্যায় ক্যারিকেচারে পাকা। অজিত পরিচিত বন্ধুদের চালচলন নকল ক'রে দেখাচ্ছিল। তার মধ্যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ক্যারিকেচার খুবই ভাল হয়েছিল। নিখিলবাবু বিগলিত। তিনি ভীষণ হাসতে আরম্ভ করেছিলেন প্রথম থেকেই, তার পর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ক্যারিকেচার একটুখানি দেখেই তিনি এমন উদ্দাম হয়ে উঠলেন যে তাঁকে আর ঠেকানো গেল না। তিনি অজিতের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার পর সে কি দৃশ্য! অজিতকে মেরে প্রায় শেষ ক'রে ফেললেন। অজিত জামার ভাঁজ ঠিক করতে ব্যস্ত, নিখিলবাবু হাঁপাচ্ছেন। ঘেমে উঠেছেন। তার পর কপালের ঘাম মুছে হাঁপাতে হাঁপাতে অজিতকে বললেন "নৃপেনেরটা আবার দেখব।"

অজিত ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে।

আর একটি মাত্র ঘটনা বলি। একদিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উপর

আক্রমণটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ব'লে নিখিলবাবুর নিজের ধারণা হয়েছিল। ধারণাটা হয়েছিল রাত বারোটায়, বিছানায় শুয়ে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেও তাঁর বিবেক জেগে রইল। সকাল বেলা অবধি একটানা জেগে রইল। নিখিলবাবুও জাগলেন। বিবেকের নির্দেশে তিনি গিয়ে হাজির হলেন রামধন মিত্রের গলিতে। আহা, বন্ধু লোক যদি কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, অতএব একবার তাঁকে দেখা উচিত।

গিয়ে দেখলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে। মাথায় হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অতি করুণভাবে ব'সে আছেন। "কিসের ব্যাণ্ডেজ?" "আপনারই কীর্তি।"—

নিখিলবাবু বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দেখবেন ভাবতে পারেননি। তাঁরই মারার ফলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়েছে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আবার নিখিলবাবুর বারুদে আগুন জ্বলে উঠল, তিনি ঐ ব্যাণ্ডেজের উপর ঘুসি চালাতে লাগলেন।

এ রকম চরিত্র আর দ্বিতীয় জানি না।

হিউমার মাপা পক্ককেশ এই জীবন্ত যন্ত্রটি আজও অক্ষত। এঁর সম্পর্কে আগুদে একবার অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখেছিলাম। লেখাটির নাম ছিল "দি টেরিব্‌ল্‌ মিস্টার দাস।"—বাইশ তেইশ বছর আগে। আমি অনেক-বার লিখেছি তাঁর সম্পর্কে, প্রমথ বিশী লিখেছেন, এবং আরও অনেকে।

ভিতরে ভিতরে সমসাময়িক কালের একটি স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহুমুখী চেষ্টাপ্রসূত একটা নবজীবনের স্রোত। তা আমার মনের মধ্যেই নিভৃতে ক্রিয়া ক'রে চলেছে। দেশনেতাদের দুর্লভ সাহসিকতা, মনোবল, এবং কর্মীদের ক্লান্তিহীন সংগ্রামের স্পর্শ অনুভব করেছি সমস্ত মনে। মনকে তা অনেক উঁচুতে তুলে রেখেছে। দৃশ্য শক্তির অদৃশ্য ক্রিয়া, তা রাজনীতির সঙ্গে যত বিচ্ছেদই থাক।

রাজনীতি সম্পর্কে তখন আবেগপ্রবণদের পক্ষে কিছু বলতে যাওয়া মানেই দৈহিক লড়াইতে নেমে পড়তে বাধ্য হওয়া। তাই সাহিত্য রচনাতেও পদে পদে আইন বাঁচিয়ে চলতে হবে। সে এক জঘন্য অবস্থা। আমার পক্ষে রাজনৈতিক হাঙ্গামার মধ্যে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, যাবার কোনো

উপায়ই ছিল না এবং তা প্রধানত আমার স্বাস্থ্যের জন্য, অংশত আমার মানসিক গঠনের জন্য।

কিন্তু এ বিষয়ে নিজের উপর এতটা বিশ্বাস সত্ত্বেও উপাসনাতে প্রকাশিত আমার সামান্য একটি গল্পের জন্য পুলিস থেকে সম্পাদক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের নামে একটি সতর্ক বাণী এসেছিল।

মোহনবাগান রো থেকে বেরিয়ে সেই কালটা একটু ঘুরে আসা যাক। শনিবারের চিঠিতে প্রবেশের আগে কিরণকুমারই আমাকে উপাসনায় লেখক রূপে হাজিরা দিতে পুনঃপুনঃ চাপ দিয়েছে। কিরণের সাহিত্যবোধ তীক্ষ্ণ, এবং সাহিত্যরুচি যুধিষ্ঠিরের রুচি। মেজাজে বর্জিত, কিন্তু মান অতি কঠোর। এ কারণে কিরণের মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, এবং এখনও করি। থার্ড ইয়ারে পড়তে সাধারণ পপুলার জিনিস মাত্রেই তার ভাষায় ছিল ট্র্যাশ। কুড়ি বছর পরে সে ভাষার বদল হয়েছিল, ভোগ্য থেকে আক্রমণ স'রে গিয়েছিল ভোক্তার দিকে। অতি সাধারণ সাহিত্য বা শিল্পকর্মে যারা গদগদ হয়, কিরণের ভাষায় তাদের এটি মন্দ রুচির পরিচয়, ব্যাড টেস্ট।

কিরণের উৎসাহেই আমি উপাসনাতে একটি গল্প লিখেছিলাম, গল্পটির নাম ছিল 'অনু'। তার মূল চেহারাটি শুধু মনে আছে। একটি মেয়ে ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী হয়ে সেই পথেই চলছিল অন্য বিপ্লবীদের সঙ্গে। নায়ক তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনল। তার ব্যক্তিত্ব ছিল প্রবল। মেয়েটি ভিন্ন পথে চলতে থাকে। তারপর বহুদিন পরে নায়ক জানতে পারে সে মারাত্মক অসুখে ভুগছে। তখন নায়ক আত্মগত ভাবে শুধু চিন্তা করেছিল এর জন্য কি তবে সেই দায়ী? তাকে তার নিজের পথ থেকে ফিরিয়ে না আনলে কি ক্ষতি ছিল? হয় তো এই বিপদ তার ঘটত না, মোটকথা দায়িত্বটা তার নিজের থাকত।

এ গল্পে যা কিছু ঘটেছে তা গল্পের নীতি রক্ষা ক'রেই ঘটেছে, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে গল্পের নীতি মিলবে কেন? এই গল্পেই ব্রিটিশ রাজ বারুদের গন্ধ পেয়েছিলেন।

কিরণের কথায় আর একটি রচনা দিই উপাসনায়। সে আমার ১৯৩২ সালে নিউ-এম্পায়ারে দেখা রবীন্দ্রনাথ প্রযোজিত নবীন (বসন্ত) নামক ঋতু নাট্য সম্পর্কের [illegible]না।

এই অভিনয়টি পর পর তিন দিন দেখেছিলাম অতুলানন্দের সঙ্গে।— এর আগে কোনো ঋতুনাট্যের অভিনয় আমি দেখিনি, এই প্রথম, অতএব কি পরিমাণ ভাল লেগেছিল তা বলা বাহুল্য মাত্র। এইদিন জ্ঞানরঞ্জন রাউতকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম মঞ্চের ফোটো নেবার জন্য। ক্যামেরা ট্রাইপডে দাঁড় করিয়ে, দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে একখানা ফোটো তোলা হয়েছিল। সেই ফোটোগ্রাফের সঙ্গেই আমার রচনাটি ছাপা হয়। বাঁ দিকে কবি বসে আছেন বই হাতে নিয়ে। তাঁর বিপরীত দিকে গায়ক গায়িকারা বসেছেন। মাঝখানটা নৃত্যের জন্য ফাঁকা।

অভিনয় দেখে আমার মনে যে ছবিটি জেগেছিল তাই লিখেছিলাম। এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমি দুটি সমন্তরাল ছবি দেখেছিলাম। শুনেছি মাতালেরা অনেক সময় একটিকে দুটি দেখে, আমিও তাই দেখেছিলাম, যদিও তার মূলে ভাব-মত্ততা ভিন্ন অন্য কোন মত্ততা ছিল না। ছিল কবির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। আমি উপাসনায় সেই প্রবন্ধে যা লিখেছিলাম তার মূল কথাটা ছিল এই যে—আমি এর একটি ছবিতে দেখলাম নৃত্যগীত ও ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে বসন্তকে যে কথা বলা হ'ল, বা বসন্তকে যে বন্দনা করা হ'ল, সে কথা, সে বন্দনা, বসন্ত ঋতুর প্রতি কবির কথা, কবির বন্দনা। আমি এই একই সঙ্গে আর একটি ছবি দেখলাম, তাতে দেখা গেল সমস্ত নৃত্যগীতের ভিতর দিয়ে কবিকেই আমরা বন্দনা করছি। কবি যেন দুটি ভূমিকা অভিনয় করছেন এক নাটকে। একবার তাঁর সঙ্গে আমরা বসন্তঋতুকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, আমাদের মনের কথা সব বলছি, আর একবার তিনি নিজে বসন্তের প্রতীকরূপে আমাদের বন্দনার মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে নিজের ছবিটি দেখে নিচ্ছেন। কবির সম্পূর্ণ নিজের কথাও এর কয়েকটি গানে আছে। তাই আমার চোখে এ অভিনয়ের যে দুটি রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তা আমার অনুভূতিতে একান্ত সত্য ছিল।

"এখনো বনের গান
বন্ধু হয়নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি।"

এ আবেদন, গানের সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রতিই আমাদের মনে মনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, অর্থাৎ আমরা যেন কবিকেই এ কথা বলছি। তার কারণ কবির

নিজের কথায়, ফাল্গুনের সমস্ত সত্তায়, কবি যে দান রেখে গেলেন, তার কথা শুনলাম এই 'নবীন' নাটকেই।—ফাল্গুনের হাওয়ায় হাওয়ায় তিনি যে তাঁর আপনহারা বাঁধনছেঁড়া প্রাণ ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন, তার অশোক কিংশুকে তাঁর অকারণ সুখের মুহূর্তের যে রঙ লাগল, তার ঝাউয়ের দোলায় তাঁর দুঃখরাতের যে গান মর্মরিত,—সেই ফাল্গুনকে সে দিন প্রত্যক্ষ করলাম। 'খেলা ভাঙার খেলা'র মধ্য দিয়ে দেখলাম কবির নিজেরই বিদায়-বেদনার আভাস। তারপর প্রতি বসন্তে কবিকে আহ্বান জানাতে বললেন। কবি বসন্তের মধ্যে নিজেরই জয়ের ছবি দেখলেন, "বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা," তিনি উপলব্ধি করলেন—

"পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছেরে ঐ কেঁদে মরে –
মরণ এবার আনল আমার বরণ ডালা ।।
......কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা
উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা
আরাম বলে, 'এলো আমার যাবার পালা' ।"

এ তো কবির নিজের সঙ্গেই বোঝা পড়া। কিন্তু যখন পথের গানে শুনছিলাম—

"মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার
করুণ রঙিন পথ..."

তখন সে পথে কবির নিজেরই আগমন এবং স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাওয়ার বেদনার্ত ছবিখানি চোখের সম্মুখে ফুটে উঠেছিল। তারপর সর্বশেষ—সমস্ত আকাশে বাতাসে রাঙা আবির ছড়িয়ে একটা প্রলয়ের আগুনজ্বলা ঝড়ের মধ্যে শেষ বিদায়গ্রহণ। কিন্তু লুপ্তি নয়, বড় মুক্তির আশ্বাসভরা সে গান—তার মধ্যে দেখলাম কবির নিজের জীবন দর্শন—

"সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে।"

যে তিনটি দিন আমার এই অভিনয় দেখার সৌভাগ্য ঘটেছিল, তার মধ্যকার দুটি দিনে দুটি ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে একটি খুব তুচ্ছ হ'লেও আমার কাছে খুব মজার মনে হয়েছিল, এবং সম্ভবত কবিই সেটি বেশ উপভোগ করেছিলেন। কবি এক জায়গায় আবৃত্তি করছেন,

"উৎসবের সোনার কাঠি তোমাকে ছুঁয়েছে, চোখ খুলেছে। এইবার সময় হ'ল চারিদিক দেখে নেবার। আজ দেখতে পাবে, ঐ শিশু হয়ে এসেছে চির নবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তার দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ঐ সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। ঐ তার কলপ্রলাপ। নাচেনাচে মর্মরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।"

এই আবৃত্তি শেষ হ'লেই "ওরা অকারণে চঞ্চল" এই গানের সঙ্গে ছোট একটি মেয়ে নাচবে। কিন্তু একদিন দেখলাম, সম্ভবত প্রথম দিন, মেয়েটি নাচবার জন্য ভীষণ ছটফট করছে, কবির আবৃত্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত তার ধৈর্য থাকছে না। সে বারবার চঞ্চল হয়ে নাচ আরম্ভ করতে যায়, আর কবি তার জামা টেনে ধ'রে ঠেকান। গানের স্পিরিটের সঙ্গে কি অদ্ভুত মিল! —ওরা অকারণে চঞ্চল!

অভিনয়ের দিক দিয়ে এটি আয়রনি অবশ্যই, কেননা যারা অকারণে চঞ্চল, তাদের দিয়ে কি চঞ্চলতার অভিনয় করানো যায়? অভিনয়ের ধার ধারে না তারা!

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথকে এতখানি উত্তেজিত অবস্থায় আর কখনো দেখিনি। উত্তেজিত, কিন্তু তবু সুজনতার চরম।

ঘটনাটি এই ঃ অভিনয়ের সময় কোনো কোনো নৃত্যদৃশ্য শেষ হ'তে না হ'তে, কখনো চলতে চলতেই কতগুলি দর্শক খুব উৎসাহ দেওয়া হবে অনুমান ক'রে ভীষণ হাততালি দিচ্ছিল। দৃশ্যশেষ বললাম বটে কিন্তু সেটি বিরাম নয়, সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী আবৃত্তি এবং নৃত্যগীত। কিন্তু মাঝখানে দীর্ঘমেয়াদি হাততালিতে পরবর্তী অংশ আরম্ভ করায় বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। কোনো কোনো নৃত্যে হাততালির বহরটা হচ্ছিল অত্যন্ত বেশি। রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে ব'সে সহ্য করছিলেন এই উৎপাত, কিন্তু পারলেন না। অভিনয়ের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভের আগে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে জোড়হাতে এসে মঞ্চে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, "আপনারা দয়া ক'রে মাঝখানে হাততালি দেবেন না। অভিনয় চলতে চলতে হাততালি দেয় লোকে বিদ্রূপ করার জন্য। আর যদি ভাল লেগে হাততালি দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন, তবে অভিনয় শেষ হ'লে দেবেন। এই ঋতুনাট্যটির মাঝখানের কোনো অংশ ভাল বা মন্দ নয়, কারণ এটি একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ জিনিস, খণ্ডখণ্ড

পৃথক দৃশ্য নয়। অতএব আপনাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা মাঝখানে হাততালি দিয়ে এর অখণ্ডতা নষ্ট করবেন না।”—ব'লেই দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হ'ল।

বলাবর সময় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, বিচলিত হওয়ার ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। হাত দুখানা জোড় ছিল—যতক্ষণ বলছিলেন, কিন্তু তবু তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা আদেশের সুর ছিল যাতে হাততালি-দেওয়া দর্শকদের মাথা লজ্জায় নত হয়েছিল। পরবর্তী অংশে আর কেউ হাততালি দেয়নি।—দর্শকদের দিকের নীরবতায় একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

তখনকার দর্শকদের অজ্ঞতাই এর জন্য দায়ী, এবং সুখের বিষয় কবির তিরস্কার বাণীতে তারা লজ্জা পেয়েছিল আপন ভুল বুঝতে পেরে। আজকের দিনে এ রকম হ'লে তার কি পরিণাম হ'ত তা অনুমান করা কঠিন নয়।

১৯৩২ থেকে ১৯৫৭ সাল—সিকি শতাব্দীর দৈর্ঘ্য। এখন কি প্রেক্ষাগৃহে হাততালি বন্ধ হয়েছে?—জানি না, অনেক কাল এ থেকে দূরে আছি। তবে আজকাল সংস্কৃতি বৈঠক বেড়েছে, কিন্তু অশিষ্টতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংস্কৃতি হয়তো অক্ষম, কিংবা অশিষ্টতা দিয়ে সংস্কৃতিকে থামানো যাচ্ছে না, তাই দুইই অবাধে বেড়ে চলেছে।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ির মুখে শুনেছি কোনো কোনো শিল্পী অভিনয়ের সময় হাততালির অপেক্ষা করেন। এমন কি পরিচিত লোক-দের প্রেক্ষাগৃহে বসিয়ে দেন হাততালি দেওয়ার জন্য। এ বিষয়ে আমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবে যে কারণেই হোক, এই অভ্যাসের ফলে, অর্থাৎ নাটক বা সিনেমা, সব জায়গাতেই বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে হাততালি দেওয়ার অভ্যাসের ফলে, সব আর্টেরই যে একটি অখণ্ড রূপ আছে তা দেখার ক্ষমতা দর্শকদের নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য এখন বিশেষ ক'রে সিনেমায় দু চারটে দৃশ্য ভাল থাকলেই যথেষ্ট মনে করা হয়। এটি প্রত্যক্ষ জানার ব্যাপার। সম্ভবত একমাত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই অধঃপতন হয়নি। দশ মিনিটের গানে সাত মিনিট যদি গলা বেসুরো বাজে, তাল

ভুল হয়, তবু তিন মিনিট সুর ও তাল ঠিক রাখতে পারলেই বাহবা পাওয়া যায় না। কেউ বলে না যে খানিকটা বেসুরো বেতালা গাওয়া হ'লেও মোটের উপর গানটি খুব ভাল হয়েছে। তবে গানের মাঝখানেও হাততালি দেওয়া অভ্যাস হ'লে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সহনশীলতার কথায় আর একটি ঘটনা মনে পড়ল। ১৯৩০-৩১এর মধ্যে কোনো সময়। এক কবির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। আমিও ছিলাম সেখানে। পর্দার আড়াল থেকে একটি মেয়ের গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা শুরু হ'ল। সে কণ্ঠ গানের উপযোগী আদৌ নয়, ভাঙা এবং বেসুরো। তদুপরি সে যে গানটি গাইল তা প্রচলিত একটি অতি সাধারণ রেকর্ডের গান, কার রচনা জানি না। প্রায় দশ মিনিট চলল সে গান, থামতেই চায় না।

এতক্ষণ ধ'রে এই অভ্যর্থনা তিনি বেশ ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করলেন। গান তাঁর কানে প্রবেশ করছিল কিনা বোঝা যায়নি। অবশেষে গান শেষ হ'ল।

তারপর নিমন্ত্রণকারী তাঁর ছেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলের বয়স পনেরো-ষোল। বললেন, "এ আপনার কবিত বেশ পছন্দ করে।"—রবীন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে (এবং স্মিতভাবেও) কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন। সংবাদটি শুনে খুব প্রীত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তারপর পুত্রের পিতা বললেন, "এর হাতের লেখা ঠিক আপনার লেখার মতো।"

রবীন্দ্রনাথ এ কথা শুনে অভিভূত হলেন। এবং নিতান্তই অভ্যাস বশত এ নিয়ে কিছু রসিকতাও করলেন। বললেন, "অনেকেরই লেখা ঠিক আমার মতো—দেখেছি আমি। কিন্তু ভয়ের কথা, কবে কে হ্যাণ্ডনোট বার করবে কে জানে, বলবে, রবিঠাকুর আমার কাছে দশ হাজার টাকা ধারেন।"

সেদিন আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কিরণকুমার রায় ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আরও দুএকজন কে ছিলেন এখন আর মনে পড়ে না। কবিশেখর কালিদাস রায়ও মনে হয় ছিলেন।

১৯৩৩ সাল থেকে ধর্মতলা স্ট্রীটে দুপুর বেলা থেকে রাত ৮টা ৯টা পর্যন্ত

যে আড্ডা চলত তার তুলনা হয় না। সমসাময়িক প্রায় সকল লেখক শিল্পী সাংবাদিকদের ভিড় ছিল সেখানে। একখানা পূর্ণাঙ্গ নতুন কাগজে নিজের কল্পনা রূপ দিতে পারবেন, খরচের জন্য ভাবতে হবে না, এতে সজনীকান্তের উৎসাহও বেড়ে গিয়েছিল খুব।

আজকাল বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে যেখানে সেখানে সাংস্কৃতিক বৈঠক বা সভা বসে। সে সবই সভা বা বৈঠকের প্রথাগত অনুষ্ঠান। লোক ডেকে আনতে হয় সে সব বৈঠকে। কিন্তু বঙ্গশ্রীর প্রশস্ত ঘরে যে বৈঠক ও উপ-বৈঠক বসত প্রতিদিন তার মতো স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক বৈঠক আজকের যুগে কল্পনারও বাইরে। সে বৈঠকে কখনো সর্বদলীয়, কখনো তিন চারিটি উপদলে বিভক্ত। একদিকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায় তুমুল তর্কে মত্ত, এককোণে প্রমথনাথ বিশী ও চিত্রকর অরবিন্দ দত্ত পরস্পর কথার ছুরি চালাচ্ছে, আর এককোণে রামচন্দ্র অধিকারী কাব্য আবৃত্তি করছেন, অন্য এক জায়গায় সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস কারো হস্তরেখা বিচার করছেন, কখনো সে ঘরে কুড়ি বাইশজন কুড়িবাইশ রকমের আলোচনা চালাচ্ছেন একসঙ্গে ব'সে।

সে বৈঠক আর নেই, যাঁরা আসতেন তাঁরাও অনেকে আর নেই। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, মোহিতলাল মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন গুপ্ত, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশ বিশ্বাস এঁরা আর বেঁচে নেই—অবশিষ্টদের মধ্যে অনেকেই এখন ম্রিয়মাণ।

মোহনবাগান রো-র আড্ডা ও বঙ্গশ্রীর আড্ডার বন্ধুরা অধিকাংশই এক, তবু স্থানমাহাত্ম্যে তাঁদের ব্যবহার কিছু পৃথক। একটির স্থান সংকীর্ণ, অন্যটির প্রশস্ত, এতে ব্যবহারের যেটুকু তফাৎ হওয়া উচিত তাই। এই আড্ডারই কিছু অংশ মাঝে মাঝে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে দেখা যেত—বর্মন স্ট্রীটে—সন্ধ্যাবেলায়।

যাঁরা আসতেন তাঁদের অধিকাংশই তখন লেখকরূপে পরিচিত হয়েছেন এবং কেউ কেউ যশের প্রথম ধাপে এসে বসেছেন। শৈলজানন্দ, প্রেমেন তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তারাশঙ্কর, মানিক, চমকপ্রদ সম্ভাবনাসহ সাহিত্যক্ষেত্রে নবপ্রতিষ্ঠ। দুজনে বয়সে অনেক দূরে, তবু প্রবেশ প্রায় সমকালীন। শৈলজানন্দ তারাশঙ্কর একই দেশের, তবু শহরে আসতে তারাশঙ্কর কিছু

দেরি ক'রে ফেলেছে (তারাশঙ্করের বঙ্গশ্রী প্রবেশের বেলাতেও কিরণই সেতুর ভূমিকা নিয়েছিল।) তবে আপন ক্ষমতাবলে দেরির ক্ষতি তার পূরণ হয়ে গেছে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিশ্বসাহিত্যমধু পানে মত্ত, এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ ক'রে অমৃত হ্রদে পতিত এবং বিগলিত। সৌন্দর্যের এমন দুর্দান্ত ভোক্তা কম দেখা যায়। শুধু আবেগ দিয়ে গড়া স্বপ্নজগৎচারী একটি অশরীরী দেহ যেন জীবনভর অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই কঠিন মর্তভূমিতে।

শৈলজানন্দ তার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি এ সময়ে লিখে ফেলেছে। জাতশিল্পী স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। তারাশঙ্করও জাতশিল্পী। প্রেমেন কিছু পৃথক। তাকে বলা যায় অভিজাত শিল্পী। তার সকল কবিতা গল্প এবং উপন্যাসের গভীরে একটা বুদ্ধিবৃত্ত মার্জিত মানসের ছোঁয়া পাওয়া যায়। প্রেমেন সব সময় নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনটাকে দেখার চেষ্টা করেছে। সব সময় ওরিজিন্যাল এবং স্বতন্ত্র কিছু করতে হবে এই চেতনার সঙ্গে সহজাত সৃষ্টিক্ষমতা মিলে, তাকে রিফাইন্‌ড করেছে বেশি।

বঙ্গশ্রী কাগজে ধারাবাহিক ফীচার লেখক তিনজন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের নাম বিষ্ণুশর্মা। (বর্তমানে তিনি বিরূপাক্ষ।)

বঙ্গশ্রীর নিয়মিত সভ্যদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল কবি বাসব ঠাকুর। তখন কবি, বর্তমানে শিল্পী। বয়স তখন পনেরো কি ষোল। বয়োজ্যেষ্ঠ যে কে ছিলেন তা আজ ভেবে বলা কঠিন। কারণ সে বয়সে দাড়ি বা চুলে একটুখানি পাক ধরলেই সেই পক্বতা বৃদ্ধত্বের ছবি জাগাত মনে। চন্দননগরের যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সবচেয়ে বড় মনে হয়েছিল তখন। তিনি যুবক বয়সে হিতবাদীতে বৃদ্ধের বচন লিখে নাম করেছিলেন। বঙ্গশ্রীতে স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর সমবয়স্ক সম্ভবত ছিলেন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত চেহারায় নকল রবিঠাকুর। তার পরের ধাপে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, নলিনীকান্ত সরকার, যামিনী রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্র-

মোহন দত্ত (যমদত্ত), ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন, অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস। তারপরের ধাপে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিল্পী অতুল বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হরিপদ রায়, ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, অরবিন্দ দত্ত, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বাগচী। তারপরের ধাপে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, রামচন্দ্র অধিকারী, কিরণকুমার রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, প্রণব রায়, প্রমথনাথ বিশী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অজিতকৃষ্ণ বসু (অকুব), মানিক বন্দ্যোপাধায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য এবং সর্বশেষ বাসব ঠাকুর। (অনেক নামই বাদ পড়ে গেল, উপায় নেই।)

এটি প্রায় নিয়মিতদের তালিকা। পাঠক এ রকম একটি পরিবেশের কথা কল্পনা করলেই বুঝতে পারবেন এ জিনিস কোথাও নেই, এবং কোনো সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র ক'রেই এমন পরিবেশ রচনা আর সম্ভব নয়। এটি বিংশ শতকের শেষ সাহিত্যিক আড্ডা। এখনকার লেখকেরা গ্রন্থ-প্রকাশকদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছেন।

সাহিত্য রচনায় তখনকার সবার মধ্যে স্বভাবতই একটা আন্তরিকতা ছিল, যা এ যুগে প্রায় দুর্লভ। কিংবা দেখার দৃষ্টি হারিয়েছি এমনও হ'তে পারে। এ যুগ 'সাধারণ জ্ঞান'-এর যুগ এবং শতকরা পঞ্চাশভাগ ভুল তথ্য সম্বলিত সব জ্ঞান প্রচারের বইগুলিতে যে-কোনো জাতীয় ব্যবসায়ী লেখকরা বাজার ছেয়ে ফেলেছেন।

এটি সিনেমা যুগও বটে। সে যুগের লেখকরা লেখার মধ্যে বাণিজ্য অংশটি প্রধান ক'রে দেখেননি। সেটি লেখক জীবনের এক দিকে যেমন ছিল অভিশাপ, তেমনি সেই নির্লোভের বা অল্পলোভের পটে তাঁদের সৃষ্টি আপন প্রাণধর্মেই রূপগ্রহণ করেছে। এখন পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যের বাণিজ্য মূল্য বেড়েছে, কিন্তু আর এক অভিশাপ দেখা দিয়েছে সিনেমারূপে। অনেক সৎসাহিত্যিকের দৃষ্টি ঘুরে গেছে সে দিকে। রূপের বদলে রূপা। অনেক বাংলা সিনেমার অবাস্তব ঘটনা বা পরিবেশ

ভেবে ভেবেই তাঁদের গল্পকেও অবাস্তব এবং উদ্ভট ক'রে সাজিয়েও দিচ্ছেন, এবং আশা করছেন সিনেমায় তা চলবে। চলছেও। অতএব এক অভিশাপ থেকে আর এক অভিশাপে উত্তীর্ণ হওয়া। আগে পরিচালকেরা খারাপ ছবির কৈফিয়ৎ দিতেন—দর্শকেরা ভাল ছবি বুঝতে পারে না। অনেক লেখক এই কথার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরও ধারণা ভাল জিনিস পরিচালকরা বুঝতে পারে না। তবে বাংলা সিনেমা, পথের পাঁচালি ও অপরাজিতর মতো সাহিত্যকে সিনেমায় রূপান্তরিত ক'রে আর সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। সিনেমামুখীরা আত্ম-মুখী হবেন আশা করি।

বঙ্গশ্রী আসরের কয়েকজনের চরিত্র বেশ উপভোগ্য ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে আগে। এ রকম নিরহঙ্কার এবং আত্মচেতনাহীন মানুষ কম দেখা যায়। লৌকিকতার ধার ধারতেন না। কোন্ ব্যবহার সঙ্গত বা অসঙ্গত, বা কোন্‌টা স্থানকাল পাত্রের অনুপযোগী, সে জ্ঞান তাঁর ছিল না। যে প্রকৃতির আবেষ্টনে তাঁর জন্ম সেই প্রকৃতির প্রভাব ভিন্ন শহুরে প্রভাব তাঁর উপরে একেবারেই পড়েনি। বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে, পড়াশোনাও বেশ করেছিলেন। অনেক বিষয়েই তিনি আকর্ষক ভাষায় বলতে পারতেন। কিন্তু আচার ব্যবহারে ছিলেন সম্পূর্ণ পল্লীর মানুষ। তিনি ধূমপান করতেন। কিন্তু খরচ বিষয়ে তাঁর কৃপণতা ছিল। কৃপণতাও ঠিক নয়, নিজের জন্য বাজে খরচ করা তাঁর প্রয়োজনই বোধ হ'ত না। অভাবের বোধ তাঁর কম ছিল। তাঁর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে তাঁকে হুঁকোয় তামাক খেতে দেখেছি। ঘরের বাইরে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন পরনির্ভর। সিগারেট চেয়ে খেতেন। অনেক সময়েই চাইতে হ'ত না, পেতেন। কৃপণের মতোই খেতেন। দারুণ গ্রীষ্মেও সিগারেট খেতে পাখা বন্ধ ক'রে দিতে হ'ত, বলতেন পাখা চললে সিগারেট তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। জুতো কখনো পালিশ করতেন না, ধূলোমাটিতে তা অতি করুণ দেখাত। জুতো বদল হলেও, তার চেহারা দরজার বাইরে থেকে দেখেই আমার স্ত্রী বুঝতে পারত বিভূতিবাবু এসেছেন এবং বুঝতে পেরে খাবার আয়োজন করত। তাঁর জুতোর এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কখনো বদল হয় নি।

চড়া গলা, কিন্তু কর্কশ নয়. ধারালো। নিজের বক্তব্য অন্যের মনে

বিঁধিয়ে দিতে পারতেন বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে। নিজের অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতা বিষয়ে তাঁর নিজের বিশ্বাস এমনই সহজ এবং দৃঢ় ছিল যে এ কথা গর্ব ক'রে বলার তাঁর কোনো প্রবৃত্তিই কখনো হয় নি। উপরন্তু আর একটি আশ্চর্য গুণ ছিল। তাঁকে গাল দিলে কিছুই মনে করতেন না, পাল্টা আক্রমণ তাঁর ধাতে ছিল না। "আপনি কিছুই জানেন না" বললে মৃদু মৃদু হাসতেন,—অর্বাচীনের প্রতি করুণাপূর্ণ সে হাসি।

ভিতরে ভিতরে খুব রোমান্টিক ছিলেন। প্যাশানেট ছিলেন, বস্তুগত শব্দবর্ণগন্ধে মিলিয়ে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাকে লোভীর মতো উপভোগ করতেন, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ অতি দীন এবং তা মলিনতাশূন্য। মাত্রাজ্ঞান শুধু আহারেই ছিল না।

তিনি নিজের আরামের জন্য এক পয়সা বাজে খরচ করতেন না। (তাঁকে সেই ভাবেই মেনে নিয়ে আনন্দ পেয়েছি)।

চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি খুব উপভোগ্য ছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কাছে একটি মজার গল্প শুনেছিলাম। একদিন বিভূতিবাবু ও তিনি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে চলছিলেন, হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেন বিভূতিবাবু একটি ছুটে-চলা মোটরের দিকে চেয়ে আছেন। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই বিভূতিবাবু ডান হাতে বুক চাপড়ে বলে উঠলেন "মেরে দিয়ে গেল!"

অর্থাৎ ঐ মোটরে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল, তাঁর চোখ ঝলসে দিয়ে সে চকিতে মিলিয়ে গেল। কি সাংঘাতিক ঘটনা! মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস প্রকাশের এই ছিল তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি। অত্যন্ত প্রাণখোলা ব্যাপার। সরল সরস রসিকতা। বিভূতিবাবুর প্রাণের গভীরে যে কি রকম রোমান্স ছিল তার প্রমাণ একদিন চাক্ষুষ করেছি। ঘটনাটা এই—

ধর্মতলার বৈঠক থেকে নেবুতলা হয়ে সোজা হ্যারিসন রোডে যেতাম মাঝে মাঝে। বিভূতিবাবুও মির্জাপুর স্ট্রীটে যেতেন এই পথে। এক গ্রীষ্মকালের রাত আটটায় সে পথে যেতে দেখি শশীভূষণ দে স্ট্রীটের ফুটপাথ থেকে বিভূতিবাবু চাঁপা ফুল কিনছেন। তাঁর অগোচরে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দুটি চাঁপা তিনি এক পয়সা দিয়ে কিনলেন। তাঁকে চমকে দিয়ে বলে উঠলাম, "বিভূতিবাবু, এ কি ব্যাপার?" বিভূতিবাবু একটুখানি সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, "রোজ কিনি।"

দুটি চাঁপা ফুল তাঁকে প্রায় প্রতিদিন কিনতে হয় একান্ত গোপনে, এই ঘটনাটির ভিতর দিয়ে আমি তাঁর মনের একটি দিক স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। সব মানুষেরই মনের একটা নিজস্ব দিক থাকে সেটি অত্যন্ত স্পর্শচেতন, কোমল, এবং আলোকভীরু। বাইরের নিয়মে সে চলে না, তার নিজস্ব একটি ধারা আছে। সেখানে বাইরের কারো প্রবেশের অধিকার নেই। বিভূতিবাবুর এই নিজস্ব দিকটিতে আমার যেন সেদিন অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয়েছিল, এমন ধারণা আমার হয়েছিল পরে।

আরও একজনের সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ল। কোন্ বছর ঠিক মনে নেই, 'সেভেনথ হেভ্ন' নামক একটা সিনেমাছবি দেখছিলাম আমরা তিনচার জন। চার্লস ফারেল ও জেনেট গেনরের ছবি। ছবি দেখে মুগ্ধ এবং আবেগ কম্পিত হৃদয়ে বেরিয়ে এসে কয়েক সেকেণ্ড পরেই খেয়াল হ'ল অতুলানন্দ আমাদের সঙ্গে নেই। তাকে খুঁজে বার করা গেল আমাদের গন্তব্যের বিপরিত দিকে, কিছু দূরে। সে ইচ্ছে ক'রেই আমাদের এড়িয়ে গিয়ে গোপনে চাঁপা ফুল কিনছিল এক ফুলওয়ালার কাছ থেকে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল। উদ্দেশ্য জানলে হয় তো ধরতাম না। অতুল অত্যন্ত লজ্জিত এবং মহা অপরাধীর মতো আমাদের অনুসরণ করল। 'সেভেনথ হেভ্ন' দেখে সে এমন বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে অনেকক্ষণ সে কোনো কথাই বলতে পারেনি।

বিভূতিবাবুর মনের আর একটা দিক আর এক দিন উদ্ঘাটিত হয়েছিল, সে বৃত্তান্তটা এখানেই প্রকাশ করি।

বঙ্গশ্রীর প্রথম যুগে আমি কিছুদিন ক্যামেরাহীন ছিলাম। আমার দ্বিতীয় প্রিয় ক্যামেরাটি কিছুকাল আগে চুরি হয়ে গেছে। এ সময় ক্যামেরার দরকার হ'লে কুইক ফোটো সার্ভিসের হরিপদ সেন আমাকে তাঁদের যে-কোনো ছোট বা বড় ফিল্ড ক্যামেরা আমাকে অবলীলাক্রমে ধার দিতেন। আমি যে ক্যামেরাপ্রিয় এ কথা তখন কারোই অজানা ছিল না, এবং বিভূতিবাবু যে কখনো ক্যামেরা বিষয়ে উৎসুক ছিলেন এমন আভাস কখনো পাইনি। তাই হঠাৎ এক দিন (৩রা মার্চ ১৯৩৩) দুপুরে বিভূতিবাবু খুব ব্যস্তসমস্তভাবে এসেই বললেন, "আমাকে এখুনি ফোটো তোলা শিখিয়ে দিতে পারেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে?"

জেরা ক'রে জানা গেল বিভূতিবাবু জীবনে কখনো ক্যামেরা স্পর্শ করেননি এবং সঙ্গেও কোনো ক্যামেরা আনেননি, কিন্তু দরকারটা জরুরি, কাজেই না শিখলেই যে নয়। জানা গেল তিনি সেই দিনই সন্ধ্যায় সম্বলপুর জেলার এক দূর পল্লীপথে অদ্ভুত এক জনহীন অরণ্যরাজ্যে চলেছেন একটি পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার দেখতে। জায়গাটার নাম বিক্রমখোল, সেখানে এক পাহাড়ের গায়ে ইতিহাসপূর্ব যুগের এক আশ্চর্য সাংকেতিক শিলালিপি দেখতে পাওয়া গেছে এবং পুরাতাত্ত্বিকেরা তা দেখে তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে তখন জল্পনাকল্পনা করছেন। এই খানেই চলেছেন বিভূতিবাবু তাঁর এক বন্ধু (প্রমদ দাসগুপ্ত, সাবডেপুটি) সহ। বিভূতিবাবু সজনীকান্তের কাছে প্রস্তাব করেছেন। বঙ্গশ্রী থেকে খরচ দিলে তার বিনিময়ে তিনি বিক্রমখোল শিলালিপি সম্পর্কে একটি রচনা দেবেন বঙ্গশ্রীতে। মাত্র দশটি টাকার ব্যাপার। একটি প্রবন্ধের দামও তখন দশ টাকা। গুরুতর আদৌ নয়। প্রমদবাবু অবশ্য একটি ক্যামেরা নেবেন, কিন্তু প্রমদবাবুর উপর বিভূতিবাবুর তেমন আস্থা নেই, তাই তিনি নিজে চট ক'রে শিখে নিয়ে নিজহাতে ছবি তুলবেন, এই আশায় আমার কাছে এসেছেন।

আমি সব শুনেই বুঝতে পারলাম বিভূতিবাবু এ সব ব্যাপারে যে টুকু শিশু ছিলেন তার চেয়েও শিশু হয়ে পড়েছেন, অতএব এ সুযোগ ছাড়া হবে না। আমি আমার প্রলুব্ধ করার সমস্ত শক্তিকে মনে মনে আহ্বান ক'রে বিভূতিবাবুকে কাত করলাম। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন আমাকে সঙ্গে না নিয়ে উপায় নেই। অতএব আমার জন্যও দশ টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিছু পরে শুনি কিরণের জন্যও দশ টাকার ব্যবস্থা হয়েছে! তার দাবীটি কোন্ দিক থেকে উঠেছিল জানি না।

সজনীকান্ত এ সব ব্যাপারে বেপরোয়া রকমের উদার ছিলেন। তাঁকে আমার অনেক সময় জাদুকর ব'লে মনে হয়েছে। একটা অদ্ভুত রহস্য দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখতেন, তা চমকপ্রদ ছিল এবং মনোহর ছিল। তিনি ইচ্ছে করলেই যে-কোনো সময় বীজপুঁতে তিন মিনিটের মধ্যে গাছ জন্মানো এবং তা থেকে ফল ফলাতে পারতেন, খালি টুপি থেকে অজস্র পায়রা বা'র করতে পারতেন। তাই একের জায়গায় তিন জনের ব্যবস্থা হয়ে গেল অতি সহজেই।

ভ্রমণ পথে বিভূতিবাবুকে এই একটি বার মাত্র আনন্দে উন্মাদ হ'তে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে মোট তিনবার বাইরে গিয়েছি, তার মধ্যে এইটিই প্রথম। সম্বলপুরের মতো পথে এমন অল্প সম্বলে আনন্দের অতিভোজ, পরে পাটনা (১৯৩৭) কিংবা পাবনার (১৯৩৯) পথে হয় নি। সম্বলপুর পথের নিসর্গদৃশ্য সত্যিই অপরূপ। জনাকীর্ণ সমতল ভূমির বৃহত্তম শহর থেকে হঠাৎ পাহাড়িয়া দৃশ্যের এলোমেলো এবং নির্জন বিস্তারের মধ্যে গিয়ে পড়লে নিতান্ত পাষণ্ড ভিন্ন সবারই মনে অল্পবিস্তর একটা ভাবের উদয় হয়।

আমাদের মানসিক অবস্থা সে দিন কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল তার সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে আমার 'পথে পথে' নামক বইতে। সেদিনের আমার সেই পথের পাঁচালিতে বিভূতিবাবুকে অনেকখানি পাওয়া যাবে। বিভূতিবাবুকে সে দিন ভাল ক'রে নিকট দৃষ্টিতে দেখেছি। আদর্শের সঙ্গে অভ্যাসের সংঘাত পদে পদে, আর কি উপভোগ্য তা! গাড়িতে চলতে চলতে দুধারের পাগলকরা দৃশ্যে বিভূতিবাবু উত্তেজনার চরমে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ আমার হাত চেপে ধ'রে চিৎকার ক'রে বলেছিলেন, "পরিমলবাবু, ক্ষেপে যান, তা ভিন্ন আর উপায় নেই।"—তার পরেই অবসন্নভাবে হঠাৎ চুপ ক'রে কিছুক্ষণ ব'সে থেকে গলা খুলে কীর্তন ধরলেন। কিরণ হয়ে পড়ল স্কুলের ছেলে। সে গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে পথের লোকদের হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। প্রমদবাবু স্বভাব-গম্ভীর ছিলেন, কিন্তু সে সময় প্রকৃতির প্রভাবে (কিংবা আমাদের কাণ্ড দেখে) আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গাড়ির মধ্যে আমরাই শুধু চারজন, আর কেউ ছিল না। থাকলে হয় তো ভয়ে চলতি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ত।

বঙ্গশ্রী আসরের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এখানকার অনিয়মিততা। যে-কোনো সাহিত্য অফিসের সম্পাদনা কাজ এতে ভাল হয় ব'লে আমার বিশ্বাস। বড় আড্ডার বিচিত্র আলোচনা অনেক সময় বিচিত্র কল্পনা জাগিয়ে তোলে লেখকদের মনে। তারপর রচনা কাজে একটি নির্দিষ্ট সময় থাকলেই যথেষ্ট। এখানে যে নানা বিষয়ে আলোচনা তর্কবিতর্ক এবং জল্পনাকল্পনা করার স্বাধীন সুযোগ ছিল সেই কারণেই এ আসর সবাইকে আকর্ষণ করত।

এই আসর যখন সজনীকান্তের বিদায়ের পর ভেঙে গেল, এই মাসিকের অফিসঘর যখন সম্পাদকদের কঠোর যোগসাধনার ক্ষেত্র হ'ল এবং নিয়মানুবর্তিতার অক্টোপাসে জড়িয়ে পড়ল, তখন থেকে কাগজের শ্রী ক্রমশ মলিন হয়ে শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বই আর রইল না।

১৯৩২-এর শেষ থেকে ১৯৩৬-এর প্রায় মাঝামাঝি—অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন বছর বঙ্গশ্রীর সেই সংস্কৃতি বৈঠক চলেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, মোহিতলাল মজুমদার, অশোক চট্টোপাধ্যায় এলে এঁরা প্রত্যেকেই আলোচনার কেন্দ্র হতেন, আসরের পরিধি বিস্তৃত হ'ত। প্রত্যেকের আকর্ষণের রীতি পৃথক। সরস গল্পে সুনীতিবাবু বিশেষ পটু। সম্মুখস্থ খবরের কাগজে ঢালা মুড়ি পেঁয়াজি বেগুনিতে আর সবার সঙ্গে একান্নবর্তী হাত চালাতেও সমান পটু ছিলেন। তিনি যেদিন চক্রের কেন্দ্রে বসতেন সেদিন আলাপের বিষয়-পরিধিটি সকল পৃথিবীকে বেষ্টন করত। তাঁর বিবৃত দুএকটি মজার গল্প আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র বলেছি।

সুশীলকুমার দে ছিলেন ফুলবাবু। গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, মিহি ধুতির কোঁচা মৃত্তিকাস্পর্শী। পোষাকের মতো তাঁর ভাষাও ছিল খুব সতর্ক এবং সুপরিমিত। হাসিমুখ, কণ্ঠে কিছু ব্যঙ্গের সুর, নিজ পাণ্ডিত্যের বিষয়ের আলাপ কম, সবই প্রায় ঘরোয়া আলোচনা। কখনো নিজের লেখা কবিতা প'ড়ে শোনাতেন। কাব্যের ভাব ও ভাষা সুসংস্কৃত, সুসম্বদ্ধ এবং সম্পূর্ণ ক্ল্যাসিক্যাল। চিত্রধর্মী বেশি।

মোহিতলাল মজুমদার আসতেন একটি কঠোর ব্যক্তিত্বের আবরণে মণ্ডিত হয়ে। এই সময়ে তাঁর কল্পিত প্রতিপক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে তাঁর ঐকপাক্ষিক যুদ্ধ চলছে অবিরাম। তাঁর বিরোধিতা তখন অন্তত রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ ভঙ্গি বা বিশেষ মতের বিরুদ্ধে নয়—গোটা রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ বলতে যা কিছু বোঝায়—তার বিরুদ্ধে। 'উইণ্ডমিল' তাঁর চোখে দৈত্যে রূপান্তরিত হয়েছিল ব'লেই এই বিভ্রাট; মোহিতলালের লিখনশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ, তাঁর ভাষা ছিল অতি ধারালো এবং স্বচ্ছ, বক্তব্য অজস্র। শুধু তিনি একটি বিশেষ মতবাদের মধ্যে নিজেকে কঠিনভাবে বেঁধে রেখেছিলেন ব'লেই তাঁকে যথেষ্ট দুঃখ পেতে হয়েছিল। অন্য কোনো মতের সঙ্গে তাঁর কোনো রফা ছিল না, তাঁর

মতই একমাত্র সত্য মত, এটি তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর লেখা ও বিশ্বাসে সমান জোর এবং সমান আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের ধারণার বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, আর ঠিক এই কারণেই সম্ভবত তিনি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। নির্বান্ধবও হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।

আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ভাল ছিল। আমাকে অনেক আক্রমণের হাত থেকে তিনি বাঁচিয়েছেন আমার পক্ষ অবলম্বন ক'রে। কারণ আমি কখনো তাঁর কোনো মতের প্রতিবাদ করিনি, তাঁর সব কথাই আমি চুপ ক'রে শুনে যেতাম। আমাকে সেজন্য তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখবেদনার কথা প্রাণ খুলে বলেছেন অনেক সময়। তাঁর ছিল সাহিত্যগত প্রাণ। সাহিত্যকে তিনি ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু সে ধর্মের গোঁড়ামিটুকু না থাকলে তা আরও উঁচুতে উঠতে পারত। তিনি 'সত্যসুন্দর দাস' এই নাম গ্রহণ করেছিলেন। কেবলই মনে হয়েছে—তাঁর সত্য ও সুন্দরের concept-টি যদি উদারতর এবং বৃহত্তর সত্য ও সুন্দরের সমবৃত্ত হত!

নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে হঠাৎ একবারে বোঝা যায় না। তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা বেশি। সব বিষয়ে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে এবং পছন্দ-অপছন্দের এমন প্রবলতা আর কারো মধ্যে দেখিনি। এ বিষয়ে তিনি একেবারে চরমপন্থী। মনেপ্রাণে তিনি ইংরেজধর্মী। ইংরেজ জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকেই আদর্শ জেনে সেই মানেই সব কিছু বিচার করতেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সমস্ত সত্তায়। এর অতিরিক্ত অন্য কিছুর সঙ্গে রফা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ইংরেজী ভিন্ন ফরসী জার্মান ভাষা তিনি জানতেন। ইউরোপীয় সঙ্গীততত্ত্বে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানসম্মত। জীবনের প্রতি, এবং সর্বশাস্ত্রের প্রতি, তাঁর এই অভিগম বা অ্যাপ্রোচ আমার পছন্দসই ছিল। নীতির দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি মূলগত আত্মীয়তা অনুভব করেছি, কিন্তু নিজের বিশ্বাসের পথে নিজের জীবনকে অভ্যাসকে চালনা করার কঠোরতা আমার মধ্যে কোথায়?

কত তিনি জানেন ভেবে বিস্মিত হয়েছি। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান সঙ্গীত ইতিহাস ভূগোলের তথ্যই যে তাঁর জানা তা নয়, সব বিষয়ের সকল তথ্যের

উপরে তাঁর স্বাধীন চিন্তা এবং নিজস্ব মত গঠনের অবকাশ ছিল প্রচুর। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষা শুধু বিদ্যা সংগ্রহে নয়, তা জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগের মূল সত্য দেখার ক্ষমতায় উত্তীর্ণ। তাই তিনি একই সঙ্গে সাহিত্য এবং সমরতত্ত্ব, চিত্রশিল্প এবং নৌবিজ্ঞান, কাব্য এবং ইতিহাস, সঙ্গীত এবং জীববিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নিজস্ব অভিমতসহ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য প্রবন্ধ লিখতে পারতেন। এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা দিয়েই সম্ভবত তিনি জ্ঞানরাজ্যের বর্ণপরিচয় আরম্ভ করেন। ম্যাকমিলান প্রকাশিত তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীতে সেই রকমই পড়েছি মনে পড়ে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগে তাঁর গতি সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। কোনো বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি সব সময় যত্ন ক'রে সে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতেন। অনেক সময়ে নিজের অসুবিধা অগ্রাহ্য ক'রেও এ কাজ তিনি করেছেন। তাই তাঁর কাছে কোনো বিষয় জানতে যেতে কোনো দ্বিধা হয়নি কখনো।

তাঁর রুচির বিশেষত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। বাছাই করা ইউরোপীয় সঙ্গীতের রেকর্ড সংগ্রহ ক'রে আসছিলেন অনেক দিন ধ'রে কিন্তু গ্রামোফোন নেই। বলতেন, একটি বিশেষ গ্রামোফোন ভিন্ন বাজারের কোনো যন্ত্র কিনবেন না। লণ্ডন থেকে আসা সেই বিশেষ গ্রামোফোনের পরিচয় দেখালেন একদিন আমাকে। গিন নামক এক ভদ্রলোকের হাতে তৈরি সেই যন্ত্র, কলে তৈরি নয়। বিরাট তার হর্ন। হর্নটি কাঠের তৈরি। সাউণ্ড বক্সে ফাইবার নীডল ব্যবহার করতে হয়। ধাতুনির্মিত নীড্‌লে কোনো রেকর্ড একবার বাজানো হ'লে সে রেকর্ড এ যন্ত্রে বাজানো যায় না। নীরদবাবু বলেছিলেন যে দিন এ রকম যন্ত্র কিনতে পারব, সেই দিন রেকর্ড শুনব। তিনি আমাদের একদিন বিস্মিত ক'রে সেই গিনের তৈরি গ্রামোফোনেই তাঁর রেকর্ড দু একখানা বাজিয়ে শোনালেন। বিজ্ঞাপনটি দেখেছিলাম ১৯৩৬ সালে সম্ভবত। গ্রামোফোনটি দেখলাম ১৯৪২ সালে। কিরণ ও আমি গিয়েছিলাম, সেদিন নীরদবাবুর কাছে যুদ্ধ বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে।

এ রকম গ্রামোফোন আগে দেখিনি। এ রকম কোমল এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বর যে গ্রামোফোনের হয়, তাও জানা ছিল না। একটি আবৃত্তির রেকর্ড শুনেছিলাম—

"Behold her, single in the field,
Yon solitary highland lass !
Reaping and singing by herself ;
Stop here or gently pass !"...

মধুর নারীকণ্ঠের আবৃত্তি—সম্পূর্ণ কবিতাটি এখনও কানে বাজছে, এমন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে এমন নাটকীয়তাহীন আবৃত্তিও আর শুনিনি। কবি মনের সমস্ত সেন্টিমেণ্টটি এই আবৃত্তিতে অদ্ভুত রূপ পেয়েছে। একবার শুনে মনে গাঁথা হয়ে আছে।

নীরদবাবুর মতো 'স্পেশালিস্ট ইন জেনারাল নলেজ' কল্পনা করাও দুঃসাধ্য এবং এদেশে নয়, বিদেশেও।

অশোক চট্টোপাধ্যায় আমাদের বৈঠকের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। প্রতিমুহূর্তে এবং প্রতিবিষয়ে তাঁর কল্পনার মনোহর ঔদ্ধত্য আমাদের কাছে পরম উপভোগ্য ছিল। নিজে না হেসে গম্ভীর ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মজার মজার গল্প বানিয়ে বলতে পারতেন। শুধু মুখে বলা নয়, ব্যঙ্গ কবিতা বা গল্প তিনি অবলীলাক্রমে লিখে যেতে পারতেন। শনিবারের চিঠিতে আমাকে প্রায় নিয়মিত লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর কল্পনায় যেমন ছিল অভিনবত্ব, তেমনি ছিল বলিষ্ঠতা। বাংলা ইংরেজী দুইই তাঁর সমান আয়ত্ত ছিল, হয় তো বা ইংরেজীতেই তিনি বেশি আরাম বোধ করতেন। বলিষ্ঠ দেহ, বলিষ্ঠ কল্পনা এবং কোমল হৃদয়। বন্ধুত্বে বয়স বা বিদ্যা বা শ্রেণীভেদ ছিল না। তাঁর মুখে শেষ গল্প শুনেছি বছর তিনেক আগে, যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে ব'সে।* ভূতের কথা উঠেছিল। জীবনে অনেক ভূত দেখেছেন তিনি, এবং এখনও দেখেন। ঘণ্টা দুই ধ'রে চার পাঁচটি ভূতের সাহায্যে বেশ জমিয়ে রেখেছিলেন সেদিন। সিকি শতাব্দীর ব্যবধান, গল্প বলা চলছে আজও, আগে যেমন চলত। শনিবারের চিঠি তাঁরই পরিকল্পনায় আবির্ভূত হয়, স্বত্বাধিকারীও ছিলেন তিনিই। সে ইতিহাস সজনীকান্তের আত্মস্মৃতিতে লেখা আছে।

নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে পরিচয় হয় এই সময়—মোহনবাগান রো-তে। গান্ধীজির শিষ্য নির্মলকুমার। আপন বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মজীবনকে মিলিয়ে চলছিলেন তিনি। মুখে নির্মল হাসিটি লেগে রয়েছে। উড়িষ্যার মন্দির

* এর পর দুবার দেখা হয়েছে, শেষবার হয়েছে যুগান্তর সাময়িকীতে ১২ই মার্চ ১৯৬০ তারিখে।

নিয়ে অনেক অনুশীলন করেছেন। ফোটোগ্রাফ তুলতেন তাঁর নিজস্ব গবেষণা কাজে। নির্মলবাবুর সঙ্গে একদিন আমাদের তখনকার প্রতিবেশী শিক্ষাবিদ অনাথনাথ বসুর বাড়িতে গিয়ে প্রথম লাইকা ক্যামেরা দেখি— লাইকার সেই সাবেকি প্রথম মডেল। এ দেশে তখনও ও ক্যামেরার চলন হয়নি। নির্মলবাবু ওটি ব্যবহার করতেন। সেই থেকে এই ক্যামেরার প্রতি আমার লোভ জাগে। কিন্তু ইচ্ছা ও পাওয়ার মধ্যে তখনও অনেক ব্যবধান।

সে সময় ক্যামেরাধারীর সংখ্যা এ দেশে সীমাবদ্ধ। তাই ক্যামেরায় ক্যামেরায় একটা সহজ আত্মীয়তা গ'ড়ে উঠত। আমাদের কাছে ক্যামেরা-সংস্কৃতির বিনিময় সে যুগে লোভনীয় ছিল। তাই নির্মলকুমার বসু ও অনাথনাথ বসুর সঙ্গে এ দিক দিয়ে আমার একটি পৃথক সম্পর্ক ছিল। আমাদের বৃহৎ বঙ্গশ্রী পরিবারে তখন আর কারোই ক্যামেরা ছিল না।

নির্মলবাবুর চরিত্রে বেশ একটি উদার মাধুর্য। সামান্য একটি ঘটনা বলি। একদিন তাঁর হাতে বড় একটি চামড়ার ব্যাগ দেখি। ব্যাগটি নতুন নয়, কিন্তু নির্মলবাবুর হাতে নতুন। উৎকৃষ্ট চামড়া, ওজন বেশ ভারি এবং তার ভিতর অনেকগুলি ঘর। শুনে চমকে উঠলাম—নির্মলবাবু ঐ ব্যাগটি সম্প্রতি বউবাজারের সেকণ্ড-হ্যাণ্ড বাজার থেকে মাত্র আড়াই টাকায় কিনেছেন! তখনই ওর দাম পঁচিশ টাকা বললেও বিশ্বাস করতাম। ব্যাগটিকে এবং তার ক্রেতাকে একই ভাষায় প্রশংসা করলাম। নির্মলবাবু খুব গর্বিত হলেন। পরদিন আবার তাঁর হাতে ঐ ব্যাগ দেখে আবার তাঁর এই ব্যাগ-ভাগ্যের উচ্চ প্রশংসা করলাম। তিনি যদি বলতেন ব্যাগটি বিনামূল্যে পেয়েছেন, তাহলে বলবার কিছুই ছিল না, কিন্তু আড়াই টাকায় ও রকম একটি ব্যাগ পাওয়া এবং সে কথা প্রচার করার মধ্যে একটি নিষ্ঠুরতা আছে। শুনে মনে আঘাত লাগে না কি?

পরদিন ঐ ব্যাগ নিয়ে আবার এলেন নির্মলবাবু এবং এসেই আমাকে কিছুই বলতে না দিয়ে বললেন, ব্যাগটি আপনাকে দিলাম। বলতে দিলেন না এই জন্য যে, কি বলব তা জানতেন। অতএব বৃথা সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি। সে সময়ে অতি-আনন্দে নির্মলবাবুর পরিবর্তে হয় তো

ব্যাগটিকেই জড়িয়ে ধরেছিলাম। তবে ব্যাগের কাহিনী যে এইখানেই শেষ নয়, সে কথাটাও এই প্রসঙ্গে বলা দরকার।

ব্যাগ পেয়ে, তখন আর কিছু ভাবতে পারিনি, কিন্তু পরদিন থেকে মনে একটু দুঃখ জাগল। আমার প্রশংসার মধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে হয় তো কিছু লোভও জেগেছিল, এবং তা নির্মলবাবু বুঝতে পেরেছিলেন। জ্ঞাতসারে যে জাগেনি তার কারণ ও রকম একটি সুন্দর ব্যাগ যে অনায়াসে হস্তান্তরিত হ'তে পারে এ কল্পনা আমি করিনি। তাই বন্ধুর শখের জিনিসটিতে কিছু লজ্জার কারণ ঘটল। তদুপরি ব্যাগটি ওজনে এত ভারী যে আমার পক্ষে সেটিকে মূল্যবান আসবাবের মতো ঘরে ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় ছিল না। দুতিন দিন বাইরে বহন ক'রে হাতে ব্যথা হয়েছিল।

এবং ঠিক দুতিন দিন পরে হঠাৎ সজনীকান্ত একটি আট টাকা দামের নতুন ব্যাগ আমাকে দিয়ে বললেন, ওটা আমাকে দিন।

দুদিক থেকে হাল্কা হওয়া গেল, ওজনের দিক থেকে এবং মনের দিক থেকে। শুনে মনে হবে সবটাই একটি সাজানো ব্যাপার এবং প্রত্যেকটি ধাপ পূর্বকল্পিত, কিন্তু সত্যিই তা নয়। তবে আমি এর পর থেকে সাবধান হয়েছি—নির্মলবাবুর কোনো শখের জিনিস আর কখনো এক বারের বেশি প্রশংসা করিনি।

নির্মলবাবুকে লিখতে বলছিলাম কিছুদিন ধ'রে যে কোনো বিষয়। তিনি রাজি হলেন এবং কয়েকটি লেখা নিয়ে এসে বললেন, এগুলো চলবে? পড়ে দেখি সে এক আশ্চর্য রচনা। তাঁকে Cultural Anthropology র জনক এবং উড়িষ্যারমন্দির সমূহের স্থাপত্য বিষয়ের, ও বিশেষ ভাবে কোনারকের মন্দিরের, 'আমিন' ব'লে জানতাম—সাহিত্য রসস্রষ্টারূপে জানতাম না, এই উপলক্ষেই তা জানার সুযোগ হ'ল। তিনি চলতি পথে যে সব বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছেন, যে সব ঘটনা ঘটতে দেখেছেন, তারই কয়েকটিকে বেছে নিয়ে এমন এক একটি ছবি এঁকেছেন যা শিল্প বিচারে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। 'সঞ্জয়' ছদ্মনামে তিনি একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ রচনাও লিখেছেন। চরিত্র ও ঘটনা-চিত্র অনেকগুলি একত্র ক'রে তাঁর 'পরিব্রাজকের ডায়ারি' বই। এ বইয়ের সংস্কারান্তর ঘটেছে। নামটি আমারই দেওয়া।

নির্মলবাবু পরিব্রাজকই। আপন গবেষণা বিষয়ে নিষ্ঠাবান কর্মী, গান্ধীজির ধর্মে দীক্ষিত, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি নেই, ভাবাবেগ অন্তরে থাকলেও, কাজের বেলায় বিশ্লেষণী পরীক্ষায় না টিকলে তার দিকে ঝোঁকেন না। তাই তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ My days with Gandhi তিনি যে নিস্পৃহতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন, তা গান্ধী ভক্তদের কাছে খুব প্রিয় হয় নি।

নির্মলবাবু প্রকৃত রসিক ব্যক্তি। খুব মজার মজার গল্প তাঁর স্মৃতি ভাণ্ডারে আছে। এক দিন একটি ক্যামেরা উপলক্ষে বেশ একটি নাটক রচনা করলেন। একটি আশ্চর্য ক্যামেরা, নাম কম্পাস, বিজ্ঞাপন দেখেছি অনেক, চোখে দেখিনি। এত ছোট যে প্রায় হাতের মুঠোয় ধরে। এ রকম চতুষ্কোণ একটি ক্যামেরা, কিন্তু তার মধ্যে এমন জটিল সব আয়োজন যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। তিন রকম ফিলটার, তার মধ্যে প্লেট, রোল ফিল্ম, দু রকম তোলার ব্যবস্থা; এবং এ ছাড়াও পঞ্চাশ রকম কৌশল। এতটুকু যন্ত্রে এত ব্যবস্থা—প্রায় কমিকের পর্যায়ে উঠেছে। নির্মলবাবু আমার সামনে সেই ক্যামেরা ধ'রে এবং কোনো রকম ভূমিকা না ক'রে, অবিরাম একটার পর একটা বিস্ময় দেখাচ্ছেন আর বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। সেদিন তিনি একটি মনোহর ম্যাজিশিয়ানের ভূমিকা নিয়েছিলেন এই ক্যামেরাটিকে আশ্রয় ক'রে।

এই ক্যামেরাটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এই জন্য যে এই সঙ্গে আমিও একটি মানবিক কম্পাস ক্যামেরার কথা পাড়ব এখানে। তাঁর নাম প্রমথনাথ বিশী। যন্ত্রটি হ্রস্বদেহ কিন্তু তার মধ্যে এমন বিচিত্র সব বিস্ময় আছে যা চরম চিত্তগ্রাহী। তাঁকে দেখে প্রথমেই মনে হবে—মনে হবে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটি—"এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়!" অন্যান্য বিস্ময় একটার পর একটা উদ্‌ঘাটিত হবে পরিচয়ের পর। এতদিনে তাঁর প্রায় সব পরিচয়ই প্রকাশিত, কিন্তু তখন অধিকাংশ ক্রিয়া চলেছে ছদ্ম নামের আড়ালে। তখন স্কট টমসন, অমিত রায় ও স্বনামে তিনি ত্রিধা বিভক্ত ছিলেন, এখন প্র-না-বি ও স্বনামে দ্বিধা-বিভক্ত। আগে, লঘু গুরু দুই-ই, এখন লঘু কম, গুরু বেশি এবং গুরুগিরি আরও বেশি। একাধারে নাট্যকার, গল্প লেখক, উপন্যাস লেখক, সমালোচনা লেখক,

রসরচনা লেখক, প্রবন্ধ লেখক এবং কবি। 'কবি' গাল দেওয়ার ভাষা রূপে ব্যবহার করছি না, প্রকৃত কবি। চেহারায় এবং চরিত্রে এমন পরস্পর বিরোধিতা সহজে দেখা যায় না। তাঁর কলমে মধুর এবং গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকম্পিত কাব্য-কথাগুলি এক অপরূপ প্রকাশব্যঞ্জনায় ঝলমল ক'রে ওঠে। তাঁর কবিতার ভাষায় ইন্দ্রজাল রচিত হয়। সেদিনের অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাঁকে ঘিরে। অজস্র লেখা লিখেছেন তখন, এখন আরও বেশি। কল্পনা বিস্তার বিস্ময়কর। আমাকে সব রকম লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর তিন চারটি নাটক, এক কলম ক'রে রসরচনা, ধারাবাহিক ব্যঙ্গ কবিতা এবং অনেক টুকরো ব্যঙ্গ রচনা আমি পেয়েছি। একবার 'স্বর্ণ সীতা' সম্পর্কিত একটি ব্যঙ্গ রচনা আমরা দুজনে মিলে লিখেছিলাম—একই রচনা প্রথম দিক প্রমথনাথের, শেষের দিক আমার। তখনকার দিনের এ সব কথা মনে পড়লে মন পুলকিত হয়।

প্রমথবাবু সে সময় বঙ্গশ্রী আসরের কয়েক জনকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন সম্পূর্ণ বেনামি। কবিতাটির নাম ছিল পুরাতন পঞ্জিকা (শ, চিঠি, মাঘ ১৩৪১, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)। এই কবিতায় আমার অংশটি বাদ দিয়ে ছেপেছিলাম। এর মধ্যমণি সজনীকান্ত। তারপর কিরণকুমার রায়, নিখিলচন্দ্র দাস, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল প্রভৃতি অনেকের চরিত্র। এই চরিত্র-চিত্রণে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা যায়, স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনেকেরই বেশ ফুটে উঠেছে। দুএকটি উদ্ধৃত করি—প্রথমে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—

দু'ভল্যুম ডান হাতে, দু'ভল্যুম বামে
দু ভল্যুম ফেলে রেখে পথে কিংবা ট্রামে
আলুথালু কেশপাশ কে দাঁড়াল আসি
স্খলিত চাদর ঐ বেদনা বিলাসী ?
দুঃখেরে কে আর্ট রূপে করেছে অভ্যাস,
সদাই নয়নে কার সন্ধ্যার আভাস ?
বেদনার বৈতরণী-তরণী নাবিক
বিরহের অনলের কে মহা সাগ্নিক ?

আপনারা নাম বিনা একে চিনিবেন—
স্বনামা পুরুষ ধন্য ইনি শ্রীনৃপেন।

তারপর কীটতত্ত্ববিদ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—

বাসাহারাদের লাগি কে মরেন কেঁদে?
ভ্রমিছেন পথে পথে চাঁদা সেধে সেধে?
কার বাসা? কারা তারা? হরিজন নাকি?
কত টাকা প্রয়োজন, কত টাকা বাকি,
তাহাদের নাম কিবা শুধায় সবাই
বৈজ্ঞানিক গোপালদা বলে হায় ভাই,
তাদেরি লাগিয়া মোর যাহা কিছু শিখা
হতভাগ্য ভগ্নবাসা ক্ষুদে পিপীলিকা।

তারপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—

মফঃসল হতে কার চলে যাওয়া-আসা,
কলমে অলম্ নাহি; মুখে নাহি ভাষা।
কে লেখে অমর গ্রন্থ আয়ু চিরকাল
না পড়িয়া উপন্যাস কন্‌তিনাতাল।
রাই-কমলের সূর্য (কুয়াশা-মলিন)
ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট কার দেহখানি ক্ষীণ।
নাম নাই করিলাম। (নাহি মেলে ছন্দে)
সকলেই জানে তারে খ্যাতির সুগন্ধে।

তারাশঙ্করের তখনকার পরিচয়টি এতে পাওয়া যাবে। তবে এই রাই কমলের যুগে অতি চমকপ্রদ ছোট গল্প লেখাও চলছে একের পর এক। তার সুবিখ্যাত জলসাঘর প্রভৃতি এই সময়েই লেখা।

তখনকার দিনে সবচেয়ে উৎসাহী বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক ছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। এঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের গবেষণা বিষয়ে বাংলাদেশে এঁর দৃষ্টান্ত ইনি একা। এঁর জীবন কথা অতি বিচিত্র এবং অনেক সময় অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়কর। এঁর কীট বিষয়ে গবেষণা এবং সে বিষয়ে বিদেশী বিজ্ঞানী মহলে প্রশংসা পাওয়া—সবই তাঁর নিজগুণে, অর্থাৎ তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষা কলেজে নয়, কলেজ দর্শন তাঁর ভাগ্যে সামান্যই ঘটেছিল, তাঁর যা কিছু শিক্ষা নিজে

চোখে দেখে, এবং নিজের গরজে অনুশীলন ক'রে। বিজ্ঞানে এ রকম নিষ্ঠার কথা আমরা কেবল বিদেশী বিজ্ঞানীদের বেলাতেই শুনি। অতএব এঁর জীবনী প্রচারের প্রয়োজন আছে।

অ্যামেরিকার ন্যাচুর্যাল 'হিস্টোরি ম্যাগাজিন,' 'সায়েন্টিফিক মান্থলি' এবং লণ্ডনের এণ্টোমলজিক্যাল সোসাইটির জার্নাল ও এদেশের বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর গবেষণা বিষয়ে বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠে লেখকের সরল বর্ণনাভঙ্গি ও নিজ বিষয়ে অধিকারের বিস্তার দেখে পাঠক যখন মুগ্ধ হচ্ছেন, তখন কি তিনি কল্পনা করতে পারবেন যে এই গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রথম যৌবনে কবির দল খুলে গ্রামে গ্রামে কবি ও জারি গান গেয়ে বেড়াতেন? কিংবা সাহেবদের পাটকল অফিসের টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অপারেটরের কাজ করতেন? কিংবা ম্যাজিক দেখাতেন?

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এখন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মাসিক পত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্পাদক। তিনি আমাদের সকলেরই গোপালদা, ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন, আমার দুবছর আগে। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ ক'রে বসে থাকতে পারেন, কথা বলার মধ্যে সহজে ঢুকতে চান না। কিন্তু প্রেমেন মিত্রের 'ঘনাদা'কে যেমন তাঁর সঙ্গীরা বহু কৌশলে উস্কানি দিয়ে তাঁকে তাঁর আশ্চর্য সব কাহিনী বিবৃত করার চোরাবালিতে নিয়ে ফেলত, আমাদের গোপালদাকেও অনেকটা সেইভাবে উস্কে দিতে হয়। তারপর বজ্র বিদ্যুৎ সহ আবেগ ঝড় বয়ে যাবে। মাকড়সা, পিঁপড়ে, ব্যাঙ, শ্রোতার কাছে যত তুচ্ছ হোক, এদের যে কোনো একটিকে উপলক্ষ ক'রে এক একটি জগৎ গড়ে উঠবে আমাদের চোখের সামনে। কীট পতঙ্গ সাপ ব্যাঙের জীবনে তাঁর যে উন্মাদনা, তা অনেক সময় প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পান না তিনি। জৈবতত্ত্বে এমন অসাধারণ বিস্ময় এবং তার এমন আবেগময় প্রকাশ আমি অন্য কোনো বিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিনি।

তাঁর গবেষণার ব্যাপারে একটি করুণ ও একটি কৌতুককর ঘটনা আমি মনে রেখেছি। দুটোই তাঁর মুখে শোনা। একবার ক্যামেরা নিয়ে এক পল্লীপথে চলতে হঠাৎ দেখেন পথের পাশের একটা ঘরের বেড়ায় মাকড়সা জাল বুনছে। গোপালদার চলা থেমে গেল, তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন সেইখানে।

সে দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানো তাঁর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। তিনি আর সব ভুলে পলকহীন চোখে মাকড়সার বয়নবিদ্যা দেখতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাটাও ট্রাইপডে দাঁড় করাচ্ছিলেন তার ছবি তোলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মাকড়সাটি তার জাল বোনার স্থান বিষয়ে বিবেচনাশূন্য ছিল, কারণ স্থানটি ছিল একটি জানালার পাশে। সেটি বোঝা গেল যখন বাড়ির মালিক সাক্ষাৎ যমদূতের মতো এসে দাঁড়ালেন গোপালদার পাশে, এবং এসেই চ্যালেঞ্জ ক'রে বসলেন—ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এ সব হচ্ছে কি? গোপালদার কথা আর কে বিশ্বাস করে, মাকড়সার জাল-বোনার ছবি তোলার মতো একটি বাজে কৈফিয়ৎ সেখানে চলল না। ভদ্রলোক গোপালদার গায়ে হাত তুলেছিলেন সেদিন, ক্যামেরাও অক্ষত ছিল না। তবে গোপালদা যেটুকু দেখেছিলেন এবং তাতে তাঁর যেটুকু আনন্দ হয়েছিল ঐ গায়ে হাত তোলাকে যদি তার দাম ধরা যায়, তা হ'লে গোপালদার মতে দামটি শস্তাই।

গোপালদা এক সময় ব্যাঙ নিয়ে অনেক পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। একটি লোক কলকাতার বাইরে থেকে এসে তাঁকে ব্যাঙ সরবরাহ করত। এই লোকটির ধারণা ছিল গোপালদা ব্যাঙের মাংস খান, নইলে নিয়মিত ব্যাঙ কেনার আর কি মানে থাকতে পারে। তবে তার এ ধারণা সে মনে মনেই রেখেছিল, কারণ ব্যাঙ বেচে সে পয়সা পাচ্ছে, তার অতশত জানবার দরকার কি। মাত্র এক দিন সে গোপালদাকে একটি খবর গোপন করতে পারেনি। খুব পুষ্ট একটি ব্যাঙ এনে বলেছিল, "আজকে এ ব্যাঙটি অতি সুস্বাদু হবে, বাবু, আজ একটু বেশি দাম দেবেন।"

চতুর্থ পর্ব

প্রথম চিত্র

আমাদের দেশে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব দিয়ে প্রথম বিজ্ঞানের সূত্রপাত। আমাদের গোপালদার জীবনে একটি ভূত দিয়ে।

গোপালদা যে গ্রামের বাসিন্দা সেখানে এক বর্ষাকালে দারুণ গুজব র'টে গেল যে মাঠের মধ্যে অবস্থিত পাঁচির মায়ের ভিটেয় ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে। ভূতেরা সেখানে প্রতি রাত্রে নিশ্চিন্তে আগুন জ্বালাচ্ছে।

রাত্রে কেউ সে পথে যেতে আর সাহস করে না। বহু দূর থেকে সে আগুন দেখতেও কেউ রাজি নয়। যারা একবার দেখেছে তারা এমনই আতঙ্কগ্রস্ত যে তাদেরও কারো আর দ্বিতীয় বার দেখার প্রবৃত্তি নেই।

সেটি আলেয়ার আলো নয়, কারণ সে আগুন একই জায়গায় জ্বলে।

গোপালদা ঠিক করলেন ব্যাপার কি দেখবেন। কিন্তু ভয়ে যেতে পারেন না। মনের একদিকে দুরন্ত বাসনা, অন্য দিকে সংস্কার এবং আতঙ্ক। অবশেষে ঠিক করলেন দুচার জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরোতে হবে।

মাত্র দুজনকে রাজি করানো গেল অনেক পরিশ্রম ক'রে।

বর্ষাকাল, গুঁড়ো গুঁড়ো হাল্কা বৃষ্টি ঝরছে। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা, রাত্রি নিরেট অন্ধকার। এমনি পরিবেশে, এমন ভয়ঙ্কর নির্জন গ্রাম্য প্রান্তরে তিন তরুণ চলেছেন ভূতের সন্ধানে। সঙ্গে একটি মাত্র হারিকেন লণ্ঠন আর ছাতা।

যথানির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গিয়ে প্রায় ৮০ গজ দূর থেকে তাঁরা দেখতে পেলেন সামনে কচুবন ঘেঁটুবন পার হয়ে তাল ও তেঁতুল গাছের সিলুয়েটের আড়ালে জ্বলছে সেই আগুন। জ্বলছে আর নিবছে।

সামনের ঝোপ ঠেলে এগোতে হবে। তিনজনেই হতবুদ্ধি। অবশেষে এক জন তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেই ফেললেন লজ্জার মাথা খেয়ে। বললেন ভূত দেখতে এসেছিলাম ভূত দেখেছি, আমার শখ মিটে গেছে ভাই,

আমি চললাম।—কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করলেন শুকনো গলায়, কাঁপা সুরে দমিত ভঙ্গিতে। তাঁকে আর ঠেকানো গেল না। কচু পাতার মতোই কাঁপতে কাঁপতে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। বাকী রইলেন দুজন।

গোপালদা একটু এগোন, এবং অস্বাভাবিক চিৎকার ক'রে বলেন "চলে এসো আমার সঙ্গে।" কিন্তু সঙ্গী বলেন, "কি কাজ?" গোপালদারও মনে হয়, "কি কাজ?"

গতি মিনিটে এক পা। অবশেষে দুজনে কোনো রকমে ঝোপের এলাকা পার হয়ে যান। এবং গিয়ে বুঝতে পারেন, আগুন জ্বলছে-নিবছে না। ও রকম মনে হয়েছিল সামনের ঝোপগুলোর নড়া-পাতার আড়াল থেকে।

আগুন স্থিরভাবে জ্বলছে। উজ্জ্বল আগুন, চোখের ভুল হবার কথা নয়।

গোপালদা সঙ্গীকে বলেন, "এসো ভাই।"

সঙ্গী বলেন, "না।" এবং কাঁপতে থাকেন। গোপালদার মনের জোর ভেঙে পড়তে চায়। ইনিও কি শেষে ফিরে যাবেন?

গোপালদা অগত্যা বলেন, "এক কাজ কর। তোমার যদি খুব বেশি ভয় হয়ে থাকে, তা হলে আর ঐ আগুনের দিকে তাকিও না। তুমি ছাতা আড়াল দিয়ে এইখানে বসে থাক, আমি একা এগোই।"

শেষে অনেক বিতর্কের পর তাই ঠিক হ'ল। ছাতা খুলে ভূতের আগুনকে আড়াল ক'রে তিনি ব'সে পড়লেন সেইখানেই। সম্ভবত রাম নাম করছিলেন ব'সে ব'সে এবং এই দুষ্কার্যে রাজি হওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন।

গোপালদার অবস্থাও খুব উৎসাহজনক নয়। কিন্তু দলপতির পিছিয়ে আসা চলে না। তিনি দুহাত এগিয়ে যান আর অতিরিক্ত এবং অস্বাভাবিক জোরে চিৎকার ক'রে বলেন, "এই তো আমি চলছি, এসো চ'লে আমার সঙ্গে, কোনো ভয় নেই। বুঝলে? কোনো ভয় নেই।"

ছাতার আড়ালে উপবিষ্ট সঙ্গী আরও জোরে চেঁচিয়ে বলেন "কোনো ভয় নেই।"—ঠিক আমাদের ছোট্ট মিতুর মতো, সে ভয় পেলে 'ভয় নেই, ভয় নেই' ব'লে ছুটতে থাকে।

অবশেষে আত্মভয়-নিবারক চিৎকারের রক্ষাকবচকেই একমাত্র সম্বল ক'রে গোপালদা গিয়ে পৌঁছলেন সেই ভূতের অগ্নিকুণ্ডে।

সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বহুদিনের কাটা তেঁতুলগাছের গোড়ায় জ্বলছে সেই আগুন। বর্ষার জলে ভিজে ভিজে কাঠ পচে উঠেছে। এই পচা গুঁড়ি থেকে দেখা যায় এই আলো। আগুন নয়, অন্তত জ্বলন্ত আগুন নয়। পচা ভিজে কাঠে শুধু আলো বিকিরণ করে।

গোপালদা সেই গুঁড়িতে সন্তর্পণে হাত দিলেন। হাতে লেগে গেল তার ছোঁয়া। আঙুল থেকে আলো বেরোয় যে! সেই পচা এবং আলো বিকিরণকারী গুঁড়ি হাতে ভেঙে ভেঙে অনেকগুলো টুকরো সংগ্রহ ক'রে ফিরলেন গোপালদা। ছাতার আড়ালের সঙ্গী তখনও ছাতা ও রাম নামের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা ক'রে চলেছেন।

সংগৃহীত টুকরোগুলিকে গোপালদা বিজ্ঞানের ভাষায় (এবং পুলিসের ভাষাতেও) যাকে বলে অবজারভেশনে রাখা, তাই করলেন। তিনি দেখলেন শুকোলে আলো দেয় না, ভিজিয়ে দিলে অদ্ভুত আলো দিতে থাকে। জলে ডুবিয়ে রাখলে আশ্চর্য সুন্দর দেখায়।

এই তথ্যের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কৃত আর এক ঘাস জাতীয় আলো-বিকিরণকারী উদ্ভিদের তথ্য মিলিয়ে গোপালদা প্রবাসীতে এক প্রবন্ধ লেখেন। এই সময় গোপালদা কোনো এক উপলক্ষে কলকাতায় আসেন। ডাক্তার সহায়রাম বসুও এ সময় ছত্রাক নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি প্রবন্ধ লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং আলো বিকিরণকারী ছত্রাক সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারেন। গোপালদা সাইকেলে ঘুরে ঘুরে তাঁর জন্য অনেক নমুনা সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন। অবশেষে গোপালদার ঐ লেখা আচার্য জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, এবং তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে বসু বিজ্ঞানমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

কলেজের শিক্ষা প্রায় কিছুই না পেয়ে আপন গরজে বিজ্ঞানের পথে এতদূর এগিয়ে আসার দৃষ্টান্ত সম্ভবত এদেশে দ্বিতীয় নেই।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রে সেকালের কথা তখন সবে বেরিয়েছে। কিন্তু এই সময়ে অন্তত তাঁর আসল জগৎ রামমোহন রায়ের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ যখনই যে বিষয়ে গবেষণা করেছেন

তাইতেই এমন ডুবে গেছেন যে আপন গবেষণা বিষয়ের বাইরে কোনো আলাপই তিনি জমাতে পারতেন না। মোহনবাগান রো-এর বাড়িতে কোনো কোনো শনিবারে আলাপের সীমা স্বাভাবিক গণ্ডি অতিক্রম করত, সে কথা আগে বলেছি। একগুঁয়ে দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, অথচ আলাপে হাসিমুখ বন্ধুবৎসল এবং রসিক। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু নানা প্রয়োজনে আমাকে যে সব চিঠি লিখেছেন তার সব গুলোতেই সম্বোধন লিখেছেন 'পরিমলদা'। মজার কথা এই যে আমার দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ এখনও আমাকে এই সম্বোধন করেন—একজন হেমেন্দ্র-কুমার রায়, অন্যজন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। একজনের বয়স প্রায় সত্তর, অন্যজনের পঁয়ষট্টি।

ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদের ব্রজেনদা ছিলেন। তাঁর চরিত্রে যে একগুঁয়েমি এবং দৃঢ়তা দেখেছি তারই বৃহত্তর সংস্করণ দেখেছি গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর চরিত্রে। মোহিতলাল মজুমদারকে এঁদের সঙ্গে এক বন্ধনীভুক্ত করা চলে।

রামমোহন রায়কে নিয়ে দুটি শক্তিশালী দলের মধ্যে এই সময় খুব টানাটানি চলছিল। রাজারাম এবং শেখ বকসু, ভিন্ন কি অভিন্ন, এই ছিল দ্বন্দ্বের প্রধান বিষয়। এক দিকের নেতা রমাপ্রসাদ চন্দ, অন্য দিকের নেতা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত রমাপ্রসাদ চন্দই জয়লাভ করেছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী রাজা রামমোহন রায় (জীবন চরিতের নূতন. খসড়া) নামক একখানি বই প্রকাশ করেন। গিরিজাশঙ্কর এক অদ্ভুত চরিত্র। গবেষণাকাজের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি সুন্দর মিলেছিল। তাঁর কথার মধ্যে কোথাও ফাঁক রাখতেন না, নিজে আইনজীবী, অতএব আটঘাট বেঁধে কথা বলতেন। নিজের উপর প্রবল দ্বিধাহীন বিশ্বাস, কারো সঙ্গে কোনো রফার প্রশ্ন নেই। খুব মজার মজার খবর বানিয়ে বলতেন, আমাকে দু একবার চিঠিতেও এমন খবর দিয়েছিলেন। এইখানে তাঁর আইনের কথা ভুল হ'ত, রসিকতা ছিল বেপরোয়া। বহুকাল পরে তাঁকে ১৯৫৩ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাছে তাঁর শ্রীরঙ্গমের বাড়িতে দেখেছি। তবে তিনি আমাকে দেখেছেন কি না সন্দেহ, বলেছিলেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, এবং চোখ কালো কাঁচে ঢাকা ছিল।

১৯৩৩ সালে রামমোহন স্মৃতি শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয়। এই শতবার্ষিকীর এক প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রচার সচিব অমল হোমের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় ঘটে। তখন তিনি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক। মধুরভাষী দীর্ঘদেহ এবং ব্যক্তিত্বে অতি স্বতন্ত্র। তিনি যেখানে উপস্থিত থাকেন সেখানেই তিনি তাঁর চারধারে একটি অনুপেক্ষণীয়রূপে আকর্ষক আবেষ্টন ফুটিয়ে তোলেন, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না। ক্রমে এঁর আরও কাছে আসবার সুযোগ ঘটেছে নানা উপলক্ষে, এবং তাঁর বন্ধুবাৎসল্যে মুগ্ধ হয়েছি। অমল হোম বাংলা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত, সম্প্রতিকালে প্রকাশিত তাঁর 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' তার সাক্ষ্য বহন করছে।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে অমল হোম বহু তথ্য সম্বলিত খুব চমৎকার একখানি প্রচার পুস্তিকা সম্পাদনা করেন। এই পুস্তিকা পরে অমল হোম সহযোগে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত The Father of Modern India, Commemoration Volume of the Rammohan Roy Centenary Celebrations, 1933 (প্রকাশকাল ১৯৩৫) নামক বৃহৎ স্মারক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৩৩ সালেই মুঙ্গের থেকে আগত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। সে শনিবারের চিঠির লেখক। তার ছদ্মনাম চন্দ্রহাস। এর সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব গাঢ় হ'ল। একটা সম্পর্কও বেরিয়ে পড়ল।—আমরা ১৯১৭-১৮তে একই সঙ্গে একই সেকশনে বিদ্যাসাগর কলেজে বি.এ. পড়েছি। কিন্তু এই পরিচয়ের আগে কেউ কাউকে দেখেছি মনে পড়ল না। তবু অজান্তে হলেও দুটি বছর আমরা একসঙ্গে উঠবোস করেছি এতেই আনন্দ।

শরদিন্দু কবি, গল্পকার, নাট্যকার এবং উপন্যাস লেখক। খুব মিষ্টি হাত। ডিটেকটিভ গল্প লেখায় অপরাজেয়। তার ব্যোমকেশ সবার পরিচিত। বৈষ্ণব সাহিত্য হজম ক'রে এবং ইংরেজী রোমান্স সাহিত্যের প্রভাবে অতিমাত্রায় রোমান্স প্রিয়, তার লেখা গল্পেও তার ছাপ। কৌতুক রচনাতে অসাধারণ নিপুণ। শনিবারের চিঠিতে তার যে সব কৌতুক কবিতা আমি ছেপেছি এতদিনে তার সংকলন প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কেন হয়নি জানি না। তার লেখা কৌতুক কাব্যের কিছু কিছু নমুনা আমি উদ্ধৃত

করছি। কবিতার নাম 'পলাতকার প্রতি' (কার্তিক ১৩৪০)। প্রণয়িনী হারু শীলের সঙ্গে পালিয়েছে। কবির দুঃখ—"প্রিয় চারু শীলে (শেষে হারু শীলে ?) ইত্যাদি। তার পর অপ্রত্যাশিত এবং চমকপ্রদ সব সংবাদ কবিতাটিকে উপভোগ্য ক'রে তুলেছে—

"সত্য যদি চটিয়াছিলে আমার পরে মানময়ী
দিলে না কেন বচনশরঘাতং
শুনলে গুটি কয়েক তব ধারালো বাণী শানময়ী
তখনি সখি হতাম আমি কাতং।"

তারপর এক জায়গায়—

"হারুটা অতি বেয়াড়া ছোঁড়া ফচকে পাজি চ্যাংড়া গো
তাহার পরে দারুণ দারু খোরং
দুদিন পরে খেদায়ে দিবে মারিয়া পিঠে খ্যাংরা গো
তখন হবে বিপদ অতি ঘোরং।"

শরদিন্দুর আরো একটি কবিতা আমার কাছে খুব ভাল লেগেছিল। কৃষ্ণ রাধিকার বিরুদ্ধে সখীর কাছে অভিযোগ করছেন, এই হচ্ছে বিষয়। কবিতাটির নাম দুর্জয় মান: (ভাদ্র ১৩৪১) বহু অভিযোগের মাঝখানে কৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন—

"নিকটে যাই যব কর দুহুঁ ধারই
চাহিলুঁ টুটইতে মান।
নাসাপর মুঝ ঘুঁষি চলাওল
দারুণ বজর সমান।
মুণ্ডু ঘুরি হম পড়লু চরণ তলে
নয়নে হেরি আঁধিয়ার।
তবহুঁ সো কোপ কঠিন-হিয় নাগরি
মোহে ন করল পিয়ার।
চরণ ধরিতে যব কর পরসারলুঁ
নিতম্বে মারল লাথি।
কুঞ্জ তেজি হম দ্রুতগতি ভাগলু
আগ ভয়ে জনু হাতী॥"......

রাধিকা কৃষ্ণের নাকে ঘুসি চালাচ্ছেন, নিতম্বদেশে লাথি মারছেন এবং কৃষ্ণ অগ্নিভীত হাতীর মতো কুঞ্জ ছেড়ে পালাচ্ছেন—এ সবই মারাত্মক

রকমের উপভোগ্য বিশুদ্ধ কৌতুক। শরদিন্দুর কৌতুকসৃষ্টির বিশেষ রীতির সঙ্গে এই ভাষা সুন্দর মানিয়ে গেছে। এ ছাড়াও অনেক লঘু বা গুরু কবিতা সে লিখেছে। তার মধ্যে তার 'শালী' আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই শালীর প্রেরণা হচ্ছে বনফুলের 'শালা'। 'শালা' প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৪১ সংখ্যায়। পরিকল্পনার দিক থেকে এই ধারালো ব্যঙ্গ কবিতাটি মৌলিক এবং তুলনাহীন। বাংলাদেশের দেশপ্রেম, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিভাগের ভণ্ডদের বিরুদ্ধে এর এক একটি পদ এক একটি গোলার মতো ফেটে পড়ছে। অতএব 'শালী'র ভূমিকা স্বরূপ 'শালা'র কিছু অংশ (আরম্ভ ও শেষ অংশটি) উদ্ধৃত করি আগে—

"সামান্য মনুষ্য নহ নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা.
হে শ্যালক, হে স্বভাব শালা।
বঙ্গদেশে বহু বেশে বহুবার দেখেছি তোমারে
রচিয়াছি তব জয় মালা।
বহুবার ক'রে গেছ অকিঞ্চন চিত্ত-পরশন,
সভামঞ্চে নেতৃবেশে হে শ্যালক সৌম্য দরশন,
প্রাণের আবেগে যবে বক্তৃতা করেছ বরষণ,
সে বাণীর জ্বালা—
বহু করতালি যোগে প্রাণমন করি' ধরষণ
কর্ণদুটি করিয়াছে কালা,
হে শ্যালক, হে স্বদেশী শালা।"......

এ রকম দশটি পদ। সবাইকে আক্রমণের পরেও যদি কেউ বাদ প'ড়ে গিয়ে থাকে, সেই সন্দেহ কবিকে পীড়িত করল, অতএব—

"অপরিচয়ের মাঝে থাক তুমি অশ্যালক বেশে
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালামূর্তি বাহিরায় এসে।
আত্মবন্ধু পরিজন কাছে গিয়ে দেখি হায় শেষে,
শালা, সব শালা!
দিন যায়, ক্রমে দেখি শালা সাগরেতে এসে মেশে—
দুনিয়ার যত নদীনালা,
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা।"

ফাল্গুনের শালা, শালীকে আহ্বান করল বৈশাখে। বিশুদ্ধ মধুর রস। (বলা বাহুল্য, স্বভাবতই)। শরদিন্দু মধুর রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তাই এমন সুন্দর একটি কবিতা পাওয়া গেল। এ কবিতা কি আজও মাসিক পত্রের পাতায় আত্মগোপন ক'রে আছে? বনফুলের শালা কিন্তু প্রকাশ্যে বেরিয়েছে দুভাবে। প্রথমত তার 'বনফুলের কবিতা' নামক বইতে, দ্বিতীয়ত সেনোলা রেকর্ডে নিজকণ্ঠের আবৃত্তিতে। শরদিন্দুর শালী হয় তো এখনো মাসিকের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন ক'রে আছে। আমি তার কিছু অংশ প্রকাশ করছি—

"নহ প্রৌঢ়া, নহ বৃদ্ধা, নহ শিশু, নহ নাবালিকা
হে তরুণী রূপসী শ্যালিকা।
ওষ্ঠে যবে আলতা দিয়া ভালে পর খয়েরের টীপ,
চাহিয়া তোমার পানে বুক মোর করে টিপ টিপ!
মনে হয় কেন আমি হলাম না দিল্লী-বাদশাহ
অথবা কুলীন পুত্র—গুষ্টিসুদ্ধ করিয়া বিবাহ
জীবন নির্বাহ
করিতাম মহানন্দে কুসুমে কুসুমে
পরিমল চুমে।......

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি হেসে ওঠে খিক খিক করি'
তোমার সরসবাক্যে—নিরঞ্জন মহিমা বিস্মরি;
তোমার গায়ের গন্ধে নাসারন্ধ্রে, শ্বাস বহে ঘন
বেলেল্লা মাতাল সম কবিকুল বিদারে গগন,
সঙ্গীত মগন।
মুচকি হাসিয়া চাও স্ফুরিত-ঈক্ষণা,
বিলোল স্বক্কণা।

শ্বশুর ভবনে যবে দেখা দাও হে বিদ্যুৎ শিখা,
দ্যুতিময়ী বিদুষী শ্যালিকা;
রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজি উঠে হৃদয়ের শতচ্ছিদ্র বাঁশি;
কদম কেশর সম মুণ্ডে উঠে রোমাঞ্চ বিকাশি;
চাহিয়া তোমার পানে অচঞ্চল রহে আঁখিতারা;
ভায়রা-ভায়ের ভাগ্য ভাবি' ভাবি' চিত্ত আত্মহারা
বহে অশ্রুধারা।......

ঐ শুন লুব্ধ কবি তোমা লাগি রচিছে লালিকা,
হে নিষ্ঠুরা বধিরা শ্যালিকা।

স্বর্ণযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর ?
বহু-বিবাহের রীতি প্রচলিত হইবে আবার ?......
মিলিবে না মিলিবে না—ভেঙ্গে গেছে সে গৌরব টীকা,
হে সুদূর—দুর্লভ শ্যালিকা।

তাই আজি ধরাতলে জামাইষষ্ঠীর মধুমাসে,
চির-শ্যালী বিরহের হাহুতাশ মিশে ভেসে আসে;
পূর্ণিমা-নিশীথে যবে শত চাঁদ-বদনেতে হাসি—
গৃহিণীর কলকণ্ঠ শ্রবণে বাজায় ভাঙা কাঁসি—
ঝরে অশ্রুরাশি ;

হতাশ হইয়া টানি গাঁজার কলিকা
হে মোর শ্যালিকা।"

শালী সম্পর্কে শরদিন্দুর যে আক্ষেপ, এ জাতীয় কবিতার সম্পর্কেও সেই আক্ষেপ করা চলে। এ ভঙ্গিও আর ফিরবে না।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী তখন সপ্তাহিক নবশক্তির সম্পাদক। সার্কুলার রোডের নবশক্তি অফিসে তখন প্রায় নিয়মিত যেতাম। ১৯৩২ সাল সেটি, তখনও শনিবারের চিঠিতে যাইনি। নবশক্তিতে এই সময় অনেক লেখাই লিখেছি—সবই ব্যঙ্গ গল্প। সরোজ মধুর ভাষী এবং তীক্ষ্ণ রসবোধ সম্পন্ন, তার সান্নিধ্য ভাল লাগত। কিরণের সঙ্গে এর পূর্ব-বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। বঙ্গশ্রী অফিসের বৈঠকে সরোজ প্রায় নিয়মিত আসত। দৈনিক বঙ্গবাণীর ঘরেও প্রবেশ করেছি মাঝে মাঝে। এইখানে শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা হ'ত। শশাঙ্কমোহনের নামের সঙ্গে চেহারা এবং স্বভাবের মিল ছিল তখন থেকেই। মাথায় টাক এবং মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বর্তমানে টাক আরও বিস্তৃত হয়ে সবটাই চাঁদের চেহারা পেয়েছে। শশাঙ্কমোহন আমার বহুপূর্বেই 'কালপরিক্রমা' শেষ করেছেন, আমি সবে আরম্ভ করেছি।

প্রেমেন্দ্র এবং শশাঙ্কমোহন—এ দুজনের সঙ্গেও কিরণের মাধ্যমেই

প্রথম পরিচয় হয়। প্রেমেন্দ্র উপাসনাতে 'সেতু' নামক একটি কবিতা লিখেছিল —তার আরম্ভ ছিল এই ঃ

"বিরাট সেতু এ ধারের সাথে
ও ধার জুড়িতে চায়,
সে সেতু হয়েছে পার ?"……

এখন ভাবি, সেই সেতু কি কিরণ ?—

সরোজের কাছে ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীও যেতেন মাঝে মাঝে। যথেষ্ট আড্ডা দেওয়ার পর আমরা সরোজের সম্পাদকীয় লেখার কাজকে নির্বিঘ্ন ক'রে উঠে পড়তাম ওখান থেকে। পথে নেমে ডাক্তার এমন সব কাহিনী আরম্ভ করতেন যা শেষ হ'ত এসে ময়দানে। পা দুটো তখন প্রায় অচল।

১৯৩৪-এর জানুয়ারি। দুপুরের পরেই আমি এসেছি বঙ্গশ্রী অফিসে। তার পর এলো শিল্পী অরবিন্দ দত্ত, তারপর ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ। সজনীকান্ত অনুপস্থিত, কিরণ কক্ষান্তরে। অরবিন্দ গল্প জমাতে ওস্তাদ এবং পার্থিব এবং অপার্থিব সর্ববিষয়ে তার নিজস্ব একটা থিওরি আছে। সেগুলো সে বেশ মনোহর ভাষায় বর্ণনা করতে পারে। বটকৃষ্ণ ঘোষ মিতভাষী অতএব সে দিনের সভায় তখন একমাত্র বক্তা অরবিন্দ। এমন সময় টেবিল কেঁপে উঠল। আমি অত্যন্ত ভূমিকম্প-সচেতন, আমার ভিতরে হয় তো একটি অদৃশ্য সাইজমোগ্রাফ যন্ত্র আছে, আমি চকিতে দেখে নিলাম টেবিল কেউ কাঁপাচ্ছে কি না। দেখলাম দুজনেই টেবিল থেকে দূরে—এবং তখনি ভূমিকম্প ঘোষণা ক'রে সবাই একসঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এলাম পথে। দেখি কিরণও এসেছে, এবং আরও অনেকে।

এ ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন, এমন প্রবল ভাবে আগে কখনো দুলিনি, বিপদেও না, স্ফূর্তিতেও না। আর এ শুধু অনুভব নয়, ভূমিকম্প নিজ চোখে দেখা। এর যে একটি চেহারা আছে তা আগে জানা থাকলেও ঠিক এমন ভাবে দেখিনি। লী মেমোরিয়ালের বাড়ি ও ওয়েলিংটন স্কয়ারের কাছাকাছি ধর্মতলা স্ট্রীটের উপরে দাঁড়িয়ে দুলছি। এর মধ্যে ঘড়িও দেখে নিয়েছি। মোট প্রায় সাড়ে তিন মিনিট লেগেছিল দোলা থামতে। পায়ের নিচে যেন আশ্রয় নেই, অদ্ভুত একটা অনুভূতি। পথ, বাড়িঘর,

গাছপালা সব যেন অবাস্তব, এখুনি চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাবে। সমস্ত জমি একবার এদিকে আর একবার বিপরীত দিকে হেলে পড়ছে। এত দিনের নির্ভর এবং স্থায়ী আশ্রয় এই জমি, তাকে মুহূর্ত কালের জন্যও অবাস্তব মনে হ'লে মন অতিমাত্রায় বিচলিত না হয়ে পারে না। অতএব ভূমিকম্প শুধু বাইরেই নয়, ক্ষণকালের জন্য মনেও ঘটে গেল। সব যেন একটা অদ্ভুত উত্তেজনার ধাক্কায় এলোমেলো হয়ে গেছে। আমরা শুধু একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছি—কোথায় এই সর্বনাশা ভূমিকম্পের এপিসেণ্টার? কোথায় সব ধ্বংস হয়ে গেল? ঘরে ফিরে আসছি, সিঁড়িতে তখনও পা কাঁপছে। সরু গলির ওপারে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের বাস। তারা এতদিন তাদের ঘর থেকে আমাদের মাঝে মাঝে দেখেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। সে দিন তাদের একটি মেয়ে বিচলিত ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে "What happened?" উত্তরে শুধু বলেছিলাম "A great thing!" সবাই এমন উত্তেজিত যে সেই মুহূর্তে কারো মনে আর কোনো অপরিচয়ের সঙ্কোচ ছিল না।

পরে জানা গেল সব। বিহার অঞ্চলের মর্মভেদী কাহিনী সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। মুঙ্গেরের শরদিন্দু ভাগলপুরের বলাই প্রভৃতির কাছে পরে শুনেছি তাদের কেউ বা সবাই মিলে কেউ বা আংশিকভাবে চাপা পড়তে পড়তে দৈবাৎ বেঁচে গেছে, বাড়ি ভেঙে পড়েছে চোখের সামনে। তখন সেখানে ভূমিকম্প বিষয়ে যে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তাই সবাই চোখবুজে বিশ্বাস করছে। তার জন্য সেই দুর্দান্ত শীতে সেখানে অনেককেই দেহকম্পন অগ্রাহ্য ক'রে বাইরে তাঁবুর আশ্রয়ে থাকতে হয়েছে গৃহকম্পনের ভয়ে। সেবারে কলকাতাতেও অসম্ভব রকমের শীত পড়েছিল।

এর কয়েক দিনের মধ্যেই ফরওয়ার্ড কাগজে বিহার ভূমিকম্পের সচিত্র খবর প্রকাশিত হয়। আমি হঠাৎ আবিষ্কার করি এই ছবি আগে কোথাও যেন দেখেছি। আগেকার কোনো ভূমিকম্পের ছবি। হয় তো ব্লক হাতের কাছে ছিল, কে আর ফাঁকি ধরে, এই মনোভাব থেকেই এই কাণ্ড। এটি আবিষ্কার ক'রে ভূমিকম্পে যতটুকু উত্তেজিত হয়েছিলাম, তা থেকেও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, এবং তারপর সজনীকান্তকে উত্তেজিত

করলাম। দুষ্ট বুদ্ধি জেগে উঠল সম্মিলিত ভাবে। চারখানা ব্লক আনা হ'ল বঙ্গশ্রীর "চতুষ্পাঠী"তে ছাপা ছবির। একটিতে স্পাইরাল নেবুলা, একটিতে আনাতোল ফ্রাঁস, একটিতে গ্যালিলিও, একটিতে মাউণ্ট উইলসন অবজারভেটরির টেলিস্কোপ। সজনীকান্ত শয়ন-কক্ষে ব'সে "ভারতপথিক ফরওয়ার্ড" নামক একটি ব্যঙ্গ রচনা লিখে দিলেন ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে। চারখানা পূর্ণপৃষ্ঠা হাফটোন ব্লক ছাপা হ'লঃ নীহারিকার ছবির ক্যাপশন দেওয়া হ'ল 'ভূমিকম্পের পূর্বে ষড়্গ্রহের সম্মিলন।' আনাতোল ফ্রাঁসের ক্যাপশন হ'ল 'ভূমিকম্পের পর নলিনী-রঞ্জন সরকার।' গ্যালিলিওর ক্যাপশন হ'ল 'ভূমিকম্পের পর শোকার্ত বিধানচন্দ্র রায়। টেলিস্কোপের ক্যাপশন হ'ল 'ভূমিকম্পের পর ভাগলপুরের একটি টিউবওয়েল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত (ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ল্যাবেরেটরির সন্নিকট)।'

এ সব প্রকাশিত হ'ল মাঘ ১৩৪০ সংখ্যায়! বিষয়টি এমনই জরুরি বোধ হয়েছিল যে সেটি বিশেষ রামমোহন রায় সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও শেষের দিকে এর জন্য স্থান ক'রে দেওয়া হ'ল।

এই প্রসঙ্গে দুষ্টুমিবুদ্ধির আরও কয়েকটি ছবি মনে আসে। শরৎচন্দ্রের শিরে তখন রঙ্গব্যঙ্গ বর্ষণ করা হচ্ছিল নিয়মিত। একদিন কোনো সাপ্তাহিক কাগজে একটি ছবি দেখে সেই ছবির ব্লকখানা ধার ক'রে আনলাম। ছবিটি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে উৎকৃষ্ট। থিয়েটারের অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঘছাল প'রে গলায় মাথায় সাপ জড়িয়ে ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ব্লকখানা শরৎচন্দ্রের অন্য একখানা কার্টুন ছবির পাশে ছাপা হ'ল, ছবির উপর লেখা রইল 'মহেশ', নিচে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কৌতুক সৃষ্টির অদম্য বাসনা দিকে দিকে আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল। মাত্রা ছাড়িয়েছে অনেকবার। ১৯৩৪ সালের দোলের দিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আনন্দবাজার পত্রিকার কয়েকজন উৎসাহী এলেন আবির নিয়ে। তরল এবং চূর্ণ রঙে সব একাকার। কাউকে চেনবার উপায় নেই। সজনীকান্ত ও আমি মুহূর্তের মধ্যে অতিরঞ্জিত হলাম। মুখে মাথার চুলে, এবং জামাকাপড়ে রঙের (এবং বেরঙের) এমন আতিশয্য যে আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চেনা যায় না। সঙের ধর্মে দীক্ষিত হ'লে মনে হিংসা জাগে, অন্যকে আক্রমণ করতে ইচ্ছা হয়। পরিচিত সবাইকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত না করা পর্যন্ত ভাল লাগে না। অতএব তখনই ঠিক করা হ'ল আমরা ওখান থেকে নিকটস্থ বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে যাব। তিনি তখন মোহনলাল স্ট্রীটের মোড়ের বড় বাড়িটার দোতলায় থাকতেন। তিন তলায় থাকতেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু তিনি সাহেবী মেজাজের মানুষ, অত দূরে উঠে লাভ নেই, অতএব লক্ষ্য দোতলাতেই আবদ্ধ করা গেল।

দল ধ'রে দোতলায় উঠে নলিনীদার দরজায় জোর ধাক্কা মেরে মেরে নলিনী দা, নলিনী দা, হাঁক দিলাম। মিনিট খানেক পরে আপাদমস্তক কম্বল জড়ানো প্রবল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এক চাকর জ্বরের ঘোরে কাঁপতে কাঁপতে এসে দরজা খুলে দিল এবং অতি করুণ এবং আর্তকণ্ঠে কোনোমতে বলল বাবু তো বাড়িতে নেই। ব'লেই সেই দারুণ গ্রীষ্মে হুহু ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল। চাকরকে অযথা এতটা কষ্ট দিতে হ'ল এ জন্য দুঃখিত হলাম সবাই। নলিনীদাকে না পেয়ে দমেও গেলাম খুবই।

পরদিন স্তম্ভিত হয়ে নলিনীদার মুখে শুনি, তিনি স্বয়ং অসুস্থ চাকরের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। কি মারাত্মক কথা! অভিনয়টা সেদিন এমন সফল হয়েছিল যে তিনি আমাদের নাকের কাছে এগিয়ে এসে অতগুলো কথা ব'লে গেলেও আমরা ধরতে পারিনি। অমন গরমের দিনে মোটা এক র‍্যাগ্ গায়ে-মাথায়-জড়ানো, এবং থরথর ক'রে কাঁপা সেই ছদ্মবেশ ভেদ করা সম্ভব ছিল না। দুঃসাহসিক অভিনয় বলতে হবে। মরীয়া হয়ে এতখানি রিস্ক নিয়েছিলেন তাই রক্ষা, নইলে সামান্য একটু ইতস্তত ভাব থাকলেও নলিনী দা সেদিন ধরা প'ড়ে যেতেন।

এই ঘটনাটি তিনি তাঁর 'হাসির অন্তরালে' পর্যায়ের একটি লেখায় এই ভাবে লিখেছেন—

"...বুড়ো শালিখের শখ হয়েছে হোলি খেলতে। এসেছেন সাহিত্যিকের দল। সটান উপরে উঠে এসে বন্ধ দরজার কপাটে ধাক্কার পর ধাক্কা, আর ডাকাতের দলের মতো 'দে রং দে রং' চিৎকার। কোনো উপায় না পেয়ে আমি আপাদমস্তক কম্বল-মুড়ি দিয়ে, দরজা খুলে থর থর

ক'রে সারা দেহ কাঁপাতে কাঁপাতে গিয়ে অবনতমস্তক হয়ে আর্তস্বরে তাঁদের নিবেদন করলাম, বাবু বাড়ি নেই।

"সাহিত্যিক বন্ধুরা সেই প্রকাশ্য দিবালোকে আমার উক্তিকে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চাকরের উক্তি ভেবে হতাশ মনে সিঁড়ি বেয়ে নিচে চলে গেলেন।"

ঘটনাটা বিস্তারিকভাবে আলোচনার পক্ষে কিঞ্চিৎ লঘু হলেও নলিনীদার লেখার একটি কথার প্রতিবাদ করি। তিনি সামনে এসে যখন দাঁড়ালেন তখন অবনত মস্তক ছিলেন না—মাথা সোজাই ছিল, কারণ কম্বলের ঘোমটার ভিতর দিয়ে তাঁর জ্বরে ছলছল চোখের দুটি চিহ্ন আমি দেখেছিলাম। পরে ভেবে দেখেছি, ছলছলটা জ্বরের ছল নয়, চাপা কৌতুকের উচ্ছলতা।

আরও একটি মজার ঘটনা। রেলের এক কর্মচারী সদাশয় সাহিত্য-প্রেমিক ভূপেন্দ্রনাথ নন্দী প্রায় আসতেন বঙ্গশ্রী অফিসে। তিনি এক দিন নেমন্তন্ন করলেন তাঁর দেশে—ডানকুনিতে। শোনা গেল সকল দলের সাহিত্যিক সেখানে গিয়ে মিলবেন এবং কিছু একটা আলোচনা করবেন। সেটি যে কি তা আজ আর মনে আনা সম্ভব নয়, কেননা বিষয়টিতে আমি অন্তত কোনো গুরুত্বই দিই নি। মনে হচ্ছে সেটি ১৯৩৩ সাল। ৩৩ কি ৩৪ তাও এ ঘটনার পক্ষে অবান্তর। তবে কালটা গ্রীষ্ম এ কথাটি বেশ মনে আছে, কারণ সেখানে গিয়ে প্রচুর আম খেয়েছিলাম, সে কথাটা আরও বেশি মনে আছে।

আমাদের দিকের নেতা সজনীকান্ত। আমরা অনেক আগে গিয়ে দোতলায় একটা ঘর দখল করেছিলাম। সেখান থেকে উঠোনটা বেশ দেখা যায়, জানালার নিচেই উঠোন। শনিবারের চিঠির তৎকালীন তথা-কথিত বিরোধী দলের অনেকে এসে পৌঁছলেন সেখানে। আমাদের ডাক পড়ল, কারণ সভার কাজ তখনি আরম্ভ হবে। এমন সময় সজনীকান্তের মাথায় এক মতলব এলো, তিনি ভূপেনবাবুকে বললেন, একটা মজা করতে চাই, আমরা আর সভায় যাব না, এখানে ব'সে সব দেখি। ভূপেনবাবু কি ভেবে আর বেশি টানাটানি করলেন না। দোতলা থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখব এ প্রস্তাবটা আমাদের সবারই খুব ভাল লাগল, এবং আমরা আগাগোড়া অন্তরালেই রইলাম। বক্তৃতা করলেন তাঁরা একে একে। কে

কি বলবেন তখন তা শোনার কোনো মনও ছিল না, কোনো উদ্দেশ্যও ছিল না। আমরা ছোট ছেলেদের মতো মহা কৌতুক অনুভব করছিলাম আগাগোড়া। সভা ভঙ্গ হ'লে আমরা ওখান থেকে রওনাও হয়েছিলাম সবার পরে, এবং কলকাতা ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল।

তথাকথিত বিরোধীদল বলেছি এ জন্য যে শনিবারের চিঠি এ সময়ে আর কোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করছে না। কিন্তু তবু আগের ঐতিহ্য রেখে চলার চেষ্টা করা হ'ত মাত্র। অচিন্ত্যকুমার বা প্রবোধকুমারের সঙ্গে তখন আমার পরিচয়ই ঘটেনি। ১৯৩৪ সালে কৈলাস বসু স্ট্রীটে কবি প্রণব রায় নাগরিক নামক একখানি পত্রিকা বা'র করেন। এঁর সঙ্গে সুনীল ধর ছিলেন, ফণীন্দ্র পালও সম্ভবত। এই কাগজে আমি লিখেছি এবং এখানে মাঝে মাঝে এসেছি। এই নাগরিক অফিসেই অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় এবং এইখানে ব'সে যেমন অন্য দিন অন্যান্যের সঙ্গে, তেমনি একদিন অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে, বাগাটেল খেলেছি। মহৎ কিছু নয়, কিন্তু আমি যে কখনো দলের কোনো বাধা অনুভব করি নি এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। আরও একটি গৌণ দৃষ্টান্ত এই যে অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে আমার নাম এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, এবং সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে (প্রথম খণ্ড) আমার নাম এক স্থানে উল্লেখ করেছেন। দু দিন থেকেই আমার প্রতি সমদৃষ্টি, অতএব আরও প্রমাণ আমি কোনো দলের নই।

হঠাৎ খেয়ালের ঝোঁকে চলায় সজনীকান্তর জুড়ি ছিল না। একেবারে চরম পন্থী। এ সব ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা খুলে যেত তড়িৎ গতিতে। এমন ইম্‌পাল্‌সিভ একটি চরিত্র সব সময় চিত্তাকর্ষক। নিজে সম্পাদক হয়ে সহকারী সম্পাদক কিরণকুমারকে কতবার ভয় দেখিয়েছেন, "কাজ ফেলে আড্ডা না দিলে চাকরি খেয়ে দেব।" এ কথাটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে এর মনোহারিত্বের জন্য। আর ঠিক এই রকম ব্যবহার ছিল ব'লেই কাজে ত্রুটি হত না ব'লে আমার বিশ্বাস। জোর ক'রে ক্ষমতা চাপাতে গেলে সম্পর্ক বিস্বাদ হয় এবং কাজে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি জাগে।

অজিতকৃষ্ণ বসুর আগমন ঘটে এই সময় শনিবারের চিঠিতে। অ-কৃ-ব এই ছদ্ম নামে লিখতে আরম্ভ করলেন। সম্পূর্ণ আক্রমণ বর্জিত বিশুদ্ধ

কৌতুক রচনায় তাঁর নৈপুণ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। মানুষটিও বড়ই ভাল। সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার, এবং তাঁর সঙ্গ সব সময়েই প্রসন্নকর। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আর এক মনে রাখবার মতো চরিত্র। শিল্পী ও কবি। কয়েকটি কবিতা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, তার ব্যবহারে মধুর এক আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি। তখন প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন, সমাজ সেবার কাজে মেতে।

অন্যত্র প্রকাশিত কোনো এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতিবাদে এক পাল্টা প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এলো এক তরুণ লেখক—নাম সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী। সঙ্গে বঙ্গশ্রীর সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। মূল প্রবন্ধের বিশ্লেষণ ও বিচার ছিল সুধাংশুর প্রবন্ধে। প'ড়ে দেখি ভাষা যেমন চমৎকার, যুক্তি তেমনি জোরালো, এবং সমস্ত রচনাটি মৃদু শ্লেষের আবরণে বেশ উপভোগ্য। এই সূত্রে সুধাংশু-প্রকাশের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারি নি যে সে অনেক বিষয় গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন করেছে এবং তার যাবতীয় বিদ্যা সে তার মগজের গোপন সিন্দুকে পুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্টিফেন লীককের একটি রচনার নাম 'এ ম্যানুয়েল অফ এডুকেশন'—তাতে তিনি যাবতীয় কলেজীয় বিদ্যা শেষ পর্যন্ত সামান্য একটুখানি যা মনে থাকে তার একটা তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি অত্যন্ত ছোট। তাতে জার্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ের সম্পর্কে তাঁর যে টুকু মনে আছে তা এই: A German. Very deep, but it was not really noticeable when he sat down. সুধাংশুপ্রকাশ সম্পর্কেও আমার শেষ ধারণা ঐ একই, শুধু জার্মানের স্থানে বেঙ্গলী বসাতে হবে। সুধাংশু অন্তত বারোটি বিষয়ে সত্যিই পণ্ডিত, তা আবিষ্কার করতে আমার চব্বিশ বছর লেগেছে। বর্তমানে সে হাফ ডাক্তার নামে খ্যাত, কেননা সে এখন 'ইওর হেলথ' নামক ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিক পত্রের সহকারী সম্পাদক। Very deep!

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে আজকের দিনের লোকেরা হয়তো সিনেমা-পরিচালক রূপেই বেশি জানে। এ রকম জানা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর সিনেমা-লাইনে আসার পিছনে কতদিনের প্রস্তুতি ছিল তা অনেকের জানা নেই। শৈলজানন্দ বঙ্গবাণীর কণ্ঠে কথা সাহিত্যের যে মহামূল্যবান মালা

পরিয়েছিলেন তা কখনো ম্লান হবে না। কিন্তু গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। এ দেশে যখন থেকে সিনেমাছবি তৈরি হচ্ছে প্রায় তখন থেকে তাঁর দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট। শুধু দৃষ্টি নয়, তাঁর সমস্ত মন প্রাণ ধ্যান ধারণা সিনেমাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি নিজে সিনেমা দেখতাম নিয়মিত, তাঁর সঙ্গে আমার সিনেমাতেই দেখা হ'ত অধিকাংশ সময়। তারপর যখন রেডিওতে (১৯৩৬-৪১) সাপ্তাহিক সিনেমা ও থিয়েটার সমালোচনা আরম্ভ করি, তখন শৈলজানন্দকে প্রত্যেক সিনেমায় নিয়মিত সঙ্গী রূপে পেয়েছি। তিনি এই ভাবে সিনেমা (-তান্ত্রিক) সাধক হয়েছেন। তখন তাঁর উত্তর-সাধক ছিল কবি ও গল্প লেখক সুবল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দুজন সর্বদা এক সঙ্গে।

শৈলজানন্দের ৫২ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে মাঝে মাঝে গিয়েছি। একতলার ঘরে ধুলিমলিন সতরঞ্চি বিছানো। বিড়ির টুকরো ইতস্ততঃ। সেইখানে ব'সে সিনেমার ধ্যান। একেবারে প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকিং। শুধু চিন্তা নয়, কাগজে বিজ্ঞাপন চলছে "আমারে বিকাতে চাই, কে নিবি ভাই আপনারে?"—ভাবটা এই রকম। উৎকৃষ্ট সিনেমাগল্প সিনারিও সমেত তৈরি, বিক্রির জন্য প্রস্তুত আছে, এই জাতীয় বিজ্ঞাপন। এইভাবে চলতে চলতে একাগ্র নিষ্ঠার বলে শৈলজানন্দ একদিন সিনেমার পথ খুঁজে পেয়ে আপন প্রতিভাবলে একতলা থেকে তেতলায় উঠে গেলেন। ভালোমানুষ, কারো সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ করতে দেখিনি। আপন ধর্মে নিষ্ঠা দেখে অবাক হয়েছি।

শৈলজানন্দ ১৯৩৪ সালে 'ছায়া' নামক একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বা'র করেন। কোনো দিক দিয়েই ছায়ার আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেন নি। এই কাগজের জন্য আমার কাছে একটি লেখা চেয়েছিলেন; লেখা একটি দিয়েছিলাম, সেটি ছায়ার দ্বিতীয় সংখ্যা (বৃহস্পতিবার ১০ই শ্রাবণ ১৩৪১)-তে ছাপা হয়। একখানা চিঠির আকারে ছোট্ট লেখা। এটি ছিল বাংলা সিনেমার প্রথম হাস্যকর যুগ। তার আগে অন্তত সাত আট বছর বাংলাদেশে সিনেমা ছবি রচনার অভ্যাস করা হচ্ছে, কিন্তু সাইকেলে ওঠা শেখার প্রথম পর্যায়ের মতো তা শুধু 'হপিং' বা একপায়ে লাফানো, তার বেশি কিছুই না। অবশ্য আজও যে সাইকেলে চড়ার

সমস্ত কৌশল আয়ত্ত হয়েছে এমন কথা কোনো সিনেমা-সুহৃদের মুখেও শোনা যাবে না। আমার সেই চিঠিখানার অংশ উদ্ধৃত করি, তা থেকে সে যুগ সম্পর্কে একটুখানি আভাস পাওয়া যাবে।

"সম্পাদক মহাশয়, আপনার যখন 'ছায়া' দেখা দিয়াছে তখন কোনো দিক হইতে আলোকপাত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর সে আলো যদি অন্তর্দাহেই জ্বলিয়া থাকে, তাহা হইলেও ছায়াপাত হইতে আটকাইবে না, কাজেই···

"সাপ্তাহিক কাগজ···অতএব ধরিয়া লইতে পারি সিনেমা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আপনারা করিবেন। অর্থাৎ কতগুলি বিদেশী ছবির প্রশংসা করিবেন এবং অনেকগুলি দেশী ছবির শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন।·· আপনারা দেশী ছবির নিন্দা করিবেন কেন? এই জড়-ভরতের দেশে কতকগুলি মূর্তি পর্দার উপরে নড়িয়া বেড়াইতেছে ইহাই কি যথেষ্ট নহে? যাহারা বসিতে পাইলে শুইতে চায়·· তাহারা দলে দলে ছুটিয়া গাছে উঠিতেছে, নদীতে সাঁতার দিতেছে, মারামারি করিতেছে, এই দৃশ্যেই তো বাঙালীর বুক গর্বে আনন্দে ফুলিয়া উঠে। আমার মনে হয় নড়াটাই আসল, ইহার উপরে আর কোনো সত্য নাই। আপনার নিশ্চয় মনে আছে পাঁচ বছর পূর্বে সরস্বতী পূজার দিন এক সরস্বতী মূর্তির গলায় মালা কাঁপিতেছিল। সে দিন বাঙালী···মহা হুল্লোড়ে সে দৃশ্য দেখিয়া ভক্তিতে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিল। সেই বাঙালী সিনেমা দেখে। আমরাও বাঙালী, আমরা নড়ার বেশি আর বুঝি না।"······

এই উদ্ধৃতিতে যে মালা কাঁপার কথা আছে, তা শ্যামবাজারের একটি দোতলায় অবস্থিত সরস্বতীর মালার। আমিও গিয়াছিলাম দেখতে। দেখেই বোঝা গেল সরস্বতীর আসনের বিশেষ অবস্থানভঙ্গি ও মালার সুতোর বিশেষ অবস্থান—বাইরের পথে চলা ভারী লরি বা ট্রামের যোগাযোগে উক্ত অলৌকিক ঘটনাটি ঘটাচ্ছে। দেখার আগেই অবশ্য আমি এটি ভেবে গিয়েছিলাম। এবং যাঁরা অলৌকিক ভেবে গিয়েছিলেন, তাঁরাও এর মধ্যে অলৌকিক হাত স্পষ্ট দেখেছেন। ফেরবার সময় অপরিচিতদের সঙ্গে তর্ক বেধে উঠল (তাঁদের মধ্যে দুজনকে আমি চিনতাম, তাঁরা পরে প্রসিদ্ধ হয়েছেন)। আমার বক্তব্য ছিল এই যে আগে লৌকিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ শেষ হোক, তারপর অলৌকিক ভাবা যাবে, কিন্তু সে প্রস্তাবে কেউ রাজি নন। অগত্যা আমি বাকী পথটা নীরবে কাটিয়ে দিলাম।

উল্লেখিত 'ছায়া' সাপ্তাহিকের দুটি বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল, এই দুটি বিজ্ঞাপন আজ ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতে পারে। একটি মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়ঃ

কলগীতি

১৬ বিবেকানন্দ রোড

আমাদের দোকানের বিশেসত্ব কলগীতির যাঁরা নিয়মিত খরিদ্দার হবেন তাঁদের বাড়িতে পাঁচটি কোম্পানীর প্রতি মাসের সমস্ত রেকর্ড শুনে পছন্দ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে।... তাঁদের অর্ডারি রেকর্ড ইত্যাদি আমাদের লোক গিয়ে বাড়িতে দিয়ে আসবে।

কাজী নজরুল ইসলাম

স্বত্বাধিকারী।

আর একটি বিজ্ঞাপন—

নবনাট্য মন্দির

। সুসংস্কৃত ষ্টার রঙ্গমঞ্চ ।

শনিবার ২৮ শে জুলাই (১৯৩৪) রাত্রি আটটায়

—পরদিন সাড়ে পাঁচটায়—

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

বিরাজ বৌ

নাট্যরূপদাতা—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি

নীলাম্বর—শিশিরকুমার

বিরাজ—শ্রীমতী কঙ্কা

এখন হইতে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন।

মাত্র ২৪ বছর আগের ঘটনা—অথচ সবই কেমন সেকেলে মনে হয়, এবং উভয় বিজ্ঞাপনদাতাই অদ্যাবধি জীবিত !*

গোপাল হালদার বর্তমানে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং সমাজকর্মীরূপে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। আমি যখন শনিবারের চিঠিতে প্রবেশ করি তখন গোপাল হালদার কারাবাসে, এই রকম শুনেছিলাম। তাঁর একটা লেখা সজনীকান্তের মারফৎ পাই। লেখককে তখনো আমি দেখিনি। যে লেখাটি পেলাম সেটি একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ গল্প ছন্দে লেখা। অতএব তাঁকে আমি কবি এবং ব্যঙ্গ লেখক রূপেই প্রথম জানবার সুযোগ পেলাম। তারপর অনেক বছর পরে যখন তাঁর সঙ্গে সত্যিই পরিচয় ঘটল, তখন দেখি আর এক ব্যক্তি। ব্যঙ্গ কবিতার লেখক রূপে তাঁকে আর চেনা গেল না। (হ'তে পারে হয় তো ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন ব'লেই তাঁর জেল হয়েছিল।)

* এই অংশটি ১৯৫৮ তে লেখা। দ্বিতীয় সংস্করণের এই অংশের প্রুফ দেখছি ১৯৬০, ৩০শে জুন। শিশিরকুমার ভাদুড়ির মৃত্যু হয়েছে—১৯৫৯, ৩০শে জুন। ঠিক এক বছর আগে।

লেখাটির নাম 'সোফা ও খোঁপা'। নানা ছন্দে রচিত একটি প্রথম শ্রেণীর ব্যঙ্গ গল্প। শনিবারের চিঠির ১১ পৃষ্ঠা অধিকার করেছিল সেটি। কবি কুপারের অনুসরণে—কবিতাটির আরম্ভ এই রকম—

"I sing the Sofa
তার সনে জড়িত যে খোঁপা।
চিরদিন রহিবে স্মরণে
ধরনে গড়নে আর নড়নে-চড়নে।
তোমারে প্রণাম তাই কবি কাউপার।
বহু কাউ করিয়াছি পার
হোটেল টেবিলে
(শূন্য ট্যাঁকে ফিরিয়াছি শোধ করি বিলে
তুলিয়া ঢেকুর, কিন্তু) তবু
ওহে মহাকবি! কভু
ভাবিনি গাহিতে হবে সোফার গীতিকা"……

সোফার উপরে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উচ্চ ধাপে উত্তীর্ণ দুই পরিবারের দুই প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়বিদারক ট্র্যাজিডি এই কাহিনীর বিষয়। শেষ দিকের একটুখানি উদ্ধৃত করলেই তার সামান্য কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে—যদিও কাহিনীর বারো আনা ব্যঙ্গ পিছনে ফেলে আসতে হ'ল শেষ দিকের একটি দৃশ্য দেখাবার জন্য। পূর্ব পর্যায়ের কিছু কিছু অনুমানে বুঝে নিতে হবে, কেন না সবটা কাহিনী উদ্ধারের স্থান নেই। কাহিনীটি চার ভাগে বিভক্ত। প্রথমে ভূমিকা, (তার গোড়াটা উদ্ধৃত করেছি।) দ্বিতীয় অংশে "সোফার আত্মকথা"। তৃতীয় অংশে "খোঁপার আত্মকথা"। সর্বশেষে—"উপসংহার"। নিচের উদ্ধৃতিটি "খোঁপার আত্মকথা"।

"গুমরিয়ে উঠেছিল সোফা,
চমকিয়ে উঠেছিল গোপা
মিটারের হাতখানি তবু নাহি বাধা মানি
খুঁজেছিল প্রিয়তম খোঁপা ?……
ঠোঁট দুটি পরশিতে খোঁপা
চমকিয়া উঠে বসে গোপা—
ছাড়ো ছাড়ো, শোনো শোনো! উঁহু উঁহু নো-নো-নো-নো!
দুম ক'রে ভেঙে পড়ে সোফা!

তারপরে চারিদিকে সাড়া
দুপ্ দাপ্ প্রবেশিছে কারা ?
মাতা আসে, আসে পিতা, আসে ঝাল আসে তিতা,
ভিড় ক'রে আসে বুঝি পাড়া !
ঠ্যাংশুদ্ধা সোফাটির পরে
চমকিয়া দুজনায় ধরে
দৃঢ় করি ভুজপাশে আছে তারা এক পাশে
—দেখেছিল সবে ঢুকে ঘরে।
মিটারের দাঁতে ঝোলে খোঁপা !
টাকমাথা আগলায় গোপা—
তবু এ সে-ঠোঁটে রয় কালো মোজা খান কয়
সীনটি জমিয়া ওঠে তোফা !"

এর পর উপসংহারটি কবির কল্পনা ও রচনা শক্তির অদ্ভুত পরিচয় বহন করছে—

"মহাকবি পোপ !
বেণী-সংহারের ফলে যেই প্রেম কোপ
উঠেছিল জ্বলি,
গিয়েছ তা বলি
তোমার সুঠাম ডান-বামহীন ছন্দে।
অধম তোমারে বন্দে
নাহি নিজে গাহিবার আশা
না যোগায় ভাষা,
তাই মীডিয়ম-মুখে বলি
বেণীরূপে কিম্বা খোঁপারূপে ছলি
কেমনে ধরিল একদিন
মোজা নামে হীন
পাদবস্ত্র প্রেমিকের প্রাণ—
স্টকিং রাখিল ব্লু-স্টকিংএর মান।
গাহিয়াছে এক অর্ধ, পোপ,
আমি গাহি অন্য অর্ধ, করিওনা কোপ,
—প্রেমের সংহার হয় বেণীর সংহারে
বিয়ের বাজার খোলে খোঁপার বাহারে,
অতএব জয়গাহি, বাঙলার বিদুষীর খোঁপা
I sing the Sofa." (নভেম্বর ১৯৩৩)

আর এক কবির কথা বলতে হবে—জগদীশ ভট্টাচার্য। সদ্য বি. এ পাস, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণধর্মে উচ্ছল। সর্বদা হাসিমুখ। কাব্য রচনায় মহা উৎসাহ। কলেজ বয়ের ছদ্মবেশে উৎকৃষ্ট সরস কবিতা লিখছে তখন। আর ছদ্মবেশেই বা বলি কেন, কলেজের গন্ধ লেগে আছে গায়ে। এম-এ পড়ে। তার কলমেও কলেজ-বয়ের গন্ধ—

"রোজ বিকেল বেলা এই জানলাখানির
ঠিক সামনে দিয়ে
ওই ঘড়ির কাঁটার সওয়া পাঁচটা হলে
এই রাস্তা বেয়ে ধীরে যায় সে চলে।
তুমি চিনবে ওকে
তার করুণ চোখে
খুব ক্লান্ত বিষণ্ণতা ফুটবে তাতে
খান তিনেক পুঁথিও আর থাকবে হাতে;
যাবে আপন মনেই তার মেয়েলি বাঁটের
ছাতা বাঁ হাতে নিয়ে।
রোজ বিকেল বেলা এই জানলাখানির
ঠিক সামনে দিয়ে।"

ক্রমে তার মধ্যে একটি একটি ক'রে সৌন্দর্য আবিষ্কার হবে, এবং তোমার অবস্থা কি হবে বলা বাহুল্য। অর্থাৎ—

"ঠিক দুদিন পরেই বাসা বদলে এদিকে
তুমি আসবে চলে।
আর তাহারো দুদিন পরে ধরবে পিছু,
ওহে বাড়িয়ে বলিনি আমি তেমন কিছু;
—ছেলে তোমার মতো
দেখে এলাম কত!"……(নভেম্বর ১৯৩৪)

কাছে ব'সে দূর থেকে দেখার ছল! অর্থাৎ "দেখে এলাম কত" এই বিজ্ঞজনোচিত কথাটাই একটি ছলনা। বর্তমানের কবিমানসীর লেখকের এটি আদি মানস।

শনিবারের চিঠিতে সম্পাদক রূপে যোগ দিই ১৯৩২ সালের নবেম্বর মাসে। ডিসেম্বর বা পৌষ ১৩৩৯ সংখ্যা থেকে আমার নাম সম্পাদকরূপে ছাপা হ'তে থাকে। এর প্রায় দুবছর পরে ১৯৩৪ সালের সেপটেম্বর

(ভাদ্র ১৩৪১) সংখ্যা থেকে কয়েক মাসের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমার নামের সঙ্গে ছাপা হ'তে থাকে সহকারী সম্পাদক রূপে। এ শুধু নামের জন্যই নাম, বিশেষ প্রয়োজনে। তারাশঙ্কর যে বেকার নয় চাকরি করছে, এটি দেখানোর দরকার হয়েছিল বিশেষ মহলে। তারাশঙ্কর তখন সন্দেহজনক চরিত্র, ব্রিটিশরাজের বিবেচনায় বিপদ্‌জনক। চাকরিতে আবদ্ধ থাকলে রাজদ্রোহের শয়তানিটি দমিত থাকে।

এর আগে তারাশঙ্কর চমৎকার একটি ব্যঙ্গ গল্প লিখেছে শনিবারের চিঠিতে। গল্পটির নাম অ্যাও। এখানে লেখকের ছদ্মনাম হাবুশর্মা। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ (মাঘ ১৩৪১) সংখ্যায় আমি 'নূতন কাগজের প্ল্যান' নামক একটি ব্যঙ্গ রচন লিখি। সেটি ক্ষুদ্রাকার একটি সম্পূর্ণ মাসিক পত্র—১৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সেই উপমাসিকের গদ্য অংশ সবই আমার লেখা। কবিতা বিভাগে দুটি কবিতা, একটির লেখক তারাশঙ্কর, অন্যটির লেখক বনফুল। তারাশঙ্করের কবিতা রচনার হাত ভাল ছিল, কিন্তু সম্ভবত 'কমন সেন্স' দ্রুত উন্মেষিত হওয়াতে এ পথে আর বেশিদূর এগোয় নি।

শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর সঙ্গে এই সময় পরিচয় ঘটে। সে আন্দুল মৌরী থেকে ছবির গোছা নিয়ে কলকাতায় আসত মাঝে মাঝে আমি এক গোছা রেখে দিয়েছিলাম। সবই কার্টুন ছবি। সেগুলো মাঝে মাঝে নিজেদের প্রয়োজন মতো পরিচয় দিয়ে ছাপা হ'ত। সেই তার প্রথম প্রকাশ। শৈলর সেই প্রাথমিক শিল্প-শৈলীর দ্রুত উন্নতি হয়েছে, এখন সে পাকা শিল্পী।

ভাগলপুরে কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য নামক লেখক এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়। তখনও তিনি ফরাসী দেশে গিয়ে অ্যাঁজেনিয়্যোর রূপে বেতনার্মের কাজে নামেন নি। প্রবাসীতে তখন তাঁর লেখা কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, আর ফ্রান্সে গিয়ে বঙ্গশ্রী ও শনিবারের চিঠিতেও লিখেছেন। তাঁর দেশে ফেরার পর ১৯৩৫ সালের কোনো সময় বলাই ভাগলপুর থেকে আমাকে এক চিঠিতে জানায়, 'কপিল একখানা কাগজ বার করতে চায়, তোমার পরামর্শ দরকার।'

আমি ভেবে দেখলাম মফঃসল থেকে কাগজ বা'র ক'রে চালানো কাজের কথা নয়। তার চেয়ে কপিলপ্রসাদ যদি সজনীকান্তের সঙ্গে যোগ দেন,

তা হ'লে শনিবারের চিঠিকেই আরও বড় ক'রে তোলা যাবে। শনিবারের চিঠি তখন ক্ষীণাঙ্গ ছিল, এবং সজনীকান্ত বঙ্গশ্রী ত্যাগ করেছেন। (আমি যখন শনিবারের চিঠির ভার নিই তখন তার কিঞ্চিৎ দেনা ছিল, কিন্তু সে দেনা তখনকার কর্মকর্তা প্রবোধ নানের তিন বছরের চেষ্টায় শোধ হয়েও সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত দেখানো সম্ভব হয়েছিল।)

সজনীকান্ত ও কপিলপ্রসাদকে মিলিয়ে দিলাম। খুব উৎসাহ দেখা গেল কিছু দিন। ভিতরে ভিতরে কি ঘটল তা আমার জানবার দরকার ছিল না, কৌতূহলও ছিল না। দুইয়ের যোগাযোগের ফলে আমি শুধু প্রত্যক্ষ করলাম রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের পক্ষ থেকে কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'বনফুলের কবিতা' ও আরও দু একখানা বই প্রকাশিত হ'ল এবং একখানি সাপ্তাহিক।

'বনফুলের কবিতা' (১৯৩৬), এর ভূমিকাটি বেশ উপভোগ্য এবং এতে কিছু খবরও পাওয়া যাবে।

আমার কাব্য-প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন বটুদা [সুধাংশুশেখর মজুমদার, সাহেবগঞ্জ], প্রবোধদা, [প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহেবগঞ্জ ; ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীপরিমল গোস্বামী। নিরুৎসাহ দ্বারা পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিয়াছেন অনেকে। তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে।

ইহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই অনশনের দেশে কবিতা প্রকাশের দুঃসাহসের জন্য সোদর-প্রতিম কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইতেছি।

ভগবান আছেন—"বনফুল"

নতুন যে সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হ'ল তার নাম হ'ল "নূতন পত্রিকা" —সম্পাদক নীরদচন্দ্র চৌধুরী। নীরদবাবুর মতো মনীষী এবং অভিজ্ঞ সাংবাদিকের হাতে কাগজখানা একটি বিশেষ চেহারা পেয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন সুন্দর কাগজ খানার পাঁচটি আবির্ভাবের পরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল! সম্ভবত টাকার অভাবেই, কিন্তু তাই বা কেন, সে রহস্য-ভেদ আমার সাধ্য ছিল না। দুইটি চরিত্রই রহস্যময়। সজনীকান্তের রহস্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তার মধ্যে কৌতুক অংশ ছিল অনেকখানি, কিন্তু কপিলপ্রসাদের রহস্য খুব সীরিয়াস। পরমাণুর কেন্দ্রকে ঘিরে যেমন ইলেকট্রনেরা অতি বেগে ঘোরার ফলে বাইরে থেকে সে কেন্দ্রে পৌঁছানো

দুঃসাধ্য, কপিলপ্রসাদের চারদিকে তেমনি তাঁর কথার ইলেকট্রন সমূহ প্রবল ঘূর্ণনের সাহায্যে তাঁর আবেষ্টনকে নিরেট এবং কঠিন ক'রে তুলেছে, ভিতরে প্রবেশের কল্পনাই করা যায় না।

নূতন পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র আজ চিত্তাকর্ষক বোধ হয়। (১) সম্রাট পঞ্চম জর্জ, রাষ্ট্রীয় জীবনের বস্তুতন্ত্রতা, কিপলিং—নীরদচন্দ্র চৌধুরী। (২) ইসলামি সভ্যতার স্বরূপ, সার যদুনাথ সরকার, (৩) মার্জিন (রম্যরচনা) প্র-না-বি। (৪) জগদীশ সমীপে, অমল হোম (৫) আংটি (গল্প) মনোজ বসু। (৬) দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। (৭) কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর। (পুস্তক প্রসঙ্গ) নির্মলকুমার বসু। (৮) দাদু (সমালোচনা) সুকুমার সেন। (৯) কলিকাতা স্টেশনের প্রোগ্রাম (রেডিও) নলিনীকান্ত সরকার (নামের উল্লেখ ছিল না) (১০) নবনাট্যমন্দিরে রীতিমত নাটক (সমালোচনা) পরিমল গোস্বামী। পরবর্তী চার সংখ্যার লেখক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, অনাথনাথ বসু, বলাহক নন্দী, (নীরদচন্দ্র চৌধুরী), গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বনফুল, চারুচন্দ্র চৌধুরী, অশোক মৈত্র, নির্মলকুমার বসু, হিরণকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, নলিনীকান্ত সরকার, সুকুমার সেন, সুকুমার বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

আমি এর প্রত্যেক সংখ্যাতেই লিখেছি। নীরদচন্দ্র প্রত্যেক সংখ্যায় অনেকখানি ক'রে লিখতেন। বলাহক নন্দীর ছদ্মনামে তিনি চমৎকার একটি ব্যঙ্গ রচনা লিখেছিলেন। তিনি বর্তমানে ইংরেজী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় কিছু লেখেন কি না জানি না, কিন্তু বাংলায় লিখলে বাংলার জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হ'ত নিশ্চয়।

নীরদবাবুর নূতন পত্রিকার সেই ব্যঙ্গ রচনাটির নাম 'গরুর গাড়ি ও রবারের টায়ার'। রচনাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করি :

"গত বৎসর ঠিক এমনই দিনের কথা। গুড়ের মাঠ হইতে বাড়ির দিকে ফিরিতেছি, হঠাৎ সামনে রসিখানেক দূরে একটা নূতন ধরনের যান চোখে পড়িল। শীত শেষের মিহি উড়ানীর মত কুয়াসা চারিদিক অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, তার উপর গাড়ীটা আগাইয়া যাইতেছে, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টার পর লক্ষ্য করিলাম গাড়োয়ানের দুই পাশে দুইজোড়া বাঁকানো শিং।

সুতরাং কোন্ জাতীয় প্রাণী গাড়ীটি টানিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এই যানটির মধ্যে গরুর গাড়ীর সঙ্গে ঝাঁকুনি, ধ্বনিবৈচিত্র্য বা অবসান গতি খুঁজিয়া পাইলাম না। যে গরুর গাড়ীতে কর্ষাপণ বোঝাই করিয়া অনাথপিণ্ডদ জেতবন ঢাকিয়া দিয়াছিলেন, যে গরুর গাড়ীকে ভারুত স্তূপের রেলিং এ উৎকীর্ণ দেখিয়াছি, যে গরুর গাড়ীর কথা আলালের ঘরের দুলালে পড়িয়াছি, যে গরুর গাড়ী কলিকাতার রাস্তায় ট্রাম লরী ও মোটোর গাড়ীকে স্পর্ধা করিয়া বিরাজ করিতেছে, যে গরুর গাড়ী তার দেহ ও মনের স্বাতন্ত্র্য যুগে যুগে অপরিবর্তিত রাখিয়াছে, যে গরুর গাড়ী সনাতন হিন্দু সমাজের প্রতীক না হইলেও একমাত্র সমধর্মী তাহার সহিত এই নব্য পন্থী যানটির সাদৃশ্য ছিল না। বরঞ্চ সনাতনপন্থীরা দেখিলে দুঃখিত হইতেন, উহার নীচের দিকটা হুবহু এয়ারপ্লেনের নীচের দিকটার মত। এ যেন নামাবলী-পরা পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্টনের বুট-পটি আঁটিয়া চলিতেছে।...

"জিনিসটা মনে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই পরেও উহার কথা অনেক ভাবিয়াছি। সেই রবার টায়ার ওয়ালা গরুর গাড়ীর ছবি কল্পনার চোখে ভাসিয়া উঠিলে প্রথম প্রথম বড় বিসদৃশ ঠেকিত, মনে হইত কেহ যেন হার্মনি যোগ করিয়া ধ্রুপদ গাহিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলাম গরুর গাড়ীতে টায়ার যোজনা বর্তমান ভারতীয় সভ্যতার একেবারে গোড়ার কথা।... আমরা ভারতবর্ষকেও ছাড়ি নাই, ইউরোপকেও ছাড়ি নাই; এদুয়ের...ব্যাঘ্র ও বৃষভের সমন্বয় করিবার জন্য বিজ্ঞান ও বেদান্তের লোয়েষ্ট কমন্ ফ্যাক্টর বাহির করিয়াছি। আজ যদি আমাদের কেহ জিজ্ঞাসা করে কি চাও...আর যদি আমাদের চাওয়া—চাওয়ার স্বাধীনতা থাকে তবে যে আমরা ষোলো আনা মোটর না লইয়া মোটরের একআনা লক্ষণ যুক্ত গরুর গাড়ী লইব সে বিষয়ে সন্দেহ আছে কি?

"বোধ করি এত বড় একটা কথার প্রমাণ চাহিবেন। দিতেছি। যদি পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম এই প্রাচীন বাক্যটিতে পিতাদের মনোবাঞ্ছার প্রকৃত ইঙ্গিত থাকে তবে এযুগের সূতা কাটিবার কলের নিকট হার মানিয়া চরকার নিশ্চয়ই গর্ব ভরে বিদায় লইবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাকে যাইতে দিতেছি কৈ? শুধু যাইতে না দিলেও কথা ছিল না, হতভাগ্য বৃদ্ধকে আমরা আমাদের অনেকের হতভাগ্য বৃদ্ধ পিতার মত সংস্কারও করিতে চাহিতেছি।

..."আজ হলিউড ও কালিঘাট মিলিয়াছে। ছিন্নমস্তা পর্দার উপর নাচিতেছেন, শঙ্কর ক্যামেরার সহায়তায় দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতেছেন। ইহাইত সিনথেসিস—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন।..."

নীরদবাবু সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি। আমি এ সময়ে প্রবাসীতে লিখতে শুরু করেছি, প্রবাসীর পুস্তক সমালোচনাও করছি নিয়মিত। এই বিভাগে ইউরোপ ভ্রমণ সংক্রান্ত একখানা বই-এর আমি সমালোচনা লিখি। বইখানা প'ড়ে আমার যা মনে হয়েছিল খুব সংযত ভাবে তাই লিখেছিলাম। আমার বক্তব্য মোটামুটি ছিল এই যে—ভ্রমণ কাহিনী নানাভাবে লেখা

যেতে পারে। অল্পদিন ভ্রমণ ক'রে বাইরের ধারণা থেকে, বেশিদিন বিদেশে বাস ক'রে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, অথবা বিদেশে আদৌ না গিয়ে ঘরে ব'সে রেফারেন্স বই খুলে, কল্পনার সাহায্যে। আলোচ্য বইখানি প'ড়ে মনে হয় এ বই লেখার জন্য বিদেশ ভ্রমণ অত্যাবশ্যক ছিল না, ঘরে বসেই লেখা যেত। তথ্যের দিক দিয়েও কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়ল।

এই সমালোচনা প্রকাশের কিছু দিনের মধ্যেই প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে উক্ত গ্রন্থকারের লেখা একখানা চিঠি পাঠিয়ে সেই চিঠির জবাব চাইলেন আমার কাছে। লেখক অভিযোগ করেছেন —'দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচককে আপনারা বই দিয়েছেন কেন,' ইত্যাদি।

আমি তৎক্ষণাৎ নীরদবাবুর শরণাপন্ন হলাম। বইখানা প'ড়ে মনে এমনিতেই বিতৃষ্ণা জেগেছিল, তার উপর লেখকের ঐ চিঠি, অতএব উপযুক্ত জবাবের জন্য মনে প্রেরণা জাগল এবং জাগল নীরদবাবু আছেন জেনেই। আমার অভিজ্ঞতায় এই একটিমাত্র ব্যক্তিকেই জানি যিনি ইউরোপে না গিয়েও ইউরোপের সকল বিভাগের সকল খবর জেনে ব'সে আছেন। (নীরদবাবু অনেক পরে ইউরোপে গেছেন।)

কিন্তু নীরদবাবুকে বই দেওয়ার পর প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে তাঁর দেখা না পেয়ে চিন্তিত হলাম। দু একবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনেছি, বাড়িতে নেই। তখনও জানি না, তাঁর নিরুদ্দেশের কারণ ঐ বইখানা। তিনি ওতে শত শত তথ্যের ভুল বার ক'রে মহা উত্তেজিত অবস্থায় বইখানা বরানগর থেকে বালিগঞ্জের যাবতীয় বন্ধুকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন।

অবশেষে একদিন তিনি আমার কাছে এসে সব বললেন এবং নির্দেশ দিলেন ভুলগুলোর শ্রেণী বিভাগ ক'রে সাজাতে। ফুলস্ক্যাপ কাগজের প্রতি পৃষ্ঠায় তিন কলম ক'রে সাজানো হ'ল বিভিন্ন নামে। ইতিহাস বিষয়ে ভুল, ভূগোল বিষয়ে ভুল, নামে ভুল; প্রাচীন চিত্রাদির অবস্থান উল্লেখে ভুল, এবং সর্বশেষ রুচিহীনতা। যতদূর মনে পড়ে তিন চার শীট লেগেছিল মোট। একখানি চিঠি সহ এই তালিকা রামানন্দ বাবুকে পাঠিয়ে দিলাম। সম্ভবত তিনি এ তালিকা গ্রন্থকারকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কেননা এর পর সব চুপ। কিন্তু নীরদবাবুর মনে যে উত্তেজনা জেগেছে তাতে তিনি চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। তিনি এই জাতীয় বইএর বিরুদ্ধে একটি

রচনা লিখে আমাকে দিলেন, আমি সেটি শনিবারের চিঠিতে ছেপেছিলাম। সেটি হিংস্র আক্রমণ।—'শ্বশুরের টাকায় অনেকেই বিলেত যায়'—ইত্যাদি।

শনিবারের চিঠিতে আর এক সদাশয় ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করি। তিনি ভাগলপুরের সতীনাথ ঘোষ, (নন্তদা আমাদের)—নিউথিয়েটার্সের আইন-সচিব। অনাথ বসুও ছিলেন ভাগলপুরের, সেইখানেই প্রথম পরিচয়। চরিত্র মাধুর্যে ইনি আমার স্মৃতি অধিকার করে আছেন অদ্যাবধি।

কবি অজিত দত্তের সঙ্গে এই সময়ে পরিচয় হয়। তখন তিনি অধ্যাপক এবং এত দিন পরে পুনরায় অধ্যাপক, মাঝখানে স্কুল পালানো ছেলের মতো বেরিয়ে গিয়ে নানা পথে ঘুরে এলেন। গ্রন্থপ্রকাশকও হয়েছেন তিনি। অনেক লেখকই এখন প্রকাশনার পথে নেনে সুখ বোধ করছেন মনে হয়। সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ ইত্যাদির নাম এই সঙ্গে যোগ করা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একদিন আমাকে বলেছিল সে নিজেই নিজের বই ছাপছে। একদিন পথে চেঁচিয়ে বলেছিল, "শুধু আমি নই, এ পথে সবাইকে নামতে হবে।"

সব দেশেই লেখকদের চেয়ে প্রকাশকেরা ধনী। বিলেতি একটি গল্প মনে পড়ল। একটি মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে তার বান্ধবী তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল, "ছেলেটিকে প্রকাশক মনে ক'রে তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলাম, পরে জানতে পারলাম সে শুধুই একজন গ্রন্থকার, তাই বিয়ে ভেঙে দিলাম।"

কিন্তু প্রকাশক হোন বা না হোন, লেখকদের পক্ষে একবার লেখা অভ্যাস হ'লে ছাড়া শক্ত। একমাত্র ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ব্যতিক্রম। তিনি আজও জীবিত, কিন্তু বহু দিন লেখা বন্ধ করেছেন।* সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয়ের যে পরিধিতে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, সে পরিধি আজও প্রায় তেমনি আছে, এবং বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আজও জীবিত থেকে অক্লান্তভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন ক'রে চলেছেন। এমন কি কিরণও মাঝখানে ভিন্ন পথে ঘুরে আবার ফিরে এসেছে সাহিত্য রচনার পথে। এ অভ্যাস ছাড়া শক্ত এবং কিরণের মতো সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তির সাহিত্যপথে পুনরাগমন আমার কাছে আনন্দকর বোধ হচ্ছে।

* না, করেন নি। ১৯৫৯ থেকে আবার লিখছেন প্রচণ্ড বেগে।

যে সময়ের কথা লিখছি (১৯৩২-৩৬) এ সময়ে লেখিকা-সমস্যা এত কম ছিল যে তা তুচ্ছ করা চলে। আজকের দিনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা এ কালের দর্শকের চোখে স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু আজকের ১৯৫৮ সালের লেখিকা বাহিনীকে সেই ১৯৩২ সালে হঠাৎ দেখা গেলে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটে যেত। সে যুগে মাসিক পত্র অফিসে একবার মাত্র অন্নপূর্ণা (গোস্বামী) ও ক্ষণপ্রভা (ভাদুড়ী) কে দেখেছি। এ যুগে লেখিকাদের ঠেকানোই এক সমস্যা। সে জন্য কোনো কোনো সমাজকল্যাণী মহিলা, সম্ভবত পুরুষদের প্রতি করুণা বশতঃ পৃথক সাম্প্রদায়িক পত্রিকা বা'র করেছেন। তাতে লেখকদের প্রবেশ নিষেধ হওয়াতে অনেক লেখিকাকে সে সব পত্রিকা আপন অঙ্কে টেনে নিয়ে একটা ভারসাম্য রক্ষা করছে।

এ সময় আমাদের আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে মাঝে মাঝে সান্ধ্য আড্ডা বসত। আড্ডার মধ্যমণি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাখন সেন মহাশয় ছিলেন খুব সীরিয়াস, কাজের লোক, তিনি আড্ডায় এসেছেন ব'লে মনে পড়ে না, তবে প্রফুল্ল সরকার মহাশয়কে নিয়মিত দেখেছি। সত্যেনদার মুখের কোনো আগল ছিল না, এবং সম্ভব অসম্ভব সব কথা তাঁর মুখে শুনতে ভাল লাগত। আমরা সবাই তা উপভোগ করতাম, প্রফুল্লবাবু স্বল্পবাক ছিলেন, তিনি মৃদু মৃদু হাসতেন। যেদিন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড নতুন বেরোল সেদিন সকালবেলা মাখনদা এক কপি কাগজ হাতে ক'রে এলেন মোহনবাগান রো-তে, সজনীকান্তকে দেখাতে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি আমার বুদ্বুদ নামক একটি ব্যঙ্গ গল্পের বই ছাপা হয় আমার প্রথম বই। এবং এই বছরেই আমি শনিবারের চিঠির সম্পাদনা ত্যাগ করি, সাড়ে তিন বছর পরে। সজনীকান্তের বঙ্গশ্রী ত্যাগ ও তারপর নানা পরীক্ষা-মূলক জীবিকার্জন অভিযান, এবং সে সবই ব্যর্থ অভিযান। শেষ পর্যন্ত সজনীকপিল ও সজনীনিখিল যোগাযোগটাও ব্যর্থ হল। অতএব সজনীকান্তকে তাঁর পুরাতন বন্ধু শনিবারের চিঠিকেই অবলম্বন করতে হ'ল। এবং আমি সম্পূর্ণ বিপন্ন না হই সেজন্য তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সজনীকান্তের পুরাতন বন্ধু, তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আমাকে প্রতি রবিবারে 'স্টেজ অ্যাণ্ড স্ক্রীন' বক্তৃতা দিতে হ'ত পনেরো মিনিট ক'রে।

এ কাজ করেছিলাম ১৯৭১ সাল পর্যন্ত, প্রায় সাড়ে চার বছর। প্রতি রবিবার পঙ্কজকুমার মল্লিকের গানের আসর শেষ হতেই আমার থিয়েটার সিনেমা সমালোচনা আরম্ভ হ'ত। সমালোচকরূপে আমার নাম ছিল স্পেক্টেটর, নামটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণের দেওয়া। থিয়েটার সিনেমার সমালোচক আগে ছিলেন মনোমোহন ঘোষ, চিত্রগুপ্ত ছদ্মনামে।

এর আগে রেডিওতে মাঝেমাঝে দুএকটি বক্তৃতা দিয়েছি। ১৯৩৪ সালের মে মাসে রবীন্দ্র জন্মতিথিতে একদিন অভিনয়ও করেছিলাম রেডিওতে, রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের খাতা। মোট অভিনেতা সাত জন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও আমি। আমি বেছে বেছে এমন একটি ভূমিকা নিয়েছিলাম যাতে কথা মাত্র একটি। আমার কৃতিত্ব এইটুকুই। পাকা অভিনেতা তিনজন, শরদিন্দু, প্রমথনাথ ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। ব্রজেনদাও সেদিন বিপিনের ভূমিকায় খুব জমিয়েছিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এই সময় আমাকে মাইকের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার কৌশলটি যত্ন ক'রে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তার সেই নির্দেশ আমার খুব কাজে লেগেছিল।

এর কিছুকাল আগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে নির্মলকুমার বসু বাস করতেন। সেইখানে বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় এবং সেই পরিচয় আজ আরও নিবিড়। দুজনেই আমার শুভার্থী এবং দুজনেই পণ্ডিত ব্যক্তি। বিনয়কৃষ্ণ দত্ত তখন 'বিষাণ' নামক পাক্ষিক পত্রিকা চালাচ্ছেন। সন্ন্যাসীর মতো জীবনটা কাটিয়ে দিলেন গ্রন্থারণ্যে বসে। বহু বিষয়ে পড়াশোনা এবং যে-কোনো বিষয় তর্ক করায় এঁর গভীর নিষ্ঠা। তাঁর বিরাট লাইব্রেরি, বন্ধুরা সবাই তাঁর গ্রন্থাগার থেকে শত শত বই নিয়ে গেছেন, (তার মধ্যে আমিও আছি!) সে সব বই আর ফিরে আসেনি, কিন্তু সেজন্য কোনো আক্ষেপ নেই। নিজের বহু টাকা খরচ ক'রে অন্যের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন। মনেপ্রাণে সত্য সন্ন্যাসী। মনে দুষ্টুমি বুদ্ধি জাগলে সমস্ত দিন না খেয়ে তর্ক করতে রাজি, প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত ক'রে তাকে হারিয়ে দেওয়ার কৌশলটি বেশ আয়ত্ত। বিমলাপ্রসাদ বুদ্ধিদীপ্ত লেখক, রস-রচনায় অনবদ্য। মধুর এবং মার্জিত ভাষা, বক্তব্যের বিষয়ও বিচিত্র, সর্বদা সুসম্বদ্ধ, এবং লজিক্যাল। অর্থাৎ যে সব গুণ থাকলে খুব পপুলার হওয়া যায়, তার অভাব।

এঁদের দুজনকে অতিরিক্ত পেয়ে আমার তখনকার সাহিত্যিক পরিধি আরও অনেক বিস্তৃত বোধ করেছিলাম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পর হঠাৎ নতুন পরিবেশে যেতে প্রথমে কিছু দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে দুঃখ ঘুচে গেল, কেননা নতুন পরিবেশে পুরনো অনেক বন্ধুকেই পাওয়া গেল। নলিনীকান্ত সরকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে সর্বদা পেতাম রেডিওতে; এদিকে ১৯৩৬ থেকেই আরও একটি খণ্ড-কাজ এই সঙ্গে পাওয়া গেল সেনোলা প্রতিষ্ঠানে। প্রচারের কাজ। মাসে যত রেকর্ড প্রকাশিত হ'ত সে রেকর্ডের পরিচয় সম্বলিত একখানি মাসিক পুস্তিকা লিখতে হ'ত। মনোরম কাজ। এ কাজে আগে ছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আমাকে এ কাজে ডাকাতেও বীরেন্দ্রকৃষ্ণের হাত ছিল। একদিকে রেডিওর পটভূমিতে নাটক, গান সেনোলার পটভূমিতেও তাই, এবং এতদুভয়ের মধ্যে পরিচিত সব বন্ধুদেরই আনাগোনা। অতএব উভয় স্থানের জন্যই বন্ধুদের সাহায্যে এক নতুন রচনায় হাতে খড়ি দিলাম। সে হচ্ছে নাটক রচনা, বড় নাটক ও ছোট নাটক। এমনকি গানও রচনা করেছিলাম সেনোলা রেকর্ডের জন্য। আমার প্রথম দুটি গান আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী সেনের কণ্ঠে সেনোলা রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। সেনোলার স্বত্বাধিকারী বিভূতিভূষণ সেন অমায়িক এবং উদার এবং আমার সঙ্গে তাঁর ছিল প্রীতির সম্পর্ক।

সেনোলার জন্য এক অদ্ভুত অবস্থায় প'ড়ে একবার এমন এক নাটক লিখতে হয়েছিল, যা আমার দ্বারা লেখা সম্ভব ব'লে আমিও কল্পনা করিনি, সেনোলা স্টুডিওর তৎকালীন পরিচালক সৌরেন্দ্র সেনও কল্পনা করেননি। সৌরেন বাবু একবার আমাকে বললেন, "বড়ই বিপদে পড়েছি, উদ্ধারের আপনি একটি ব্যবস্থা করুন।" শুনলাম তাঁরা লক্ষহীরা নামক একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ৭ খানা রেকর্ডে সম্পূর্ণ একখানা নাটক প্রকাশ করতে চান। এ নাটক লেখার ভার তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন, কিন্তু শৈলজানন্দ লিখতে অস্বীকার করেছেন, কারণ তিনি বলেছেন নাটকের বিষয়বস্তু তাঁর পছন্দ নয়, তদুপরি এক মুনিকে শূলে চড়াতে হবে—এ সব তাঁর দ্বারা হবে না।

শুনে শৈলজানন্দের উপর শ্রদ্ধা হ'ল। কারণ ঐ কাহিনীতে এমন সব

ব্যাপার আছে যা আধুনিক রুচির বিচারে বীভৎস। সাহিত্যিক হয়ে এ কাহিনী লেখায় মন সরে না স্বভাবতই। আমি চিন্তা ক'রে দেখলাম, একমাত্র লোক আছেন যিনি রাজি হতেও পারেন, কারণ তিনি বহু পূর্বেই আমাকে জানিয়ে রেখেছিলেন—নাটক লেখার কাজ থাকলে তাঁকে যেন আমি স্মরণ করি।

তিনি গুণী লোক। নাম সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, কবি ঈশ্বর গুপ্তের পৌত্র। এঁর কথা আগে বলেছি, দেখতে নকল রবিঠাকুর। শুনেছিলাম তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত নারায়ণ পত্রে 'কমলের দুঃখ' লিখে নীতিবাগীশদের রোষভাজন হয়েছিলেন। অয়েল পেন্টিং করতে পারতেন। আমি অবশ্য একখানা মাত্র ছবি দেখেছি, তাঁর উল্টোডাঙ্গার বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। ব্রহ্মদেশে অনেক দিন ছিলেন শুনেছিলাম। সেখানে কবি সুধীরকুমার চৌধুরীর সঙ্গে নাট্যাভিনয়ে খুব উত্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। সুধীরকুমার চৌধুরী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা, পূর্বে প্রবাসীর সম্পাদনা বিভাগে ছিলেন। খুবই বন্ধুবৎসল।

বঙ্গশ্রীতে সত্যেন্দ্র গুপ্ত গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার নোবেল প্রাইজ (১৯২৬) পাওয়া উপন্যাস মা অনুবাদ করেছিলেন ধারাবাহিকভাবে। শিশিরকুমার ভাদুড়ির অনুপস্থিতিতে একদিন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বিজয়া নাটকে রাসবিহারীর ভূমিকায় নেমেছিলেন, সে অভিনয় দেখেছি, ভালই লেগেছিল।

তাঁর অভাব ছিল খুব, এ কথা বলতেন। শত্রুরা বলত ওটা একটা ছল, যথেষ্ট পয়সা আছে। লক্ষহীরা লেখার জন্য তাঁকেই ডেকে পাঠালাম। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে সব শুনলেন ক্রীক রো-তে সেনোলা স্টুডিওর ঘরে ব'সে। মোট ১৪টি দৃশ্য হবে, প্রতি দৃশ্য সওয়া তিন মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া চাই। সব শুনে তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'ল, এবং এ জন্য যে টাকা পাবেন তা শুনে আরও। বললেন এ তো দিন দশেকের ব্যাপার।

সব কথা শেষে তিনি উঠলেন। কোনো একটি শীতের সকাল। দোতলা থেকে তাঁর সঙ্গে নিচে নেমে গিয়ে বিদায় দিলাম তাঁকে। আমাকে তিনি বললেন, "দু আনা পয়সা দিতে পারেন?"—আমি চারটি পয়সা দিয়ে বললাম আর নেই। তিনি বললেন "আচ্ছা, ওতেই হবে।" তারপর একমাস কেটে গেল, তাঁর আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না।

অগত্যা আমার নিজের মান রক্ষার্থে আমাকেই ভার নিতে হ'ল এই অসাধ্য সাধনের। মূল প্লট একটুখানি বেঁকিয়ে দিয়ে, একটুখানি আধুনিক রুচির উপযুক্ত ৭ খানি রেকর্ডের উপযুক্ত ক'রে লিখে দিলাম। তবে মুনিকে শূলের হাত থেকে বাঁচানো গেল না।

বাছাই করা শিল্পীরা মিলে অভিনয় করলেন। তুলসী লাহিড়ী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আশু বোস, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, সরযূবালা, নিভাননী প্রভৃতি থিয়েটার বা সিনেমা শিল্পী ও বীণাপাণি দেবী নামের এক বিশিষ্ট গায়িকা মিলে পালাটি বেশ জমিয়ে তুললেন। পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অনুরোধে এই নাটকটিই আরও বাড়িয়ে রেডিওতে দুঘণ্টা অভিনয়ের উপযোগী ক'রে দিলাম, সেখানে নাটকটি চার পাঁচ বার অভিনীত হয়েছিল।

রেডিওর সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি. এল. এখানে একজন পরামর্শদাতা ছিলেন। কয়েকখানি ছোটদের নক্সার নতুন ধরনের সঙ্গীতের আবহ পরিকল্পনা দ্বারা রেকর্ডগুলিকে তিনি পরম উপভোগ্য এবং বিখ্যাত ক'রে তুলেছিলেন। স্মরণীয় সুরসংযোজক আর ছিলেন উমাপদ ভট্টাচার্য এম-এ। এঁদের পরবর্তী ধাপে শৈলেশ দত্তগুপ্ত, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, নিতাই ঘটক প্রভৃতি। এখানে আমার মধ্যস্থতায় বাংলা বিহার একত্র মিলেছিল। মুঙ্গেরের শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উমার তপস্যা ও ডিটেকটিভ, এই দুখানা নাটক প্রকাশিত হয়। ভাগলপুরের বনফুলের নিজকণ্ঠের আবৃত্তি 'শালা' একখানা রেকর্ডে প্রকাশিত হয় এবং ভাগলপুরের আশুদের একখানি কৌতুক নক্সা প্রকাশিত হয়। এদের সবার সঙ্গেই আমি দমদম এচ. এম. ভি. স্টুডিওতে যেতাম রেকর্ডিংএর সময়। একবার আমার একখানি নক্সায় শরদিন্দু অভিনয় করল বেশ সাফল্যের সঙ্গে। সেখানা পূজা কমিকের রেকর্ড।

রেকর্ডিং চলার সময় কত মিনিট বাকী আছে শিল্পীকে তা আঙুল খাড়া ক'রে দেখাতে হয়। আশুদের আবৃত্তির দিন তাঁর আরও দুমিনিট আছে দেখানো হ'ল দু আঙুল খাড়া ক'রে, তারপর এক মিনিট আছে দেখানো হল এক আঙুল খাড়া ক'রে। কিন্তু তবু প্রথমবারে তাঁর আবৃত্তি নির্দিষ্ট সাড়ে তিন মিনিট অতিক্রম ক'রে গেল। দ্বিতীয় বারের বার ঠিক হ'ল। আশুদে বললেন এক মিনিট পর্যন্ত বেশ দেখানো হ'ল এক আঙুল দিয়ে,

কিন্তু আধ মিনিট কি ক'রে দেখাবে? এই বিষয়ে মনে দারুণ কৌতূহল জাগাতে মনোযোগ চলে গেল আঙুলের দিকে, তাই আবৃত্তি করতে করতে সময় পার হয়ে গিয়েছিল। পরে তিনি এই রেকর্ডিংএর ব্যাপারটা অমৃতবাজার পত্রিকায় খুব মজার ক'রে লিখেছিলেন 'প্যাটার' পর্যায়ে। সে পর্যায় আজও তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ পর্যন্ত আমি দ্বিতীয় বার আর নিজ স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ তুলিনি, অতএব স্মৃতিকথা বড়ই অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে। ছেলেবেলার ম্যালেরিয়ার হাত থেকে মুক্তি পেলেও নাক এবং গলা আক্রমণকারী শত্রুরা বরাবর তৎপর ছিল, এবং দু এক মাস অন্তর দেহযন্ত্রটাকে কারখানায় এনে পরীক্ষা করানোর দরকার হ'ত। এ বিষয়ে আমাকে তখন সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন প্রবীণ এবং প্রসিদ্ধ লেখক ডাক্তার পশুপতি ভটাচার্য, ডি. টি. এম। আমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমার পক্ষ অবলম্বন তিনি সব সময় অকৃপণ ভাবে করেছেন। আজও মাঝে মাঝে পূর্ব অভ্যাস বশত এ কাজ তিনি ক'রে থাকেন, কিন্তু তিনি এখন প্রায় বৃদ্ধ এবং আমার শত্রু পক্ষ প্রবলতর। অতএব আধুনিকতম অস্ত্রে সজ্জিত নবীন চিকিৎসক পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. আর. সি. পি. আমার প্রধান আঘাতগুলি ঠেকিয়ে দেবার ভার গ্রহণ করেছে এবং ১৯৫৮ পর্যন্ত প্রহরীর কাজে নিযুক্ত ছিল নবীনতর ডাক্তার মোহিতকমল মৌলিক এম. বি. বি. এস. ; টি. ডি. ডি। ১৯৫৯ থেকে ডাক্তার বিশ্বনাথ রায় এম. বি. বি. এস।

শত্রুবেষ্টিত সংসারে আমি একা নই, বিশ্বসুদ্ধ সবাই এ বিষয়ে প্রায় আমার মতোই অসহায়, চিকিৎসকেরাও এ থেকে বাদ নেই। তবে বাংলা দেশের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে অসুখের কথা উচ্চারণ করা মাত্র শ্রোতামাত্রেই চিকিৎসকে পরিণত হয় এবং নিজ নিজ প্রিয় ওষুধ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তখন অসুখের আক্রমণের চেয়ে বহু জনের পরস্পরবিরোধী প্রেসক্রিপশনের আক্রমণে অস্থির হয়ে উঠতে হয়।—কিন্তু এ সব প্রসঙ্গতঃ।

১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে পাটনা প্রভাতী সংঘের নিমন্ত্রণে—এক কথায় মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দারের নিমন্ত্রণে—পাটনা যেতে হ'ল। মণির সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় ঘটেছিল ভাগলপুরে, এবং শনিবারের চিঠিতে তার

অনেক গুলো লেখাও আমি ছেপেছি। প্রভাতী সঙ্ঘের মধ্যমণি ছিল সে, স্বাস্থ্যবান গৌরবর্ণ তরুণ, সদ্য এম-এ পাস, মধুর এবং উদার স্বভাব। পাটনার এই সম্মেলনের সভাপতি হলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। আমরা কলকাতা থেকে পাঁচজন গেলাম এক সঙ্গে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস এবং আমি। প্রচণ্ড শীত। নীরদবাবু গাড়িতে উঠে প্রকাণ্ড এক তিব্বতী কোট গায়ে পরলেন। শুনলাম সেটি অমল হোমের কাছ থেকে পাওয়া। এই কোট-গায়ে তাঁর চেহারা এমন জাঁকজমকপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পেল যে আমরাও ঐ সঙ্গে অন্য যাত্রীর চোখে বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠলাম। হয় তো তাঁরা ভাবলেন তিব্বতী কোনো ছোট খাটো লামা-গুরুর সঙ্গে আমরা কয়েক জন শিষ্য চলেছি।

ভাগলপুর থেকে বলাই একা গেল পাটনায়।

পাটনায় এই আমার প্রথম যাওয়া। এর আগে ১৯৩৫ সালে একটি সুযোগ এসেছিল, কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে আমার যাওয়া হয়নি। ১৯৩৫ সালের সেই উপলক্ষটি ছিল পাটনায় বনফুলের প্রথম প্রকাশ্য অভিনন্দন। সে অভিনন্দন আমার আনন্দের এবং গর্বের, এবং না যেতে পারায়, দুঃখের। এ প্রসঙ্গে সে কথাটা বলে রাখি।

সামান্য একটি ঘটনায় কি ভাবে এক এক জনের জীবনের মোড় ঘোরে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এ বিষয়ে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তার অবিস্মরণীয় মুহূর্তে অনেক ঘটনাই বিবৃত করেছে। সজনীকান্তের জীবনের মোড় ঘুরিয়েছিল একটি শ্বেত হস্তী। আমার জীবনের মোড় ঘুরল লাল মিয়ার রোমান্সে। বলাইয়ের জীবনের মোড় ঘোরার অব্যবহিত কারণ আমার ল্যারিনজাইটিস।

শনিবারের চিঠিতে প্রবেশের তিন মাস পরে ভাগলপুরে যাই স্বাস্থ্যের জন্য এবং বলাইকে সাহিত্য পথে পুনঃ প্রবেশে উদ্বুদ্ধ করতে। বলাই তখন প্রায় আট বছর হাইবারনেট করছিল ডাক্তারি শাস্ত্রে ডুবে। এতদিন তার লেখা প্রায় বিয়ের প্রীতিউপহার লেখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বলাইকে নতুন ক'রে লেখানোর ব্যাপারে আমাকে যে সব প্রক্রিয়া করতে হয়েছিল তা বিস্তারিত বলার দরকার নেই, তবে আমাকে খুব যত্ন নিতে হয়েছিল।

ক্ষমতা আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল, অথচ অনভ্যাসে ঠিক মতো প্রকাশ হচ্ছে না, এ অবস্থা অবশ্য বলাইয়ের খুব বেশি দিন ছিল না। ফুল আপন প্রাণধর্মেই ফুটেছিল, আমি শুধু সতর্ক মালীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম কিছুদিন। বলাইয়ের পক্ষে এর প্রয়োজন ছিল। তাই বলাই পাটনায় যে অভিনন্দন লাভ করেছিল তার আনন্দ সে আমার সঙ্গে ভাগ ক'রে ভোগ করার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। ২২-১১-৩৫ তারিখে সে আমাকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে সে বলছে :

তুমি পাটনায় গেলে দেখিতে পাইতে যে তোমার হাতে-গড়া 'বনফুল' কত লোকের মনোহরণ করিয়াছে! গড়িয়াছ বলিয়া গড় করিতেছি। চুম্বন লও।...

বলাই আত্মক্ষমতা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিল বলেই তার মনে লেশমাত্র inferiority complex ছিল না, তাই এ ভাষায় চিঠি লেখায় কোনো দ্বিধা আসেনি মনে।

পাটনায় গিয়ে পৌঁছলাম আমরা দুর্দান্ত শীতে, এবং গিয়ে উঠলাম বিখ্যাত সমাদ্দার গৃহে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পাটনায় নানা স্থানে যে রকম আহার্যের রাজকীয় ব্যবস্থা হ'ল তাতে সাময়িকভাবে সাহিত্য আমাদের কাছে গৌণ বোধ হয়েছিল অবশ্যই। বিভূতিবাবু কিন্তু নির্বিকার। মনে কোনো উত্তেজনা নেই, উচ্ছ্বাস নেই, যেন মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসবাড়িতে তাঁর অভ্যস্ত ঘুম ভাঙল। তিনি প্রাতরাশ শেষ করেই একটু দূরের গাছপালার মধ্যে গিয়ে খাতা নিয়ে বসলেন। কাজের লোক। সেখানে ব'সে ব'সে ডায়ারি লিখতে লাগলেন। তাঁকে পাওয়া গেল ঘণ্টাখানেক পরে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি যেখানেই থাকেন, সেখানেই প্রতিদিন কিছু কিছু ডায়ারি লেখেন। ঘরের বাইরে ব'সে দুচোখে যে দৃশ্য দেখেছেন তার একটা শব্দ-চিত্র এঁকে রাখেন। চোখে দেখা পারিপার্শ্বিকের নিখুঁত বর্ণনা লিখে রাখলে পরে তা তাঁর গল্প বা উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করার খুব সুবিধে হয়। কথাটা আমার মনে ধরেছিল। আমিও এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলাম, কিন্তু তা ব্যবহার করেছিলাম অন্যভাবে। তখন-তখন চোখে দেখে লিখলে কল্পনা করতে হয় না, আবহাওয়া রেডিমেড থাকে। এদেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এই রীতির প্রথম প্রবর্তক মনে হয়। ছিন্নপত্র তার সাক্ষী।

এই রীতিতে আমি দু'তিনটি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছি ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই। ডুয়ার্সের পথে ও পশ্চিম হিমালয়ের পথে এ দুটি ভ্রমণই ('পথে পথে' গ্রন্থ দ্রঃ) পথে পথে শেষ করেছি। এমন কি মোটর ট্রাকে ব'সে বিরাম সময়ে অথবা গভীর অরণ্যে ব'সে, অথবা ওয়েটিং রুমে বসেও লিখেছি। এভাবে লেখা খুব আরামপ্রদ বোধ হয় এবং বর্ণনা নিখুঁত হয়। আমার গালুডি ভ্রমণ তো সম্পূর্ণ ফোটোগ্রাফধর্মী। একটা একটা ক'রে বিষয়বস্তু দেখে দেখে লেখা।

নীরদবাবু সভাপতিরূপে পাটনায় যে ভাষণ দেন, তাতে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির সমস্ত দিকের যে বিশ্লেষণ ছিল তা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি যুক্তিপূর্ণ। সংস্কৃতি বা কালচার কি এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের যোগে আমাদের দেশে কি রূপ পেয়েছে এবং এর ভবিষ্যৎ কি, এই সব কথা তিনি আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে আমাদের সমাজ, জীবনযাত্রার যে স্তরে উঠলে তাতে সংস্কৃতি সৃষ্টি সম্ভব, সেই স্তরে আমরা এখনও পৌছতে পারিনি। তাঁর মতে তাই আমাদের একশ' বছরের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন আমাদের নবযুগ প্রবর্তকগণ ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে একেবারে প্রথমেই সেই পুষ্পচয়নের কামনা করেছিলেন। যে ক্ষেত্রে তার জন্ম সম্ভব হবে, যে গাছে তা ফুটবে তার কথা একবারও ভাবেননি। নীরদবাবু তাঁর ভাষণ একটি মূল্যবান কথা দিয়ে শেষ করেছিলেন: "আমাদের আজ সেই ভুল সংশোধন করতে হবে, আকাশে ফুল ফোটাবার বৃথা চেষ্টা না দেখে হলকর্ষণে নিযুক্ত হ'তে হবে।"

এই বক্তৃতাটি পাটনায় বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। আমাদেরও ভাগ্যে কিছু প্রশংসা জুটেছিল, এই সুযোগে তার চিহ্ন এঁকে রাখি এখানে। পাটনার খবর আনন্দবাজার পত্রিকায় তিন দিন প্রকাশিত হয়। পাটনা থেকে ২৭শে জানুয়ারি ১৯৩৭ প্রেরিত যে খবরটি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয় সেইটি দুদিনের সম্মেলন শেষের খবর। তার অংশ বিশেষ এই—

"পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘের সাহিত্য সম্মেলন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। কলিকাতা হইতে কবি ও সাহিত্যিকগণ প্রাচীন ভারতের পাটলীপুত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর রসধারা সিঞ্চন করিয়া গেলেন। চিন্তাশীল লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অভিভাষণে...বহুদিন পরে আমরা যেন চিন্তার গতানুগতিকতা হইতে মুক্তিলাভ করিলাম...এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মনে যে দুই চারিজন সাহিত্যিক বিমল শুভ্র হাস্য রসের সৃষ্টি করিতে পারেন তাঁহারা সত্যই জাতির কল্যাণকামী বন্ধু।'

বলা বাহুল্য শেষের এই উক্তিটি সজনীকান্ত বনফুল ও আমার সম্পর্কিত উক্তি। কিন্তু আমার সম্পর্কে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে আমি যে দুটি রচনা পাঠ করেছিলাম, তা মুখ্যতঃ কারো কল্যাণ উদ্দেশ্যে রচিত ছিল না। একটি রচনা ঐ খানেই লিখেছিলাম, সেটি প্রথম অধিবেশনে পড়ি। দ্বিতীয় অধিবেশনে পড়ি একটি ব্যঙ্গ গল্প।

ঐ সংবাদের আর এক অংশে—

"সামাজিক জীবনের ইতিহাস যে কতদূর চিত্তাকর্ষক হইতে পারে তাহা দেখাইয়াছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।...সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ কি, কি কি উপাদান কিরূপভাবে রূপান্তরিত হইয়া রসসৃষ্টি করে তাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।... একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে পাটনার প্রাচীনেরাও নবীনের নূতন চিন্তাকেও সাদরে অভিনন্দন করিতে পারেন। তাহার প্রমাণ পাটনার সাহিত্য-সেবকগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ মথুরানাথ সিংহ মহাশয় কর্তৃক সমাগত যুবক সাহিত্যিকগণের অভিনন্দন।"

৬ই ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) বিহার হেরাল্ডে এই সম্মেলনের একটি অতি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে আমার একটি টেস্টিমোনিয়াল আছে যেটি আমার আবৃত্তি সম্পর্কে। আমার পক্ষে অবশ্যই তৃপ্তিকর ঃ

Mr. Parimal Goswami, somtime editor of Sanibarer Chithi has a very distinctive power of delivery. The strong humour of his short sketches was enhanced by his very effective distribution of pauses and emphasis.

রেডিওতে প্রতি রবিবারে আমার বক্তৃতা সঙ্গীতশিক্ষার আসরের পরেই। এ জন্য প্রতিদিন স্রেফ পরস্পর দেখা হওয়ার চাপে পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল। তাঁর তখন অনুচর ছিলেন অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র বসু। রেডিও স্টেশন আমাদের ছিল একটি বড় আড্ডা। আমার অনেক নাটিকা এখানে অভিনীত হয়েছে, তাই রিহার্সালেও উপস্থিত থাকতে হ'ত শিল্পীদের অনুরোধে। এই কথাটির আরও বিস্তার প্রয়োজন। তখন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন বক্তৃতা গান নাটক ইত্যাদি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। স্টেপলটন ছিলেন স্টেশন ডাইরেক্টর।

নৃপেন্দ্রনাথ খুব রসিক ব্যক্তি ছিলেন। আমাকে একবার কতকগুলি নাটিকা লিখতে বলেন—প্রত্যেকটির বিস্তার ২০ মিনিট। তাঁর শর্ত ছিল

এই যে তিনটি মাত্র চরিত্র থাকবে, দুটি পুরুষ ও একটি নারী। শিল্পীদের নামও তিনি জানিয়ে দিলেন (তাঁদের দুজন এখন আর বেঁচে নেই)। একজন শৈলেন চৌধুরী ও অন্যজন নিউ থিয়েটার্সের কৌতুক অভিনেতা ইন্দু মুখোপাধ্যায়। অভিনেত্রী হচ্ছেন ঊষাবালা বা পটল, (যিনি শিশিরকুমারের পার্টির সঙ্গে অ্যামেরিকা গিয়েছিলেন)। শিল্পীরূপে সবাই সুবিখ্যাত।

এই পর্যায়ে আমি চারটি নক্সা লিখেছিলাম, 'পিপাসা', 'স্বামীসন্ধান', 'এইটে কি কম ?' (পরে 'গুপ্তধন') ও 'সাপ্তাহিক সমাচার'। অন্যান্য রেডিও নাটিকার সঙ্গে এই চারটি আমার "ঘুঘু" নামক বইতে স্থান পেয়েছে। 'এইটে কি কম ?' নামটি, নাটিকা-পরিকল্পনা এবং লেখার আগেই আমাকে দেওয়া হয়েছিল, দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। এটি সুরেশবাবুর নিজস্ব কৌতুক। আমি আপত্তি করিনি।

এই নাটিকাগুলি খুব ভাল ভাবে রিহার্সাল দেওয়া হ'ত। প্রত্যেকটি অন্তত তিন দিন। শৈলেন চৌধুরী এবং ইন্দু মুখুজ্জে—দুজনেই তখন যশের শিখরে। কিন্তু তাঁরা দুজনেই প্রত্যেকটি রিহার্সালে আমাকে থাকতে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা বলেছিলেন, আমি কোন্ কথাটা ঠিক কি অর্থে বা কোন্ ইঙ্গিতে ব্যবহার করেছি, অথবা কোন্ কথাটির উপর জোর দিতে চাই, তা সেই সময় আমার কাছ থেকে তাঁরা ভাল ক'রে বুঝে নিতে চান।

নিজেদের বিষয়ে কোনো দাম্ভিকতা নেই, উপরন্তু নিজেদের ছোট করা! স্বভাবতই এই অনুরোধ আমার কাছে নতুন বোধ হয়েছিল, এবং অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। আমি এ জন্য প্রত্যেক রিহার্সালে উপস্থিত থাকতাম। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতের 'অডিশন' আসরেও অনেক দিন গিয়ে বসেছি। সে অভিজ্ঞতাও খুব কৌতূহলোদ্দীপক, এবং অনেক মজার ঘটনা সেখানে প্রত্যক্ষ করেছি।

চতুর্থ পর্ব

দ্বিতীয় চিত্র

রেডিওর এই সঙ্গীত বিভাগের অডিশনে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী অতি-প্রত্যাশীকে কি ভাগে মুষ্টিভিক্ষায় নিরাশ করতেন তা দেখে প্রথমে আমি পরীক্ষার্থীদের মতোই মর্মাহত হয়েছি। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম কেন তিনি গানের বা বাজনার এক লাইন শুনেই থামিয়ে দিয়ে পরবর্তী প্রার্থীকে ডাকতেন। সুরেশবাবু বলেছিলেন সঙ্গীতের গুণাগুণ বিচারে ওর বেশি দরকার হয় না। কাজটি নিষ্ঠুর অবশ্যই, কিন্তু পরীক্ষা প্রার্থীদের সংখ্যা বিবেচনা করলে ও ছাড়া আর উপায় নেই। প্রার্থীরা আশা করতেন পরীক্ষক আরও একটু শুনুন, দশ বিশ সেকেণ্ড শুনে থামিয়ে দেওয়াতে তাঁদের অনেককে এমন মর্মাহত হ'তে দেখেছি যে তাঁদের কথা ভাবলে আজও দুঃখ হয়। সাহিত্য বিচারে সম্পাদকদেরও ঠিক তাই করতে হয়, তবু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কিছু স্বাতন্ত্র্য আশা ক'রেছিলাম, অবশ্য ভুল ক'রেই।

বেতার স্টেশনে তখন ডাইরেক্টর ছিলেন স্টেপলটন। তিনি ছিলেন যন্ত্রী, ভাল ইঞ্জিনিয়ার, অন্য বিদ্যা বিশেষ কিছু ছিল না। তবে ভাল লোক ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

বেতার স্টেশনে বক্তৃতার স্টুডিও ছিল তিন তলায়, এবং গান ও অভিনয়ের দোতলায়। গারস্টিন প্লেসের পুরনো বাড়িটার চেহারা বদলে ফেলা হয়েছে। এই বাড়ির গা ঘেঁষে একদিন রাত্রে বোমা পড়েছিল (১৯৪২) সেই যুদ্ধের সময়, তখন কি আতঙ্ক !

শুধু বাড়ির চেহারা নয়, প্রোগ্রামের চেহারাও বদলে ফেলা হয়েছে। বেতারের এখন বহু বিস্তার; অল্পদিনের মধ্যে প্রোগ্রামের এমন বৈচিত্র্য-বৃদ্ধি এবং শ্রোতা-বৃদ্ধি আগের দিনে কল্পনাতীত ছিল। ১৯২৬ সালেই সম্ভবত প্রথম রেডিও শুনি। শিশিরকুমার ভাদুড়ির সীতা অভিনয় রিলে করা হয়েছিল। বেতার গ্রাহক যন্ত্র তখন ভাল ছিল না, অস্পষ্ট শুনেছিলাম, তাইতেই কি আনন্দ। আজকের উন্নতির গোড়াপত্তন হয়েছিল নৃপেন্দ্রনাথ

মজুমদারের সময় থেকেই। তিনি এবং তাঁর সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার, রাজেন সেন, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বাণীকুমার প্রভৃতি গুণীজন একত্র মিলে বেতারকে এদেশে জনপ্রিয় করেছেন। কাজি নজরুল ইসলামও ছিলেন একজন প্রধান উৎসাহী। তিনি বহু সময় ওখানেই কাটাতেন। ওটাও ছিল তখন একটা বড় গানবাজনা এবং গল্পের আসর। সুরেন্দ্রনাথ দাস ভারতীয় সুরের বিচিত্র মিলনে নতুন অর্কেস্ট্রা পরিচালনায় এমন মেতে থাকতেন যে, সে সময় তাঁর বাইরের জ্ঞান লুপ্ত হ'ত। সঙ্গীত বিষয়ে গভীর নিষ্ঠা—সত্যকার ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো। কাজি নজরুলকেও এমনি ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবে দেখেছি কতবার। সুরের ধ্যানে মগ্ন। গাইবার সময়ও নজরুল মেতে উঠতেন। তাঁর হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে ব'সে তাঁর গান শুনেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গলা মধুর ছিল না, কিন্তু গানের মধ্যে এমন প্রাণ ঢেলে দিতেন যে তখন মুগ্ধ না হয়ে থাকা যেত না।

রেডিওর পরিবেশেই পরিচয় হ'ল এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে, তাঁর নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। এ রকম চরিত্র যে বাস্তবিক থাকতে পারে তা আমার কল্পনার অগোচর ছিল। সংসারে দুচোখ মেলে চাইতে পারলে বিচিত্র মানুষের দেখা মেলে, শুধু দেখতে জানা চাই। দেখার বিদ্যা শিখিনি। মানুষকে দেখতে হ'লে সাধনা দরকার। সে সাধনা থেকে দূরে আছি। তাই আমার পরিচয়ের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। আর ঠিক এই কারণেই হয় তো যাদের দেখি, তাদের হয় খুব কম দেখি না হয় খুব বাড়িয়ে দেখি। অতএব শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের মতো একটি চরিত্রকে আমি কোনো দিনই যথাযথ দেখতে পেতাম না যদি না তিনি নিজেকে এমন ক'রে দেখাতেন। তিনি এমন একটি অসাধারণ মানুষ যিনি সবার কাছে নিজেকে সর্বদা মেলে ধ'রে রেখেছেন, নিতান্ত অন্ধ ভিন্ন তাঁকে না দেখে কারো উপায় নেই।

আমরা সাধারণত অন্যের জীবনের ট্র্যাজিডি নিয়ে হাস্য কৌতুকের উপাদান বানাই, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত নিজেই নিজের যাবতীয় ট্র্যাজিডিকে হাস্যকৌতুকের উপাদান বানিয়েছেন। আজ (১৯৫৮তে) তাঁর বয়স প্রায় ৭৭ বছর, আজও তাঁর চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করে না। মনে হয়, হয় তো বা দুঃখের বোধই তাঁর নেই। বুদ্ধিতে

তীক্ষ্ণ, ভাষাশিল্পের যাদুকর। কবিত্ব শক্তি সহজাত, ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন, গান গেয়ে শোনান। বিদুষক বলতে যে পাণ্ডিত্য ও উইটের মিলন বোঝায়, এঁতে তা পূর্ণ মাত্রায় আছে। পাণ্ডিত্য শুধু পদবীগত নয়। দারিদ্র্যকে এমন হাতে কলমে চ্যালেঞ্জ ক'রে চলার দৃষ্টান্ত বিরল। দুঃখ থেকে পালিয়ে নয়, সংসারকে এড়িয়ে নয়, সংসারের মাঝখানে থেকে, দুঃখকে সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে, তাকে আজীবন পরাভূত ক'রে চলা কোন্ সাধনার ফল তা আমি জানি না। শিশুর মতো সরল, শিশুর মতো দুষ্টুমি বুদ্ধি। হৃদয়খানি বিরাট। এই বয়সে এক অনাত্মীয় মুমূর্ষু রোগিনীর পাশে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে বহুদূর পথ হেঁটে এসে বসতেন শুধু নানা কথা ব'লে গান গেয়ে রোগিনীর কষ্ট ভুলিয়ে রাখতে। রোগিনীর মৃত্যুদিন পর্যন্ত এ কাজ তিনি করেছেন। মৃত্যুর দিন অনাহারে সর্বক্ষণ রোগিনীর পাশে ব'সে। দাহক্রিয়া শেষ ক'রে ফিরেছেন সন্ধ্যায়।

এঁর সমস্ত জীবনের কৃতি নলিনীকান্ত সরকার যুগান্তরে লিখেছেন। এ সব কথাই শরৎচন্দ্রের কাছে অনেকবার শুনেছি। তাঁর মুখে তাঁর আসল চরিত্রটি ফুলের মতো হেসে ওঠে। সে জিনিসের লিখিত বর্ণনায় সে স্বাদটি আর থাকে না। তবু যে লেখা হ'ল, এ বাংলা দেশের ভাগ্য মনে করি।

১৯৩৬ সালের কোনো একদিন রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা গৃহে তাঁর গদ্য কবিতা অনেকগুলি পাঠ করেন। গদ্য কবিতা তখন সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি, অনেকে বিদ্রূপ করেছে। গদ্য ছন্দ ঠিকমতো পড়তে না জানার জন্যই এই বিরূপতা। এই রচনা গদ্যই, কিন্তু পদ্যের মতো মাপা মিটারে নয়। শুধু রিদম। ঠিকমতো পড়তে পারলে এর গদ্যত্ব মুহূর্তে ঘুচে গিয়ে প্রকৃত কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পড়তে জানা চাই। তখন তো দেখেছি অনেকেই ওর মধ্যে কবিতার মিটার খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়েছে। কবিতার তালে পড়তে গিয়ে আটকে গেছে। ঘেমে উঠেছে। বুঝিয়ে দিতে হয়েছে অনেক জিজ্ঞাসুকেই। 'লিপিকা' প'ড়ে তুলনার সাহায্যে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তবু পারিনি। পারিনি কারণ গদ্যকাব্য নামক যে রচনা তা পরিচিত কবিতার মতো সাজানো বলেই তাতে কবিতার নাচুনি ছন্দ বা মিটার খুঁজেছে তারা, প্রভেদ ধরতে পারেনি।

আর শুধু তাই নয়, নিজেরা লিখেছে গদ্য ছন্দ, কিন্তু তার মধ্যে অনেক জায়গায় মিটারের মিশ্রণ দিয়ে বসেছে, এমন কি মিলও দিয়েছে মাঝে মাঝে। এখনও এরকম হাস্যকর চেষ্টা দেখা যায় দু এক স্থলে।

কিন্তু সত্যই কাব্যপাঠে মিটারে হোক বা রিদম-এ হোক, রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর নিজের কণ্ঠে যে না শুনেছে তার পক্ষে তার সকল সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আধুনিক কাব্য সমালোচকেরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে কাব্য ধ্বনিগতপ্রাণ। যথার্থরূপে ধ্বনিত ক'রে পড়লে তবেই তার মর্মগ্রহণ সহজ হয়। এই আবৃত্তি কত সুন্দর হ'তে পারে, উচ্চারণ এবং ধ্বনি কত মর্মস্পর্শী হতে পারে তার চরম দৃষ্টান্ত আমার মতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন। যা আপাত দৃষ্টিতে গদ্য, তা তাঁর আবৃত্তিতে সেদিন তাঁর যে কোনো ছন্দোবদ্ধ কাব্যের মতোই সুরে কথায় অঙ্গাঙ্গি মিলে বর্ণনাতীত রূপে সুন্দর এবং জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ঘরভরা শ্রোতার কাছে সে দিন সে এক অভিনব উপলব্ধি। যাঁদের মনে কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল তাঁরা সেদিন দ্বিধাহীন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রকণ্ঠে কাব্যের আবৃত্তি প্রথম শুনেছিলাম ১৯১৭ সালে, আর শুনলাম সেই ১৯৩৬ সালে, কতদিন পরে। এবং তাঁর কাব্যের শেষ আবৃত্তি শুনলাম রেডিওতে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৩৮ সালে। আবৃত্তি করেছিলেন কালিম্পং থেকে। এর বিবরণ পাওয়া যাবে মৈত্রেয়ী দেবীর মংপুতে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে।

আমার এক বন্ধু শুধু এই আবৃত্তি শুনবেন বলেই রেডিও কিনলেন; পরে বলেছিলেন কেনা সার্থক হয়েছে। বন্ধুটি কারলাইল-ভক্ত নিখিলচন্দ্র দাস।

'জন্মদিন' অবিস্মরণীয় আবৃত্তি। এবং তা প্রতিটি কথার উচ্চারণে অর্থে ইঙ্গিতে এবং ধ্বনিতে শুধু নয়, কবিতাটির অন্তরে এমন এক গভীর বেদনার প্রকাশ ছিল, যার জন্য এ আবৃত্তি অবিস্মরণীয়। পৃথিবীর সঙ্গে মমত্ববন্ধনের আসন্ন ছেদের চিন্তার মধ্যে, পরম ঔদার্যের সঙ্গে মৃত্যুর সত্যকে স্বীকার করার মধ্যে, পৃথিবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যে, আর জীবনের সম্পূর্ণ-অর্থ খোঁজার জন্য অপর তীরে মুখ ফেরাবার সম্ভাবনার মধ্যে, তাঁর দিক থেকে যত সহজ হোক, আমাদের মনে তার প্রতিক্রিয়া সহজ ছিল না। মৃত্যুর কথা তিনি অনেকবার শুনিয়েছেন, কিন্তু এবারের কথায় অতিরিক্ত আর একটা সুর লেগেছিল। তিনি এবারে বললেন ঃ

"আজি আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন ; একাসনে দোঁহে বসিয়াছে"···

তাই আগে যা ছিল বহুদূরের সম্ভাবনা, যা ছিল শুধু মূল সত্যের একটা আত্মিক উপলব্ধি, এবারের কথায় তার সঙ্গে আসন্ন দৈহিক মৃত্যুর অশুভ একটি আভাস যুক্ত হয়েছিল। এই অশুভটা অবশ্য আমাদের মনেরই প্রতিফলন, কবির মনে কোনো আতঙ্ক ছিল না, জীবনের প্রতি লোলুপতা ছিল না ; একটা অভাবিত উদাসীনতার সঙ্গে জীবনের এই পরম সত্যকে স্বীকার করেছিলেন, যেমন তিনি আগে করেছেন। কিন্তু তাঁর সুরে মাঝে মাঝে যে তিক্ততা ফুটে উঠেছিল, সে অন্য কারণে। সে হচ্ছে সভ্যতার আপাত ব্যর্থতায়, সভ্যতা প্রহসনে রূপান্তরিত হওয়ায়। সে দিন তাঁর কথায় বর্তমানের 'নরমাংসলোভী' পশুধর্মী মানুষের বিরুদ্ধে এক প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। মনুষের প্রতি তাঁর এতদিনের যে বিশ্বাস তাও যেন মুহূর্তের জন্য শিথিল হয়ে এসেছিল। তাঁর কণ্ঠ সেদিন এমন প্রচণ্ড আবেগপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল তা কণ্ঠস্বর নয়, নায়াগারা জলপ্রপাত—ভয়ঙ্কর গর্জনে ভেঙে পড়ছে অপরাধী মানুষের মাথার উপর। কিন্তু যাদের উদ্দেশে এ ধিক্কার তারা বধির, তাদের ঘাড় ইস্পাতের। তবু সত্য একদিন জয়ী হবে, এ বিশ্বাস নিয়েই তিনি বললেন—

···''মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ,
নাট্যের কবর রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

সমস্ত মিলে কি অদ্ভুত অনুভূতি। এখনও মনে পড়লে সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। জীবন ধন্য মনে হয়েছিল সেদিন। মুখে ভাষা ছিল না, চোখে জল এসেছিল আনন্দে। শোনবার সময় মাঝে মাঝে সত্যিই ভয় হচ্ছিল কবির হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে না যায়, এমন ঝড় উঠেছিল সেদিন তাঁর কণ্ঠে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম চন্দননগরে ১৯৩৭, ২১ শে ফেব্রুয়ারি (৯ই ফাল্গুন, ১৩৪৩) তারিখে।

সেটি ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন। সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহরিহর শেঠ। আমরা অন্তত পঞ্চাশজন বন্ধু এই উপলক্ষে সেখানে গিয়ে মিলেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের অলিখিত বক্তৃতা এর আগে শুনেছি (১৯২১) শান্তিনিকেতনে বুধবারের প্রার্থনা সভায়। তারপর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে, তারিখ মনে নেই। অলিখিত ভাষণ যে এমন অদ্ভুত সুন্দর হতে পারে সেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম। তারপর চন্দননগরের অভিভাষণ। এও অলিখিত। একটি যেন সম্পূর্ণ ছবি, কোথায়ও এক মুহূর্ত দ্বিধা নেই, অথচ মুখে মুখে অন্তত পনের মিনিট ধ'রে উচ্চারিত সেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ভাষণের মনোহারিত্বে জীবন সার্থক মনে হয়েছিল সেদিন।

এরপর শ্রীহরিহর শেঠের অভ্যর্থনা ভাষণ। ভূমিকাটুকু মাত্র শুনেছিলাম। তাঁর আপন স্বভাবসিদ্ধ সরলতার প্রকাশ ছিল তাঁর প্রত্যেকটি কথায়। সময় ছিল কম, আমার একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল নৌকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফ তোলা। অমল হোমের সঙ্গে আগেই গোপনে পরামর্শ করা ছিল। আমরা দুজনে সভা ছেড়ে বোটে এসে উঠলাম। তার পরের ইতিহাস লেখা আছে আমার 'ম্যাজিক লণ্ঠন' বইতে।

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে একবার মনে হয়েছিল একখানা মাসিকপত্র চালালে কেমন হয়। কাগজের নামও ঠিক হয়েছিল, হিমালয়। শরদিন্দু ও বলাইচাঁদের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম—যেন নিয়মিত লেখে। খুব রাজি দুজনে। আমার সাহায্য হবে জেনে আমার জন্য কষ্ট করতে রাজি। তারপর যখন এ পরিকল্পনা কোনো কাজের নয় বোঝা গেল, তখন বন্ধুদের জানিয়ে দিলাম, "হল না।" দুজনেই জানাল, "বাঁচা গেল।" মানে আমার ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার কল্পনায় তারাও বাঁচাল।-- সবাই বেঁচে গেলাম।

১৯৩৮ থেকে শুরু ক'রে ১৯৩৯-এর কয়েক মাস—মোট প্রায় এক বছর—আর্ট প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত সচিত্র ভারত সম্পাদনা করি। এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সচিত্র ভারতের আকার তখন অনেক বড় ছিল, প্রায় ১১ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি। ছাপা হ'ত আর্ট পেপারে, মলাট ছিল কারট্রিজ পেপারের, তার উপর অফসেটে ছাপা ফোটোগ্রাফ। ভিতরে

ফোটোগ্রাফের ছড়াছড়ি, দাম ছিল মাত্র চার পয়সা। সে সময়ে লেখকরূপে পেয়েছি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, 'ভাস্কর,' অজিতকৃষ্ণ বসু, প্রমথনাথ বিশী, হাসিরাশি দেবী, বনফুল ইত্যাদিকে। প্রবন্ধ বা গল্পের জন্য তখন পাঁচ টাকা দেওয়া হ'ত। ভাস্কর (ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ)-কে আমি প্রথমে একটি লেখার মাধ্যমে আবিষ্কার করি। আহারের বর্বরতা নামক একটি রচনা পাঠিয়েছিলেন আমার আছে। প'ড়ে এত ভাল লেগেছিল যে তার পর থেকে তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মে। রচনাটি শনিবারের চিঠিতে ছাপি।

সচিত্র ভারতের একটি হিন্দি সংস্করণ ছিল, একই চেহারা এবং ছবি। সেটি সম্পাদনা করতেন ধন্যকুমার জৈন। হিন্দি অনুবাদ সাহিত্যে ধন্যকুমার জৈন তখনই বেশ নাম করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের লেখার সকল অনুবাদ তিনি করেছেন।

১৯৩৯ সালেই 'অলকা' নামক মাসিকপত্র সম্পাদনায় প্রমথ চৌধুরীর সহযোগীরূপে কয়েক মাস কাজ করি। কাগজের ভবিষ্যৎ যাই হোক, অল্পদিনের জন্য বাংলা সাহিত্য জগতের অন্যতম বিস্ময় প্রমথ চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে আমার ভবিষ্যৎ কালের জন্য একটি বড় স্মৃতির সম্পদ লাভ হ'ল। রবীন্দ্রনাথের পরেই এই পরিচয় আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

'অলকা'র মালিক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। তাঁদের হিমালয় হাউসের 'অলকা' অফিসে যে দিন প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় সেই দিনই তাঁর প্রথম প্রশ্ন "এক ক্ল্যান তো?"—অর্থাৎ বারেন্দ্র কি না। এই একটি কথাতেই আমাদের মধ্যেকার অপরিচয়ের দূরত্ব মুহূর্তে দূর হ'ল।

তাঁর পাম প্লেসের বাড়িতে প্রায় যেতে হ'ত আমাকে। তিনি অত্যন্ত সরল হৃদয় ছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পরম সুহৃদের। ব'সে ব'সে কত গল্প করতেন। প্রথম দিনই ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়।

আমি যতদিন গিয়েছি তাঁকে একা পেয়েছি। মনে হয় কিছু নিঃসঙ্গ বোধ করতেন, আমাকে পেলে উৎসাহের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন। সবুজপত্র যুগের কথা উঠেছিল একদিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সে যুগে আপনার মনের মতো এত লেখা পেতেন কি ক'রে?" তিনি বললেন, তখন তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হ'ত। নতুন লেখকদের লেখা, যার মধ্যে বক্তব্য আছে কিন্তু লেখার স্টাইল নেই, ফর্ম নেই, সে সব লেখা

খুব যত্ন ক'রে সংশোধন ক'রে নিতে হ'ত। এইভাবে তিনি লেখক তৈরি করেছেন। অনেক লেখা মনের মতো ক'রে তৈরি ক'রে নিতে হ'ত, আগাগোড়া নতুন ক'রে লিখে। বললেন, "তখন সম্পাদনা খুব পরিশ্রমের কাজ ছিল, মনোযোগ রাখতে হ'ত সবগুলো পাতার উপর। সব পাতাই সবুজ পাতা করা হ'ত এই ভাবে।"

একটি সোফার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকতেন, আমি কখনো তাঁর পাশে, কখনো সামনের আসনে বসতাম। কথা বলতে তাঁর ঠোঁট তখন ঈষৎ কাঁপতে আরম্ভ করেছে, এবং কণ্ঠও কিছু ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করতে আমার কোনো কষ্ট হ'ত না, যেমন হ'ত না তাঁর কাঁপা-আঙুলের লেখা পড়তে।

অতি অন্তরঙ্গ সুমার্জিত ব্যবহার, আভিজাত্যে কোনো ভেজাল ছিল না। একদিন বললেন, "লেখায় বুদ্ধির ছাপ পড়লে সে লেখা সাধারণ পাঠক পড়তে চায় না, অনেক সময় আবার ভুল বোঝে।"

এ সব কথা কোনো বিশেষ রচনা সম্পর্কে হয় তো বলেননি। আরও বললেন, "না বুঝে চুপ ক'রে যাওয়া ভাল, কিন্তু ভুল বুঝে তেড়ে আসা বিপজ্জনক।"

আমি তাঁরই কথায় তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম, বললাম, "আপনিই তো বলেছেন মানুষের বোঝবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে কিন্তু তার না বোঝবার ক্ষমতা অসীম?" একটু হেসে বললেন, "বিপদ তো সেইখানে।"

একদিন শ্লেষ বা পানিংএর ব্যবহার সম্পর্কে কথা তুললেন এবং এ বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করলেন। মনে আছে শুধু বলেছিলাম, ওটি ভাষার একটি অলঙ্কার, মাঝে মাঝে ভাল লাগে। বেশি ব্যবহারে আসল বক্তব্য চাপা পড়ে, তবে আসল বক্তব্য যদি কিছু না থাকে সে ক্ষেত্রে পানিং-এর রসটা উপভোগ করতে মন্দ লাগে না।

আলোচনা চলছিল ফীটনে বসে। পাম প্লেসের বাড়ি থেকে উঠতে দেরি হয়েছিল, তাঁর বেড়াতে বেরোনোর সময় হয়েছিল, বললেন, "চল আমার সঙ্গে, তোমাকে ট্রাম লাইনে ছেড়ে দেব।" তখন পার্ক সার্কাসের বেশি ট্রাম লাইন ছিল না। আমাকে ছাড়লেন রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে। যতদূর মনে পড়ে, বলেছিলেন অজিত চক্রবর্তীর বাড়িতে যাবেন।

আলাপ চলতে লাগল। প্রমথনাথ বলতে লাগলেন "চেস্টারটন পড়তে গিয়ে দেখি পড়া শেষ হ'ল, পড়ার আনন্দও শেষ হ'ল। কিছু মনে রইল না। প্যারাডক্সের আতিশয্যে পড়া এগোতে চায় না। লক্ষ্যে পৌঁছতে বড্ড দেরি হয়। অবশ্য তাঁর সব লেখা এ রকম নয়। বললেন, বিনাপানে অলঙ্কার হয় কিন্তু অলঙ্কারহীন পান হয় না। বক্তব্য সম্পূর্ণ হারিয়ে গেলে উপভোগ করতেও আটকায়। সে জন্য খুব সাবধানে ও-জিনিস ব্যবহার করতে হয়।"

তখন বর্ষাকাল, আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে। পথের উপর আলোর চিকচিক প্রতিফলন। ভিজে গাছের পাতায় আলো কাঁপছে। কোন্ পথে গাড়ি চলেছে সে খেয়াল করিনি, ওদিকের পথও তখন অপরিচিত। একটি পার্কের পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে।

কতদিন পরে যুগান্তরে প্রবেশের পর (১৯৪৫) আবার গিয়েছি তাঁর কাছে কত বার। লেখা চেয়েছি এবং পেয়েছি। লেখার ভাণ্ডার থাকত ইন্দিরা দেবীর কাছে, তিনিই বেছে দিতেন। তিনি আমার প্রতি তাঁর প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ তাঁর 'অনুকথা সপ্তক' আমাকে একখানা উপহার দিয়েছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা দুরকমই লিখে দিলেন আমার নামে। এটি অযাচিত উপহার। ১৬-৯-৩৯ তারিখটি আমার কাছে স্মরণীয় আছে এ জন্য। ১৯৩৯ সালেই অলকায় তাঁর একটি লেখা ছাপা হয়েছিল।—অলকা আমার কাছে একখানিও নেই, তাই ঠিক মনে নেই, কিন্তু পাণ্ডুলিপি আমার কাছে এখনও আছে। ছাপাখানা থেকে বাঁচিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছি। হাতের লেখা দেখে মনে হয় আরও দুএক বছর আগের লেখা, কারণ এ লেখা অনেক স্পষ্ট। লেখাটির নাম "ভারতবর্ষ—যাদুঘর"। ছোট্ট লেখা। লেখার নীচে বাঁয়ের দিকে লেখা রাঁচি, ডানদিকে "বীরবল"। শিরোনামা ও স্বাক্ষর পরবর্তীকালের। এই রচনাটি আমার খুব ভাল লেগেছিল, তাঁর কোনো সংকলনে ছাপা হয়েছে কি না জানি না। সে লেখাটির কিছু অংশ এই—

"ভারতবর্ষের ইতিহাস যে লেখা হয় নি তার কারণ ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস নেই। ইতিহাস অতীতেরই হয়, বর্তমানের হয় না। ভারতবর্ষের কোনো অতীত নেই, কেননা ভারতবর্ষের সবই বর্তমান। সুতরাং যাঁরা হয় পুথির নয় মাটির ভিতর থেকে ইতিহাস বার করতে চাচ্ছেন তাঁরা সময় ও পরিশ্রম দুই বৃথায় ব্যয় করছেন। লুপ্ত জিনিসেরই উদ্ধার হতে পারে, এদেশে কিছুই লোপ

পায় না। ভারতবর্ষের কত হাজার বৎসর জানিনে সব পাশাপাশি সাজান রয়েছে—ভারতবর্ষের সভ্যতার সকল স্তর এক সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ দেশে এত বিভিন্ন জাতের এত বিভিন্ন স্তরের লোক স্বধর্ম পালন করে চলেছে যে ভারতবর্ষকে নির্ভয়ে মানবসভ্যতার যাদুঘর এবং ভয়ে ভয়ে মানবজাতির পশুশালা বলা যেতে পারে। মানুষ সম্বন্ধে মানুষের যত রকম বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আছে, ভারতবর্ষের কাছ থেকে সে সকলের চরিতার্থতা লাভ করা যেতে পারে।

"আমার চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছি বিংশ শতাব্দির বাংলার গা ঘেঁসে শুধু প্রচীন নয় আদিম ভারতবর্ষ সশরীরে বর্তমান রয়েছে।...পৃথিবীতে এমন আর কোনও দেশ নেই যেখানে যিশু খৃষ্টের আগের দুহাজার বৎসর আর পরের দুহাজার বৎসর এমন বেমালুম ভাবে গায়ে গা মিলিয়ে থাকতে পারে। ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে তাই দিন রাত জড়াজড়ি করে চির সন্ধ্যারূপে বিরাজ করছে।

"ঐতিহাসিক ত দূরের কথা প্রাক্-ঐতিহাসিক ভারতবর্ষও যদি কেউ প্রত্যক্ষ করতে চান ত চোখ মেললেই তা দেখতে পাবেন—শাস্ত্র কিংবা পৃথিবীব গর্ভের অন্ধকারের ভিতর ঢোকবার দরকার নেই।"

হাল্কা সুরে বলা কিন্তু ব্যঙ্গ সুদূরপ্রসারী।

রেডিওর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এককালে রাষ্ট্রনীতিতে মেতে উঠেছিলেন এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট লেখা লিখেছিলেন বিজলী কাগজে। এ লেখা প্রমথনাথের ভাল লেগেছিল এবং তিনি সে কথা মনে রেখেছিলেন।

একদিন অলকায় সংগৃহীত লেখাগুলো তাঁকে দেখবার সময় সুরেশ-বাবুর কাছ থেকে আনা সঙ্গীতবিষয়ক রচনা তাঁকে দেখাই। তিনি দেখে বললেন সুরেশ চক্রবর্তী—যে রাজনীতি নিয়ে লিখত বিজলীতে? তার লেখা একটা নকসা আমার খুব ভাল লেগেছিল। সে আবার সঙ্গীত নিয়ে কি লিখবে? সঙ্গীত জানে না কি?

জানেন শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। বিস্ময়টা অবশ্য আমারও হয়েছিল, সঙ্গীত রসিকের মধ্যে সাহিত্য রসিককে আবিষ্কার ক'রে। লেখাটি অলকায় ছাপান হয়েছিল।

তরুণ লেখক নবেন্দু ঘোষ একটি গল্প পাঠায়, সেটি আমি পড়ে মুগ্ধ হই এবং অলকাতে ছাপি। তার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল মনে হয়েছিল—কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে কোথায় সে গা ঢাকা দিয়েছে এখন জানি না।

১৯৩৯ সালের ২১ শে জুলাই পাবনা থেকে একখানা চিঠি পেলাম, লেখক আমার বাল্য বন্ধু (তখন অ্যাঃ পাবলিক প্রোসিকিউটর) ফণীন্দ্রনাথ রায়।

ফণী আমার সহপাঠী এবং সাহিত্যিকরূপে আমার পূর্বগামী। তার কথা আগে বলেছি। সে লিখেছে—

"আমাদের লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসব আগামী ১৪ই শ্রাবণ, ইংরেজী ৩০শে জুলাই। এঁরা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গেষ্ট অব অনার করতে চান। তিনি তোমার বন্ধু এবং লিখেছে তাঁকে আনার ব্যবস্থা করতে পার। তোমাকেও আসতে হবে।"

গিয়েছিলাম পাবনা। দীর্ঘ একুশ-বাইশ বছর পরে পাবনায় এসে তার আবহাওয়াতে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে সতেজ মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য নিয়মের বাইরে গেলেই একটু বেঁকে দাঁড়ায়। তাই সুস্থ বেশিক্ষণ থাকিনি, এক বেলা মাত্র ছিলাম। ফিরেছিলাম রাত্রে সামান্য জ্বর নিয়ে। বিভূতিবাবুর স্বাস্থ্য সম্ভবত আরও ভাল হয়েছিল ওখানে গিয়ে। তিনি সকালের সভার পরই খুব উৎসাহের সঙ্গে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম দেখতে চলে গেলেন, নানা কারণে আমার শুভার্থীরা আমাকে যেতে দিলেন না। ভালই করেছিলেন, আর কিছু না হোক ফিরে এসে শুয়ে পড়তে হ'ত নিশ্চয়। বিভূতিবাবু খুব উজ্জ্বল মুখে ফিরলেন, কথাবার্তায় মনে হ'ল দীক্ষিত হয়ে ফিরেছেন, কারণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আবার আসবেন সেখানে সুযোগ পেলেই।

সে দিন রবিবার, আমার রেডিও বক্তৃতা, ব্যবস্থা হয়েছিল আর কেউ প'ড়ে দেবেন আমার লেখা। পাবনা থেকেই সেটি শুনলাম, পড়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পাবনায় সন্ধ্যার সভায় খুব ভিড় হয়েছিল। প্রবল বৃষ্টি ও বাতাস, তাতে কোনো বাধা হয় নি। আমি একটি লিখিত বক্তৃতা পড়েছিলাম তা এখন সম্পূর্ণ মনে নেই, তবে তার আরম্ভটি মনে আছে। আমি বলেছিলাম, "লাইব্রেরি উৎসবে যোগ দেবার জন্য একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ অনুভব করেছি আরো এই কারণে যে আমি নিজে তিনটি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা।"

খবরটি কারো জানা ছিল না। সবাই এমন একজন বিখ্যাত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠাতাকে চেনেন না ভেবে সম্ভবত লজ্জাও পাচ্ছিলেন। তবে তাঁদের আশ্বস্ত করলাম। বললাম "তিনটি লাইব্রেরিই প্রতিষ্ঠা করেছি আমার নিজের বাড়িতে, এবং তিনটিই উঠে গেছে, একখানি বইও অবশিষ্ট নেই।"

বিভূতিবাবুর সকালের ও রাত্রের দুটি বক্তৃতাই এমন জ্ঞানগর্ভ এবং চিত্তগ্রাহী হয়েছিল যে পাবনায় আমাদের আয়ু মাত্র একদিনের জন্য হওয়াতে সবাই অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ। এমনকি এত আয়োজন ক'রে তাঁরা যেন ঠকে গেলেন

এই রকম ভাব। কিন্তু উপায় ছিল না। সন্ধ্যা থেকেই দুর্যোগ, তারই মধ্যে ঈশ্বরদি অভিমুখে রওনা হ'তে হ'ল।

১৯৩৯ সালের ২রা অগস্ট তারিখে পাবনা থেকে প্রেরিত একটি দীর্ঘ রিপোর্ট যুগান্তরে প্রকাশিত হয়। খবরটির অংশবিশেষ এই

"গত ৮ দিন ধরিয়া এখানে ২৪ ঘণ্টা মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে...গত ৩০ শে জুলাই পাবনা অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপরিমল গোস্বামী এখানে আসিয়াছিলেন। সকাল ৭॥ টায় শ্রীজাহ্নবী চরণ ভৌমিক সরকারী উকিল উৎসবের উদ্বোধন করেন ও তৎপর শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহন করেন।...লাইব্রেরির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য উপস্থিত ভদ্রমহোদয়-গণকে সাদর সম্ভাষণ জানান।...বিকেল ৬॥ ঘটিকায় পুনরায় গ্রন্থাগারের সাহিত্যশাখার উদ্যোগে একটি সাহিত্য বাসরের অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্ত বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় টাউন হলে সভা স্থানান্তরিত করা হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজরাখাল রায় সমবেত সাহিত্যিকগণকে ও জনসাধারণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

"শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চৌধুরী ও মকসেদ আলীর কবিতাগুলি উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়ের শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে দুএকটি কথা, শ্রীনিবারণ চন্দ্র সেনের বাংলা ভাষা সরল করা যায় কি না, মৌলবী এম রজব আলীর জীবনমরণের ফিলসফি ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ছোট গল্প উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীপরিমল গোস্বামী ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় দুইটি অতি উচ্চাঙ্গের হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় ছোট গল্প উপন্যাস প্রভৃতি লিখিবার কৌশল ও শ্রেষ্ঠ লেখকগণের উন্নতির কারণ কি ইত্যাদি সুন্দররূপে বর্ণনা করেন। সভায় কুমারী ইলা ভৌমিক ও কুমারী তুলসী সাহা কণ্ঠসঙ্গীতে সকলকে আনন্দদান করেন।"

ছেড়ে আসা স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি সম্পর্কে আমার মধ্যে সম্ভবত একটু অতি মাত্রায় আকর্ষণ জেগেছে সম্প্রতি। এটি হয়েছে দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে, স্বদেশ বিদেশ হওয়ার পর থেকে। নিজের দেশে যেতে পাসপোর্ট লাগবে, এই কল্পনা থেকে।

বাল্যকালটি মনে এমন আশ্চর্য ছাপ এঁকে রেখেছে যে ভাবলে অবাক হতে হয়। বাল্যকালের বন্ধু মোহিনীমোহন গুহের সঙ্গে চল্লিশ বছর পরে (২৪-৬-৬০) দেখা, কিন্তু চিনতে এক সেকেণ্ডও দেরি হয় নি। বালক অবস্থায় ছাড়াছাড়ি, আজ পক্বকেশ বৃদ্ধ সে। আরও একজনকে ঠিক চল্লিশ বছর পরে দেখামাত্র চিনেছি।

১৯৩৯ সালে পাবনা গিয়ে রোমাঞ্চিত হইনি, শুধু স্বাভাবিকভাবে যেটুকু ভাল লাগা তাই লেগেছে। কিন্তু আজ সে স্থানের প্রত্যেকটি ধুলিকণা আমার কল্পনায় পরম সুন্দর। এক দিনের জন্য যাওয়া, কিন্তু আজ হ'লে এই একটি মাত্র দিন অনেক দিন ও অনেক কালের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে যেত।

পাবনা শহর-পরিবেশে পূর্ব পরিচিত একমাত্র আর. বোস প্রিন্সিপালকে দেখলাম। তবে তিনি আর পূর্বের পরিচিত সাহেব আর. বোস নন, খাঁটি বাঙালী রাধিকানাথ বসু, আড্ডায় বসে তাস খেলছেন। আমাদের ছাত্রজীবনে তাঁর জীবনের বাঙালী-দিকটি আমাদের চোখে চাঁদের অপর দিকের মতোই অদৃশ্য ছিল। শিক্ষকরূপে তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ছিলেন।

১৯৩৯ সালের অগস্ট মাসে নিউ থিয়েটার্সের অমর মল্লিকের একখানি ছবির সংলাপ রচনায় সাহায্য করছিলাম পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মাঝে মাঝে যেতাম টালিগঞ্জের ষ্টুডিওতে। সে দিন ৩রা সেপ্টেম্বর। বিকেলের দিকে স্টুডিওতে কে একজন এক পয়সার একখানা বিশেষ সংখ্যা খবরের কাগজ নিয়ে এলেন। ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল—ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জার্মানির বিরুদ্ধে।

ভবিষ্যৎ দ্রুত অনিশ্চিত হয়ে উঠল। সাধারণ লোকের চোখে আতঙ্ক-পূর্ণ দৃষ্টি, ব্যবসায়ীদের এক সম্প্রদায় উল্লসিত। তাঁরা নীরব কর্মী, বাজার থেকে এক দিনে বিদেশী জিনিস প্রায় অদৃশ্য! তারপর দেশী জিনিসের পালা। লাভের রাজপথ আবিষ্কার হ'ল আরও কিছু পরে, সে পথ তৈরি হল লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের কঙ্কালে। গ্রামের লোকেরা দলে দলে এসে কলকাতা শহরের পথে তাদের দেহ পেতে দিল। শিশু যুবক বৃদ্ধ নারী পুরুষ সবাই। এটি হল যুদ্ধের তিন বছর বয়সের পর থেকে। এর নাম দিলাম মহামন্বন্তর। মন্বন্তর ঘটেছিল প্রাকৃতিক কারণে—মহামন্বন্তর তৈরি হল ল্যাবরেটরিতে। আসলের চেয়ে নকল অনেক শক্তিশালী।

যুদ্ধ ঘোষিত হ'ল, কিন্তু যোদ্ধারা নিষ্ক্রিয় ছিল অনেক দিন, তাই নাম হয়েছিল 'ফোনি ওয়ার'—নকল যুদ্ধ। এই নিষ্ক্রিয় সময়টা আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির সুযোগ দিয়েছিল।

আমাদের কাছে অবশ্য এই নিষ্ক্রিয়তা বেশ মজার মনে হ'ত। তখন ব্ল্যাক-আউট বা নিষ্প্রদীপতার পালা চলছে। গর্ত খোঁড়া শেষ হয়েছে সমস্ত

ময়দানে, পার্কে। ব্যাফল ওয়াল উঠেছে যেখানে-সেখানে, ইটের গাঁথুনিতে এস্কিমোদের বরফের 'ইগলু'র মতো ঘর তৈরি হচ্ছে, বিমান আক্রমণে সেই অ্যানডারসন শেলটারের মধ্যে ঢুকতে হবে। কাছাকাছি কিছু না থাকলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে পথের পাশে। কানে তুলো এবং দাঁতে রবার চেপে ধরতে হবে। সভ্যতার গর্বে স্বর্গে ওঠা মানুষ নব সভ্যতার আতঙ্কে পাতালে ঢোকার আয়োজনে ব্যস্ত!

তারপর নকল যুদ্ধ আসল যুদ্ধে পরিণত হ'ল, এবং যুদ্ধের প্রথম স্পর্শ পাওয়া গেল ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর, যেদিন কলকাতায় প্রথম জাপানী বোমা পড়ল। এর পর থেকে শহর জীবন একেবারে এলোমেলো হয়ে গেল। শহর প্রায় খালি ক'রে লোক পালিয়ে গেছে। যখন-তখন সাইরেন বাজছে, ছুটে যাচ্ছি আশ্রয়ে। নিজের কাছেও নিজের মানমর্যাদা থাকে না। শ্রদ্ধেয় সব ব্যক্তি বুকে হেঁটে গর্তে ঢুকছেন এবং গর্তের ভিতর থেকে ভীত চোখ কিংবা কম্পিত গোঁফ বা'র করছেন মাঝে মাঝে, এ দৃশ্য যত হাস্যকর, তত অপমানকর।

যুদ্ধের পরিণাম বিচার বা তত্ত্ববিচারের অধিকার বিষয়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর উপর আমার আস্থা ছিল পুরোমাত্রায়, এবং মাথার উপর ডামোক্লিসের তরবারি খানা সর্বদা ঝোলা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতাম যে এ যুদ্ধে জার্মানরা হেরে যেতে বাধ্য। যুদ্ধ যদি দশ বছর চলে, এমন কি ইংরেজ সরকারকে যদি ব্রিটেন ছেড়ে পালাতে হয়, তবু তারা না-জেতা পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে পারবে। শুধু যুদ্ধ কৌশলের বিচার নয়, যুদ্ধ দীর্ঘকাল চালাবার সঙ্গতির দিক থেকে তাঁর বিচার খুব যুক্তিপূর্ণ ছিল। যুদ্ধকালে প্রধানত আমরা তিন জন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী ও আমি নিয়মিত যুদ্ধ পর্যালোচনা করতাম রেডিওতে। নীরদবাবু ক্ষীণকায়, প্রমথনাথও তাই (বর্তমানে কিঞ্চিৎ ওজন বৃদ্ধি ঘটেছে), আমিও তাই। এই তিন ক্ষীণের অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটেছিল মিত্রপক্ষের সমর্থকরূপে। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল বিষয়ে আমাদের আলোচনা কোনো সময়েই যুক্তির দিক থেকে ক্ষীণ ছিল না।

একদিন বেলা দশটার সময় সাইরেন বাজল। সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাড়িতে, ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউতে। তাঁর আড্ডা ঘর সব সময় পূর্ণ থাকত। সেটি এক তলা হওয়াতে এ-আর-পি ব্যাকরণ মতে সেটি নিরাপদ, কাজেই আর ছুটে পালাতে হ'ল না।

নিকটে কোনো গর্তও ছিল না। তবে আমি শচীন্দ্রনাথকে বলেছিলাম, 'আপনি আগে হাতীবাগানের বাজারে থাকতেন সেখানে ইতিমধ্যে বোমা ফেলেছে, আশা করি আপনার নতুন ঠিকানা জাপানীদের কাছে পৌছয়নি?'

দিনের বেলায় সাইরেনে ততটা ভয়ের কারণ ছিল না, ভয় হ'ত রাত্রে। বর্তমান যুদ্ধে সামরিক লক্ষ্য সবাই, তবু দিনের বেলা বোমা ফেলতে হয়তো একটুখানি চক্ষুলজ্জার প্রমাণ পাওয়া যাবে, এই ভরসা।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে ১৯৪০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হই—ম্যাট্রিক্যুলেশন, বাংলা, দ্বিতীয় পত্র। প্রধান পরীক্ষক ডক্টর সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে দারভাঙা বিলডিংএ পরীক্ষকদের সভা বসত। অনেক বন্ধুকে পেলাম এখানে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদয়াল বসু, গোপাল হালদার, প্রমথনাথ বিশী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, মনোজ বসু, অজয় ভট্টাচার্য, মহাদেব রায়, বিভাস রায়চৌধুরী, তারাপদ রাহা প্রভৃতি। পর বছর নতুন এলো সরোজকুমার রায়চৌধুরী। তারপর স্ক্রুটিনির আসরে আরও বন্ধু লাভ হল, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, নগেন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি।

প্রথমবারে সভাশেষে কাছাকাছি চায়ের দোকানে গেলাম কয়েক জন, বিভূতি বাবু, অজয় বাবু, আমি এবং আরও কে দু এক জন, এখন মনে নেই। সেবারের খরচ দিলেন অজয় ভট্টাচার্য। পর বছর আমরা আবার একত্র জুটে গেলাম সভা ভাঙার পরে। অজয় ভট্টাচার্যকে ধরলাম এবং বললাম "চা অভিযানের স্থায়ী নেতা আপনি। এ বিষয়ে আমাদের কি অসুবিধেয় ফেলেছেন একবার ভেবে দেখুন। দক্ষিণ কলকাতার লোক কি না, তাই চা খাওয়ানোর গৌরবটি পুরোপুরি আপনি নিতে পারেন; একেই বলে এক্সপ্লয়টেশন। আমরা এ জন্য ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত, কিন্তু উপায় তো নেই, চলুন।"

অজয় বাবু এমন প্রীতিপ্রবণ ছিলেন যে তিনি সমস্ত খরচ বহন ক'রে খুশি হতেন। আরও অনেক বার তাঁর ঔদার্যের পরিচয় পেয়েছি অনেক ক্ষেত্রে। তাঁর সঙ্গে মিশে বড়ই আনন্দ পেয়েছি। গলায় চাদর জড়ানো সদা হাসি মুখ লোকটি সংসার থেকে অকালে বিদায় নিয়েছেন; এই সঙ্গে আরও একজনের কথা মনে পড়ে—গৈরিক বেশধারী উদাসী—হিমাংশু দত্ত সুরসাগর। অজয় বাবুর রচনা তখন খুব ছড়িয়ে পড়েছে আধুনিক সঙ্গীতের মহলে, হিমাংশু দত্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এ দিক দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। হিমাংশু দত্তও আর

নেই। দুজনের মিলনে আধুনিক সঙ্গীত যে উচ্চগ্রামে উঠেছিল, এবং তার যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, তা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হল; এ ক্ষতি অপূরণীয়।

কৃষ্ণদয়াল বসু যখন রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' ছন্দের অনুকরণে প্রবাসীতে কবিতা লেখেন সেই কোন্ যুগে বোধ হয় আমার ছাত্রজীবনেই, এবং তাঁরও, তখন থেকে তাঁর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ইণ্টারন্যাশন্যাল বোর্ডিংএ তাঁকে প্রথম দেখি, মনে আছে। পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে। ভাষা সম্পর্কে তাঁর মমত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁর হাতের লেখা পরিচ্ছন্ন, পোষাক পরিচ্ছন্ন, ব্যবহার পরিচ্ছন্ন। আদর্শ শিক্ষক। স্ক্রুটিনিয়ার রূপে তাঁর পরীক্ষিত খাতা দেখেছি, তাঁর মার্ক দেওয়াও পরিচ্ছন্ন, এমন আর কারো দেখিনি। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কম কিন্তু অন্তরঙ্গতা অনুভব করি মনে মনে।

শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও কি ক'রে সুখের পথ খুঁজে পাওয়া যায় তার খবর দিতে পারবে মনোজ বসু। সদা হাস্যোচ্ছল, উৎসাহী কর্মবীর। শিক্ষকতা প্লাস সাহিত্য রচনা, এই কম্বিনেশন বদলে ফেলে মনোজ জীবন-মহাবিদ্যালয়ে সাহিত্য রচনা প্লাস্ গ্রন্থপ্রকাশনার কম্বিনেশন নিয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে উত্তীর্ণ। সার্কুলার রোডের বসুবিজ্ঞান মন্দিরের পরেই বউবাজার স্ট্রীটের বসু জ্ঞানমন্দির (ওরফে বেঙ্গল পাবলিশার্স)।

বহু পরীক্ষক মিলে এক বৃহৎ পরিবার। কেন্দ্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আসল পরিচয় তাঁর বাড়িতে। দারুণ আড্ডাপ্রিয় ছিলেন। তাঁর বাড়িতে ব'সে খাতা স্ক্রুটিনি করতে গিয়ে এ অভিজ্ঞতা আবার নতুন ক'রে লাভ হ'ল। আমাদের মাঝখানে ব'সে মাঝে মাঝে নানা গল্প আরম্ভ করতেন। খাতা দেখার কাজ থেমে যেত। সবারই সঙ্গে তাঁর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। গল্প বলতে বলতে সেন্টিমেণ্টের সীমানায় এলে তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠতে দেখেছি। তাঁর ব্যাকরণ আর ভাষার বইতে যত তত্ত্ব কথাই থাক, হৃদয়ের কথা পাওয়া যেত তাঁর মুখে এবং কাজে।

আমার লেখা তিনি পছন্দ করতেন। ১৯৩৬ সালে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) শনিবারের চিঠিতে ছাপা হচ্ছে এমন একটা লেখার প্রুফ আমি তাঁকে পড়ে শোনাই। শুনেই তিনি বললেন এটি আনন্দবাজার পত্রিকায় আগে ছাপা

হওয়া উচিত। বিষয়টা ছিল সাময়িক। তিনি তখুনি নিজে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন বর্মণ স্ট্রীটে। সেখানেই আগে ছাপা হ'ল। ১৩৪৩, ১৬ই ও ১৭ই জ্যৈষ্ঠ এই দুদিনে লেখাটি সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। রচনাটি ছিল, তখন ভাষা নিয়ে যে সাম্প্রদায়িক তর্ক আরম্ভ হয়েছিল, সেই বিষয়ের। রচনার নাম "বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান সম্প্রদায়।" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন ছিল শ্রী ও পদ্ম। এ বিষয়ে মুসলমানদের অনেকে আপত্তি তোলেন "শ্রী" হিন্দু-দেবতা, অতএব তাঁদের মনে ওতে আঘাত লাগে। (দেশ স্বাধীন হবার পর শ্রী আর দেবতা নেই, শ্রী এখন নতুন দুটো অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছেঃ একটি—মিস্টার; অন্যটি—পেশী বীর)। "শ্রী" দেবতা এই আপত্তির মধ্যে আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি। এবং যে যুক্তি দেখানো হয়েছিল তার অসারতা আমাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। আমি খুব বেদনার সঙ্গে লিখেছিলাম এ ভাবে দেখলে এর শেষ কোথায়। বাংলা অনেক অক্ষরই কোনো না কোনো দেবতার নাম। বাংলা লিখতে গেলে একে ছাড়া যাবে না। কি লিখেছিলাম তা মনে নেই, ঐ শনিবারের চিঠি বা আনন্দবাজার পত্রিকা আমার কাছে নেই। তখন সাম্প্রদায়িক উগ্রতা উঠতি মুখে। রবীন্দ্রনাথকেও সাম্প্রদায়িক লেখক রূপে আক্রমণ করা হচ্ছিল তখন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা একটি সেন্টিমেণ্ট, এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি চলে না। ও জিনিষ দূর হয় শুধু দায়ে পড়লে। যতক্ষণ পার্থিব লাভ, ততক্ষণ সাম্প্রদায়িকতার জয়। অবশ্য কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ই সাম্প্রদায়িক, একথা কখনই সত্য নয়, এবং এর মূলেও অনেক জটিল কারণ আবিষ্কার করা যায় এবং সাম্প্রদায়িকতা যদি অস্ত্র হয় তবে তা তার কারখানার বেশির ভাগই আবিষ্কৃত হবে অন্য দেশে, এবং যারা এটকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে তারাও অনেক সময় তৃতীয় পক্ষই। অতএব যুক্তি অচল। যুক্তি যে কত অচল তার একটি অতি কৌতুককর দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। এ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে আমার বন্ধু অতুলানন্দ চক্রবর্তী।

সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সে ১৯৩৪ সালে ইংরেজীতে একখানা বড় বই লেখে, বইয়ের নাম 'কালচরাল ফেলোশিপ'। এই উপলক্ষে সে ভারতের সকল হিন্দু-মুসলমান নেতা ও মনীষীর অভিনন্দন এবং বন্ধুত্ব লাভ করে এবং নিজামের একটি বড় বৃত্তি পায়। কিন্তু দেশের

অবস্থা সে বইয়ের উপর নির্ভর করল না, ক্রমেই খারাপ হ'তে লাগল। কিন্তু অতুলানন্দ দমল না। সে অনেক পরিশ্রম ক'রে ১৯৪৫ সালে 'কংকর্ড' নামক এক ইংরেজী সাপ্তাহিক বা'র করল, তার যৌবন বিলিয়ে দিল এ কাজে, এবং 'কংকর্ড'এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ঘোড়াটায় চেপে সম্ভবত ব্রাউনিং-এর সুরে সুর মিলিয়ে বলল "I gave my youth—but we ride, in fine."

এবং ঐ ১৯৪৫ সালেই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। তখন আরও বেশি খরচ ক'রে পূর্বের মতোই ভারতবর্ষের সকল মনীষী ও নেতার লেখা সংগ্রহ ক'রে কংকর্ডকে সে মাসিকপত্রে রূপান্তরিত করল বছর খানেকের মধ্যেই। তখন দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে ঘোড়াটায় চেপেছিল, সেটি স্বাধীন ভাবে বেরিয়ে গেল পিঠের বোঝা ফেলে। অবশেষে কাগজ বন্ধ ক'রে দিয়ে মিলনকামী সম্পাদক স্বয়ং লাঠি হাতে পাড়া রক্ষা করতে লাগল।

যুক্তি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার এই পরিণাম। তবে লাঠি দিয়ে হয় কিনা সেটাও সন্দেহজনক।

অতুলানন্দের এই পরিণতির কথা একদিন গান্ধীজি শুনেছিলেন এবং শুনে চুপ ক'রে ছিলেন; কোনো কথাই বলেননি।

আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা আমার লেখাটির নাম ও তারিখ পেয়েছি আমি ১৯৩৬ জুলাই সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদী থেকে। সেই সংখ্যাটি আমার আজও আছে। এতে আবদুল কাদির আমার লেখার কোনো একটি অংশ নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর থীসিস ছিল অন্য, তার জন্য প্রথমেই আমার লেখা উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেছিলেন। শেষও করেছিলেন আমাকে নিয়েই। তাঁর এই থীসিসের জন্য আমার আনন্দবাজারের ১৬ই ও ১৭ই জৈষ্ঠ্যের লেখা, ১২ই জ্যৈষ্ঠের আনন্দবাজারে চপলাকান্ত ভটাচার্যের লেখা এবং তার সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির লেখা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সহকারে তিনি বলেছিলেন ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমান থাকলেও ভারতীয় মুসলমানেরা সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতীয় থাকবেন এই আশা পোষণ করা আমাদের অন্যায়। কারণ বাইরের সংস্কৃতি আমদানি না করলে সাহিত্য পুষ্ট হবে কি ক'রে।

আবদুল কাদিরের এই আলোচনাটি বেশ সংযত এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন নেই, তিনি তাঁর বক্তব্য যুক্তির উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিতে একটি বড় ভুল ছিল। বাইরের সংস্কৃতির ছাপ আমরা আমাদের সাহিত্যে চিরদিন বাঞ্ছনীয় ব'লেই মনে করেছি, অবাঞ্ছনীয় কদাপি নয়। শুধু ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাদ দিতে বলিনি। এইটুকু মেনে নিলে আবদুল কাদিরের লেখাটি খুব মূল্যবান হ'ত।

পরীক্ষকরূপে বছরের পর বছর খাতা দেখে অনেক রকম অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। স্ক্রুটিনিতে ব'সে পরীক্ষকদের বিচার-বৈচিত্র্য দেখলাম। মার্ক দেওয়ার বৈশিষ্ট্যে স্বভাব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। একজন প্রবীণ পরীক্ষকের এক অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। তিনি পরীক্ষিত খাতায় প্রতি পৃষ্ঠার চার দিকের মার্জিনে, মনে যা আসে লিখে রাখতেন। নানা রকম মন্তব্য। পরীক্ষার্থীকে গাল দিতেন তিনি এই ভাবে, যেন সে শুনতে পাচ্ছে সব। দুএকটি মনে আছে, যথা "তোমার ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষা না দিয়ে লাঙল ধরা উচিত ছিল।" "চাষ কর গিয়ে—এ পথে কেন? পিতার কুসন্তান তুমি।" "তুমি একটি নিরেট মূর্খ, কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকলে এ রকম লিখতে না।"—ইত্যাদি। মার্জিনের কোনো শাদা জায়গা ফাঁক থাকত না। পরীক্ষা দিতে হ'লে কেমন লেখা উচিত সে বিষয়ে বিশদভাবে উপদেশ দিতেন মার্জিনে, অথচ তিনি নিশ্চিত জানতেন সে খাতা পরীক্ষার্থীর কাছে কখনো ফিরে যাবে না। নিজে এত উপদেশ অথবা গাল দিতেন ছেলেদের খাতায়, অথচ তাঁর নিজের যোগফলে প্রচুর ভুল থাকত। সকল মনোযোগ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যতের দিকে যাওয়ায় নিজের ভবিষ্যৎটা আর ভাবার সময়ই পেতেন না।

মার্ক দেওয়ার আদর্শেও বিভিন্ন পরীক্ষকদের মধ্যে কত পার্থক্য। ৮ মার্কের যে উত্তরে একজন পরীক্ষক পুরো ৮ দিচ্ছেন, সেই একই উত্তরে আর একজন পরীক্ষক ২ দিচ্ছেন। সম্পূর্ণ শুদ্ধ লিখেও শূন্য পেয়েছে কোনো উত্তরে, এমন দেখেছি। এই জাতীয় মতভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার কঠিন দায়িত্ব প্রধান পরীক্ষকের, এবং তাঁর নির্ভর স্ক্রুটিনাইজারগণ। দেখে দেখে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির উপর আর শ্রদ্ধা থাকে না। পাস

করা বা বেশি মার্ক পাওয়া প্রায় লটারির ব্যাপার। সকলের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার হওয়া মানবীয় শক্তির বাইরে। ব্যক্তিগত দোষ নয়, রীতির দোষ।

সাময়িক পত্রে ছাপা অথবা কোনো বইতে ছাপা কোনো গল্প প্রবন্ধ বা কবিতা যদি অন্য কেউ অপহরণ ক'রে নিজের নামে ছাপে, তা হ'লে সে অপরাধের আর মার্জনা থাকে না, চারদিক থেকে কোলাহল আরম্ভ হয়। পরীক্ষার খাতায় কিন্তু এর বিপরীতটাই ঘটে। এখানে সর্বজন পরিচিত লেখাও নিজের নামে চালালে ক্রেডিট পাওয়া যায় অনেক বেশি। নিজের কথা ও নিজের রচনার চেয়ে মুখস্থ রচনায় মার্ক ওঠে বেশি। অন্যের লেখা ব্যাখ্যা নিজের ব'লে চালালেও বেশি মার্ক পাওয়া যায়। পরীক্ষার নামে এই প্রহসনের সঙ্গে পরিচয় যত গভীর হয় ততই সব হাস্যকর মনে হয়। অথচ এ প্রথা হঠাৎ তুলে দেওয়া যাবে না। দশটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরে যদি হয়।

সুনীতিবাবু পরীক্ষকদের ছোটখাটো ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখতেন, কারো বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাধ্য না হ'লে অবলম্বন করতেন না, নিজে এ বিষয়ে অত্যন্ত উদার ছিলেন। এজন্য পরীক্ষক এবং স্ক্রুটিনাইজাররা তাঁকে আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

কলকাতায় বোমা পড়ার বছরে প্রধান পরীক্ষক বদল এবং দপ্তর স্থানান্তরিত হয় কৃষ্ণনগরে। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রধান পরীক্ষক হয়েছিলেন। পরে আবার সব ঘুরে আসে কলকাতায়, এবং প্রধান পরীক্ষক হন অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি ছিলেন গোঁড়া নীতিবাদী এবং প্রাচীনপন্থী। তাই তাঁর কাছে কারোই কোনো ব্যক্তিগত খাতির ছিল না। স্ক্রুটিনাইজাররা কাজ করতেন যেন উপাসনা মন্দিরে ব'সে ধ্যান করছেন। আবহাওয়া অত্যন্ত থমথমে, গুরুগম্ভীর। খাতা সবাইকে সমানভাবে ভাগ ক'রে দিতেন, কাজের সময় পরস্পর আলাপ করা সমর্থিত ছিল না। এত দিনের প্রশ্রয়প্রাপ্ত আমাদের একটু অসুবিধা বোধ হ'ত, কিন্তু প্রধান পরীক্ষকদের এতকালের ঐতিহ্য রক্ষা ক'রে তিনি বিকেলে যে জলযোগের আয়োজন করতেন তা অত্যন্ত উপাদেয় ছিল, অতএব বাড়ি ফিরে আসার সময় মন প্রসন্ন থাকত।

চতুর্থ পর্ব

তৃতীয় চিত্র

রেডিওতে সাপ্তাহিক সমালোচনার জন্য চৌরঙ্গী অঞ্চলে প্রতি সপ্তাহে তিনটি ছবি দেখতে হ'ত নিয়মিত। প্রতি মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় মেট্রোতে এবং বুধবারে নিউ এম্পায়ারে ও লাইট হাউসে, সকাল ৮টা থেকে পর পর। মেট্রোর জন্য স্থায়ী পাস ছিল, অন্য সিনেমা থেকে প্রতি সপ্তাহে পাস ডাকে আসত। মেট্রোর কার্ডের বৈশিষ্ট্য—অ্যাডমিট টু, অর্থাৎ ব্যবস্থা ছিল দুজনের জন্য। খুবই বিবেচনাসঙ্গত ব্যবস্থা। একজন সঙ্গী না হ'লে দেখতে ভাল লাগে না। আমার সঙ্গে অধিকাংশ সময় যেতেন 'চিত্রগুপ্ত' (মনোমোহন ঘোষ)। অনাদিকুমার দস্তিদারও যেতেন মাঝে মাঝে। নাটক ও বাংলা সিনেমা প্রতি সপ্তাহে নতুন হয় না, একটা আরম্ভ হ'লে ছমাস বা এক বছর। কাজেই ইংরেজী ছবি অনেক দেখতে হয়েছে, প্রায় পাঁচ বছর ধ'রে। পরে যুদ্ধের জন্য এ আলোচনা সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকে, এবং তারপর যখন আরম্ভ হয়, মাসে একবার মাত্র, এবং সেও সিনেমা ও থিয়েটার পৃথক ক'রে দেওয়া হয় এবং ইংরেজী ও বাংলা সিনেমাও পৃথক হয়। এই নব পর্যায়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী ও পরে আমি যোগ দিই। তবে এবারে খুবই অনিয়মিত। সুনীতিবাবু ও প্রমথনাথ দুজনেই এ বিষয়ে অধিকারী! সুনীতিবাবু সর্বজাতীয় আর্টের ভক্ত, থিয়েটারেরও। রঙ্গমঞ্চ প্রিয় অনেককাল থেকেই, শিশিরকুমার ভাদুড়ির বন্ধু। প্রমথনাথ বিশী স্বয়ং নাট্যকার এবং ভাল অভিনেতা। থিয়েটারে গেলে নাম করতে পারতেন।

এই সময়ের কিছু আগে, অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে ক্যামেরার কাজে একটু বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ১৯৩৬ সালেই এর আরম্ভ, আধুনিক একটি ক্যামেরা কেনার পর থেকে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী আমার কয়েকটি ছবি "বাংলার শ্রী" এই নামে নূতন পত্রিকায় ছাপেন। সেগুলো অবশ্য তার বছর দশেক আগে তোলা। ছবিগুলি ছিল ধান চাষ সম্পর্কে। সেই সময় শম্ভু সাহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ছবি এই কাগজে ছাপা হয়।

ফোটোগ্রাফে চিত্র-ধর্মিতা ফোটাতে পারলে এদেশে তার কিছু মূল্য হয়, এটি আমাদের দেশে দুর্লভ হলেও বহু পূর্বে মাসিক পত্রে এর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি। কিন্তু ফোটোগ্রাফির আধুনিক পর্যায়ে নূতন পত্রিকায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী আমাদের ছবি ছেপে এক নতুন যুগের সূচনা করলেন। তিনি পরের বছর অমল হোম সম্পাদিত মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বার্ষিক সংখ্যা সম্পাদনা কালে আমার কয়েকখানা ছবি আর্ট প্লেটে ছাপেন। তারপর থেকে কয়েক বছর স্বাস্থ্য সংখ্যা ও বার্ষিক সংখ্যায় অমল হোম আমার অনেক ছবি ছাপেন। তাঁর পরিকল্পনায় পরে ছাপার বৈচিত্র্য এবং ছবির মর্যাদা এবং আমার উৎসাহ আরও বেড়েছিল। এই কাগজেই শম্ভু সাহার ছবি দেখে আমি তাঁর ভক্ত হয়েছিলাম। অধ্যাপক হিরণকুমার সান্যালেরও কয়েকখানি অতি সুন্দর ছবি দেখেছি মিউনিসিপ্যাল গেজেটে।

ছবি তোলা এ সময়ে একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। সঙ্গীও পেয়েছিলাম। নিউ থিয়েটার্সের প্রচার সচিব হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আমি প্রতি ছুটিতে কলকাতার পথে পথে, নদীর ধারে ধারে, চিড়িয়াখানায়, শিবপুরের বাগানে, কলকাতার বাইরে মাঠে মাঠে, ক্যামেরা নিয়ে ঘুরেছি। ছবির সংখ্যা হয়েছে কয়েক হাজার। ইতিমধ্যে নিখিলচন্দ্র দাসকে ক্যামেরায় উৎসাহী ক'রে তুলেছিলাম। একবার হাসিয়ে দেওয়াতে তিনি তাঁর দামী ক্যামেরা ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। তখন বলেছিলাম মাথা লক্ষ্য ক'রে মারার পক্ষে বক্স ক্যামেরা ভাল। পর পর অনেকগুলো ছুঁড়ে মারলেও অল্প টাকার উপর দিয়ে যায়। এ দেশে মাথার কি বা দাম।

মৌচাকের সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারের অনুরোধে এই সময় (১৯৩৭) ছোটদের উপযুক্ত একটি কি দুটি প্রবন্ধ লিখি ফোটো তোলা বিষয়ে। একটু নতুন ধরনে লিখেছিলাম। এই সুধীর বাবুকে একদিন আমারই একটি ত্রুটির জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিল। একদিন বাড়ি থেকে বেরোতেই দেখি নিখিলচন্দ্র দাসের গাড়ি এসে থামল আমার পথ রোধ ক'রে। পাশে সুধীরবাবু উপবিষ্ট। নিখিলবাবুর মুখে কিছু দুশ্চিন্তার ছায়া। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম অর্থের সন্ধানে বেরিয়েছেন। শুনে আমি শুধু বলেছিলাম চলন্তিকার প্রকাশক পাশে থাকতে অর্থচিন্তা কেন—সব অর্থ

চলন্তিকাতেই পাবেন।—এর ফলে সুধীর বাবুর উপর হঠাৎ আক্রমণ আরম্ভ হ'ল, আমি দ্রুত স'রে গেলাম সেখান থেকে।

বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত 'জনসেবা' নামক সাপ্তাহিক কাগজের পক্ষ থেকে অধ্যাপক কবি বিভূতিভূষণ চৌধুরী আমার কাছ থেকে কয়েকটি ব্যঙ্গ রচনা নিয়ে ছাপেন ১৯৪৩ সালে। তখন পঞ্চাঙ্ক যুদ্ধের তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য চলছে। 'ট্রামের সেই লোকটি', 'বাঘের গলায় হাড়' প্রভৃতি গল্প জনসেবাতে প্রথম ছাপা হয়।

প্রবাসীতে ১৯৩৪-৩৫ থেকে প্রথম লেখা আরম্ভ করি এবং প্রায় নিয়মিত লিখি। পুলিনবিহারী সেন এ সময়ে সহকারী সম্পাদক। ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী প্রকাশিত হ'লে তিনি আমাকে এই বই সম্পর্কে একটি আলোচনা লিখতে বলেন। এই আলোচনাটি প্রবাসী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮) তে ছাপা হয়। এ ভিন্ন আর দুটি মাত্র প্রবন্ধ প্রবাসীতে লিখেছি বাকী সবই ব্যঙ্গ গল্প। পুলিনবিহারী সেন সুজনতায় অপরাজেয়। যাদের সঙ্গ আমার প্রিয়, ইনি তাঁদের অন্যতম। পত্র লেখক হিসাবে অক্লান্তকর্মা, তাঁর কয়েক শত চিঠি আমি জমা ক'রে রেখেছি। এঁর সুরুচি ও ব্যক্তিত্ব বিশ্বভারতী পত্রিকায় পরিস্ফুট।

লেখকরূপে নানা সম্পর্কের কথা স্মরণ করছি এই উপলক্ষে।

যুগান্তরের কোন্ পূজো সংখ্যা থেকে প্রতি বৎসর লিখছি মনে নেই, ১৯৪০ থেকে সম্ভবত। লেখা আদায়ের ভার থাকত ভূষণচন্দ্র দাসের উপর। ভূষণচন্দ্র যুগান্তরের সাব-এডিটর, (বর্তমানে সাময়িকী বিভাগের সহকারী সম্পাদক।) এ পর্যন্ত যুগান্তরের বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তার পরে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে এলেন আর্ট-প্রেমিক সুকমলকান্তি ঘোষ, পি-সি-এল-এর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে, কিছু ফোটোগ্রাফ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এর কিছুদিনের মধ্যেই প্রুফ দেখা উপলক্ষে যুগান্তরে গিয়ে বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত ও নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যুগান্তরের দিকে ক্রমে এগিয়ে আসছি এই ভাবে।

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে পরিচয় কাগজে লিখছি। পরিচয়ের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যম বিশু মুখোপাধ্যায়। হিরণকুমার সান্যাল, গোপাল

হালদার এঁরা পরিচয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশু মুখোপাধ্যায়ই আমাকে প্রথমে পরিচয়ে লিখতে অনুরোধ করেন। এঁর ব্যবহার অতি মার্জিত এবং মধুর। বহুবার এঁর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে কিন্তু চরিত্র মাধুর্যের কোনো সীমা খুঁজে পাইনি কখনো। চাঁপা রঙের জামা চাদর প'রে থাকতেন। এখন রং রক্ষা করছে শুধু চাদর, সেটি গৈরিক রঙের আর এক সংস্করণ। সন্ন্যাসের ভদ্র রূপ। এঁর সৌজন্য, সপ্তাহে-মাত্র সীমাবদ্ধ নয়। এমন নিরহঙ্কার সহৃদয় ব্যক্তি আধুনিক কালে খুব বেশি দেখা যায় না।

বসুমতীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণ আত্মিক। ১৯২৬ সালে প্রথম লিখেছি বসুমতীতে, এক বন্ধু সেটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। তারপর কবে থেকে যে আবার লিখতে শুরু করেছি তা মনে পড়ে না, কিন্তু কারো সঙ্গেই সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। পরিচয় না থাকলেও দৈনিক ও মাসিক বসুমতী পেয়ে যাচ্ছি নিয়মিত—সে যে কবে থেকে তাও আর মনে আনতে পারি না। প্রাণতোষ ঘটককে চোখে দেখেছি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। তার আগে কিছু দিনের জন্য বসুমতীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ রক্ষা করেছে প্রসিদ্ধ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। সে তখন মাসিক বসুমতীর সম্পাদনা বিভাগে কাজ করত।

১৯৪১ সালে ধর্মতলার থোবর্ন লেনের লিপিকা প্রেস থেকে 'রূপ ও রীতি' নামক একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হ'তে থাকে। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। এ কাগজের একজন প্রধান উদ্যোক্তা বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। ওখানে ছোটখাটো একটি আড্ডা বসত। ছোট খাটো মানে ঘরটা অত্যন্ত ছোট, তাই। শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি-সি), শচীন্দ্রলাল ঘোষ, আমি এবং আরও অনেকে ওখানে নিয়মিত যেতাম। ঐ একটুখানি জায়গাতেই শচীন্দ্রলাল ঘোষ মাঝে মাঝে আনন্দে গান ধরতেন।

এই 'রূপ ও রীতি' কাগজে আমার কয়েকটি লেখা ছাপা হয়। তার মধ্যে একটি ঐ ১৯৪১ সালেরই বেতার বক্তৃতা। এই লেখাটি সম্পর্কে দু-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিষয়টি ছিল ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ সমস্যা নিয়ে। যুদ্ধের সময় এমন অনেক নতুন ইংরেজী শব্দ (যুদ্ধবিষয়ের) প্রতিদিন বাংলা অনুবাদের সময় দেখা দিচ্ছে যার প্রতিশব্দ নেই, অতএব,

তা ইংরেজীতেই রাখা ভাল এই ছিল আমার কথা। অর্থাৎ পরিচিত বাংলা শব্দে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও বহু যুদ্ধাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া যায় না, কেন না আমাদের দেশে এমন যুদ্ধ কখনো হয়নি। বলেছিলাম, আমাদের দেশের প্রথম যুদ্ধ মহাভারতের যুদ্ধ, এবং শেষ যুদ্ধ পলাশীর। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধ দার্শনিক যদ্ধ এবং পলাশীর যুদ্ধ এমন যা এই ১৯৪১ সালে ঘটলে লোকে টিকিট কিনে দেখত।

আমার এই বক্তৃতার পরবর্তী বক্তৃতা ছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁরটিও ঐ একই সংখ্যা রূপ ও রীতিতে ছাপা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,—

"আধুনিক বাঙলার কতগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচনার উদ্দেশ্যে এই যে বক্তৃতামালা, এর প্রথম বক্তৃতায় পরিমল গোস্বামী বিদেশী শব্দের অনুবাদ নিয়ে বাঙালী লেখক আর সাধারণ বাঙালীকে যে ঝঞ্ঝাটে…পড়তে হয় তার সুন্দর আলোচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল এই যে মুখের ভাষায় আমরা যে [বিদেশী] শব্দ ব্যবহার করি সেইটেই ভাষার সত্যকার শব্দ, লেখার ভাষায় ব্যবহারের জন্য পণ্ডিতেরা নানা রকম শব্দ [পরিভাষা] তৈরী ক'রে দেন বটে কিন্তু সে সব শব্দ ছাপার অক্ষরেই বদ্ধ থাকে। সে সব শব্দ যতক্ষণ না লোকে সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহার করে ততক্ষণ সে ধরনের শব্দের কোনো বিশেষ সার্থকতা নেই। তিনি একটি বিষয়ে জোর দিয়েই বলেছেন—আধুনিক জগতে মানুষের জীবনযাত্রা যে পথে চলেছে, যে ভাবে নানা নোতুন নোতুন জিনিস বিজ্ঞান আবিষ্কার ক'রে মানুষের সেবায় এনে দিচ্ছে, তাতে নিত্য নোতুন নোতুন শব্দ এই সব জিনিসের নাম হিসেবে ভাষায় আসছে।··

"ইউরোপ অ্যামেরিকা এই সব জিনিস বা'র করছে, এদের নাম ইউরোপ অ্যামেরিকা থেকেই আমাদের দেশে আসছে। অনেক সময় আমরা বাঙলা ভাষায় এই সব শব্দের একটা অনুবাদ ক'রে নেবার চেষ্টা করি; কিন্তু সে অনুবাদ বহুস্থলে আবার ঠিক হয় না। বস্তুর নাম হ'লে বিদেশী নামটাই ব্যবহার করতে কারো বাধে না, ভাষায় সেই শব্দটিই প্রচলিত হয়ে দাঁড়ায়। তিনি কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন এয়ারপ্লেন, রেডিও, মোটোরকার, ক্রুজার, ট্যাঙ্ক, মেশীন গান, ডেপথ চার্জ, টর্পীডো···"

আমার বক্তব্যের এই সারাংশ শেষে সুনীতিবাবু যে কথাটি বললেন তার মর্ম এই কথাগুলিতে পাওয়া যাবে—

"একবারে নোতুন দেখা দিয়েছে এমন কোনো জিনিসের নাম দিতে আমাদের তেমন বাধে না, বিশেষতঃ নামটা যদি সংক্ষিপ্ত আর ছোটো হয়; কিন্তু অনেক সময় একটা স্বদেশী মনোভাব এসে কোনও ভাব, গুণ, শ্রেণী, ক্রিয়া ইত্যাদির বোধক বিদেশী শব্দকে অনুবাদ ক'রে নেবার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় কথাবার্তার ভাষায় আমরা ব্যবহার না করলেও (আমরা অল্পবিস্তর সুবিধাবাদী

কিনা বিশেষতঃ ভাষার ব্যাপারে) সে রকম অনুবাদ লেখার ভাষায় চলে আর কচিৎ সুপরিচিত হয়েও দাঁড়ায়—সাহিত্যে ব্যবহারের ফলে মুখের ভাষাতেও ক্রমে এগুলি চালু হয়ে যায়"...

সুনীতিবাবুর মূল বক্তব্য এইটি। আমার বক্তব্যে যে টুকু ফাঁক ছিল সুনীতিবাবু তা পূরণ করলেন একটুখানি অ্যামেণ্ড ক'রে।

১৯৪০-এর কোনো একদিন রেডিওতে গিয়ে নৃপেন্দ্র মজুমদারের কাছে শুনি যুদ্ধের প্রচার উদ্দেশ্যে আধাসরকারী এক প্রতিষ্ঠান গড়া হচ্ছে, নাম পাবলিক রিলেশন সাব-কমিটি (পরে 'সাব্' উঠে গিয়ে শুধু কমিটি), তাতে অনুবাদের কাজের জন্য তিনি আমার নাম সুপারিশ করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানে যুদ্ধান্ত কাল পর্যন্ত কাজ করেছি—এক বেলার কাজ। এ ভিন্ন বহুবিধ টুকরো কাজ এক সঙ্গে এবং মাথার উপর বোমার আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪১, ২২শে তারিখে ষ্টেশন ডাইরেক্টর ভিক্টর পরাণজ্যোতি এক নিমন্ত্রণ পাঠালেন। গিয়ে দেখি লেখক বন্ধু অনেকেই এসেছেন। পরাণজ্যোতির বক্তব্য, রেডিওতে একখানা উপন্যাস প্রচার করা হবে, তার এক একটি অধ্যায় এক এক জনে লিখবেন। প্রস্তাবটি ভাল। সবাই রাজি। কিন্তু বুদ্ধিতে বয়সে যিনি আমাদের অতিক্রম ক'রে গেছেন তিনি এ উপন্যাসের সবচেয়ে সহজ অধ্যায়টি লেখার ভার নিলেন। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় তিনি আর কাউকে দিতে রাজি নন। ইনি হচ্ছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়—আমাদের প্রিয়তম হেমেনদা। এ উপন্যাস যথাসময়ে প্রচার করা হয়েছিল এবং পনেরো জনের লেখা ব'লে এর নাম হয়েছিল পঞ্চদশী।

পঞ্চদশীর লেখকের নাম, অধ্যায়-পরম্পরা হিসেবে এই—(১) হেমেন্দ্র-কুমার রায়, (২) সরোজকুমার রায়চৌধুরী, (৩) কেশবচন্দ্র গুপ্ত, (৪) উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (৫) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, (৬) প্রবোধ-কুমার সান্যাল, (৭) পরিমল গোস্বামী, (৮) প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, (৯) নরেন্দ্র দেব, (১০) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, (১১) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), (১২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৩) সজনীকান্ত দাস, (১৪) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৫) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। (অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এখানেও দেখছি তেমনি আমি মধ্যপন্থী হয়ে ব'সে আছি)। আমার অধ্যায়টি

রেডিওতে পড়েছিলাম ২৩-৫-৪১ তারিখে। ঐ উপন্যাস কোনো এক প্রকাশক ছেপেছিলেন ঐ বছরেই।

এ সময়ে চারদিক ঢাকা একটুখানি নিয়ন্ত্রিত আলোর সাহায্যে পড়া-শোনা। ব্ল্যাকআউটের কৃষ্ণপক্ষের রাতগুলোয় তবু তো খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে হয় (যদিও ভুল ক'রে) কিন্তু চাঁদ দেখলে আতঙ্ক। এতকালের আদরের চাঁদ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিল ভেবে ভীষণ দুঃখ। মনে হয়েছিল, চাঁদের আলোয় শত্রুবিমান তার আক্রমণের লক্ষ্য সহজে চিনতে পারবে। কিন্তু তখন একটি খবরে জানা গেল—বিমানবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে কোনো শহরের লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলে ফিরে আসার পর বাহিনীর নেতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কি ক'রে শহর চিনতে পারলে?" তিনি তার জবাবে বলেছিলেন, "আকাশ থেকে দেখা গেল মস্ত বড় একটা এলাকা অস্বাভাবিক রকমের অন্ধকার, তখনই বুঝলাম এইটি শহর।" এটি পড়ার পরে আতঙ্কিত হওয়ার জন্য আর শুক্লপক্ষের অপেক্ষা করিনি।

সাইরেনের কি বীভৎস পৈশাচিক আওয়াজ। ঐ আওয়াজের সঙ্গে বোমাপড়ার আওয়াজ মিলে শেষে এমন এক 'কনডিশনড রিফ্লেক্স'-এর উদ্ভব হল যে সাইরেন বাজলেই দম বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করতাম, কতক্ষণে মাথার উপর বোমা পড়বে। তরপর হঠাৎ 'অল ক্লিয়ার'—একটানা বাঁশি—আরামের নিশ্বাস!

বোমা পড়া আরম্ভ হ'লে শহরবাসীর কি বৈরাগ্য। দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে পালাচ্ছে সব। জমি বাড়ি ঘর আসবাবপত্র যে-কোন দামে ছেড়ে পালাচ্ছে।

২০ শে ডিসেম্বর (১৯৪২) প্রথম বোমা পড়ল কলকাতায়। ২১ তারিখে আর একবার। ২২ তারিখে তৃতীয় আক্রমণ, ২৪ তারিখে চতুর্থ আক্রমণ। বৈরাগ্য আসবে না কেন মনে? বিধ্বস্ত রেঙ্গুন শহরের ছবি দেখছি, মুণ্ড-শিকারী জাপানী (এই রকমই অন্তত প্রচার করা হ'ত) অমানুষিক অত্যাচার করছে সবার উপরে (অন্য দেশের সৈন্যরা তো করুণার অবতার!)—আর ভাবছি মানুষের জীবনের কি দাম? বহুকাল পরে কলকাতার সকল বয়সের, সকল সম্প্রদায় ও ধর্মের লোকের মনে ঐ একই জিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য ভিন্ন প্রাণ বাঁচে কিসে? একটি ঘটির মায়ায়, একটি

বাটির মায়ায়, আবদ্ধ থেকে প্রাণ হারাবে? অতএব ঘটিবাটি বিক্রি ক'রে দিয়ে বেরিয়ে এসো পথে—খোলা পথের গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চল (দিশাহারা হয়ে), শুধু ছুটে চল, ঘুস দিয়ে রেলের টিকিট কেন, ঘুস দিয়ে গাড়িতে ওঠ, ঘুস দিয়ে প্রাণটা বাঁচাও, ঘুস দিতে দিতে ছুটে চল।

বৈরাগ্যই বটে, কিন্তু এটি ছিল নির্বোধের বৈরাগ্য, তাই এদের ত্যাগে যে বিরাট একটা ওজন কমে গেল, সে ওজন বহন করার জন্য সে দিন ডেস্পারেট ভোগীর দল এদের পায়ে পায়ে লেগে ছিল। তারা শস্তায় ধনী হয়ে গেল।

কলকাতার পথে পথে জঞ্জাল জমে উঠেছে। কটা দিন সবাই উদাসীন। কারো কোনো দিকে খেয়াল নেই। ক্রমে পথে পথে শত শত মৃত ও মুমূর্ষু ডিঙিয়ে পথ চলছি, মন বিবাগী, দিগ্‌ভ্রান্ত। জীবনের কি দাম। তরুণ ছেলেদের মুখেও হাসি মিলিয়ে গেছে।

এমনি এক দিনে ১২ নং ওয়াটারলু স্ট্রীটে (১৯৪২) বিদ্রোহী সাধক-শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায় (V.C.) এক প্রকাশনীর উদ্বোধন করলেন। এটিতে কোনো ব্যবসাদারী চেহারা ছিল না, একটি বৈঠকখানা মাত্র, নাম সন্থাগার। সন্থ্ মানে সাধুই সম্ভবত। ডক্টর কালিদাস নাগ উপস্থিত থেকে সবার কল্যাণ কামনা করলেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। কিন্তু প্রকৃত সন্থ বা সন্ত বা সাধু মাত্র দুজন, ভোলা চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। বাদবাকী সবাই গৃহী-সন্ন্যাসী।

একটি মাত্র ঘর, কিন্তু ভিড় জমল মন্দ নয়। ভোলা চট্টোপাধ্যায়, গোপাল-চন্দ্র ভট্টাচার্য, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ব্রতিশঙ্কর রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী, ত্রিদিবনাথ রায়, কিরণকুমার রায়, বিভাস রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, বিমলা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী, করালীকান্ত বিশ্বাস ও আরও অনেকে।

এখানে পর পর অনেকগুলি বই ছাপা হয়। সবই এক রকম চেহারার। নাম শতাব্দী গ্রন্থমালা। অধ্যাপক মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের ঈসকাইলাস, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভারতের ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথ ঘোষের লোক বাহুল্যের আতঙ্ক, অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরীর নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা, বিনয় চৌধুরীর

ঘর ও সংসার (ছোট গল্পের বই) সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর নব্য-বিজ্ঞান-কথা, নবেন্দু বসুর রসসাহিত্য ও আমার দুষ্মন্তের বিচার (কৌতুকনাট্য), মার্চ ১৯৪৩।

পরমাণু রহস্য এবং বিশ্বসৃষ্টির মূলকথা বোঝাবার উদ্দেশ্যেই নব্য-বিজ্ঞান-কথা বইখানি লেখা। কিন্তু এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গল্প বা রূপকথার ভঙ্গিতে লেখা। তিনটি অধ্যায়—"একটি অসম্ভব রূপকথা" "একটি আজগবি নাটক" ও "বুদ্‌বুদ বিদারণ কাহিনী"! আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথাগুলি এমন সুললিত গল্পের বা নাটকের ভঙ্গিতে অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় লেখা হয় নি। নমুনা—

"গল্প শুরু হল: তোমরা, অর্থা' যারা হিন্দুশাস্ত্রের খবর রাখ, নিশ্চয়ই জান যে পুরাকালে বিশ্বামিত্র একবার বিশ্ব সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়েছে, সে কাজ তাঁর শেষ হয় নি। বিশ্বসৃষ্টির কাজে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও (মানে যদি তিনি থাকেন) বোধ হয় আজও শেষ করে উঠতে পারেন নি, হয় তো কোনো দিনই এর শেষ হবে না। আমার গল্পের বিষয় হচ্ছে কলির বিশ্বামিত্রের। তোমাদের বিশ্বামিত্র সৃষ্টি শুরু করেন রাগে, আমার রূপকথার নায়ক অনুরাগে, তবে অনুরাগটা অবশ্য ব্যক্তিক নয়, নিছক বৈজ্ঞানিক।"...

এই ভাবে কাহিনী শুরু। নায়ক রাদারফোর্ড। এ ধরনের বই বাংলা ভাষায় এই প্রথম, এবং সম্ভবত এই শেষ। এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হয় নি কেন জানি না।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সন্থাগারের একটি মাত্র ঘরে এত ভিড় দেখে "লোক বাহুল্যের আতঙ্ক" লেখেনি। তারও এ বই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লেখা পপুলেশন বিষয়ক। তার বক্তব্য: লোক বাহুল্যের আতঙ্ক অমূলক। বর্তমান অর্থনৈতিক কারণে প্রজনন হার আপনি কমে আসছে, নতুন ক'রে সে চেষ্টা করা ভুল। কারণ তাতে সমাজের যে স্তরের সন্তান হওয়া বাঞ্ছনীয় তাদেরই সন্তান সংখ্যা কমবে, কিন্তু যাদের কমা উচিত তাদের কমবে না। ইউরোপের এই অভিজ্ঞতার কথা সে ব্যাখ্যা করেছে এ বইতে।

খাঁটি ছোট গল্প লিখিয়ে বিনয় চৌধুরী একখানি মাত্র বইতেই অন্তরালে সরে গেল কেন বোঝা যায় না। তার লেখায় কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। (আজ ২৯-৬-৬১ তারিখে স্মৃতিচিত্রণের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখতে বিনয় চৌধুরীর 'বেত্রবতী মরা নদী' নামক নতুন উপন্যাসখানির নাম এই সঙ্গে যোগ করছি।)

শতাব্দী গ্রন্থমালার বইগুলিতে একটি সাধারণ ভূমিকা থাকত, ভূমিকায় স্বাক্ষরকারী তিনজন—ব্রতিশঙ্কর রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী ও বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। ব্রতিশঙ্কর বিজ্ঞান কলেজে গণিতের অধ্যাপক, সহৃদয়তা ভিন্ন আর সবই তাঁর অঙ্কের হিসেবে মাপা। সব বিষয়ে precise, সম্ভবত জার্মানির প্রভাব।

ওয়াটারলু স্ট্রীটের দিনগুলিই কলকাতার চরম দুর্দশাগ্রস্ত দিন। তবু বাইরে যতটুকু বৈরাগ্য মনে জাগত, এখানে অনেক বন্ধু একত্র জুটে কিছুক্ষণ কাটালেই আবার মনের অবস্থা স্বাভাবিক হ'ত। এখান থেকে দল ধ'রে বিকেলের দিকে খাদ্য অভিযানে বেরোতাম। খাদ্যবস্তু বড়ই দুর্লভ। খুঁজে খুঁজে কাছাকাছি একটা আড্ডা আবিষ্কার করেছিলাম, দোকানটি একটু অন্তরালে, প্রচুর ভিড়, কিন্তু তবু তো কিছু পাওয়া যেত। পথে পথে তখন অনাহার-মৃত্যু আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্যামেরা নিয়ে বেরোলে মূল্যবান ছবি হ'তে পারত এই সব মুমূর্ষুর। কিন্তু মন অসাড়। কোনো দিন একটি ছবিও তুলতে পারি নি।

কিছু দিনের মধ্যেই দৃশ্য পরিবর্তিত হ'ল। তার মানে ওয়াটারলুর যুদ্ধে আমরা সবাই হেরে গেলাম। ওয়াটারলু স্ট্রীট থেকে বিনয়কৃষ্ণ দত্তের নেতৃত্বে চলে এলাম ১১৯ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে, জেনারাল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স-এর প্রতিষ্ঠানে। মালিক সুরেশচন্দ্র দাস, বিনয়কৃষ্ণের বন্ধু। তাঁরা এবারে সাহিত্য প্রচারে মন দেবেন, এবং সে ভার পড়ল আমার উপর। আর এই সঙ্গে 'বাংলার শিক্ষক' নামক মাসিকের কার্যত সম্পাদনা (নামে নয়)।

১১৯ নম্বরে অল্পদিনের মধ্যেই জনসংখ্যা এমন বেড়ে গেল যে স্থান-সঙ্কুলান হওয়া দুঃসাধ্য বোধ হ'ল। বিকেল দুটো তিনটে থেকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত বন্ধুরা এসে জুটতেন, যুদ্ধের শ্বাসরোধকারী মুক্ত আবহাওয়া থেকে পালিয়ে এসে এখানকার বদ্ধঘরের হাওয়ায় কিছুকাল বাস করতে। সমধর্মী অনেকে একত্র এসে বসতে পারলে দুটো কথা ব'লেও শান্তি। মোহিতলাল মজুমদার আসতেন প্রায় নিয়মিত। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দ্বারভাঙা ছেড়ে কলকাতার দিকে এলে এখানে অবশ্য আসতেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে এসেছেন মাঝে মাঝে। নিয়মিতদের মধ্যে সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি-সি), গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, করালীকান্ত বিশ্বাস, কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার, ব্রতিশঙ্কর রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী,

বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, অশোক মজুমদার ইত্যাদি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখানকার পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ হ'ল, তাঁর বই অনেকগুলো ছাপা হয়েছিল এখানে। খুব গম্ভীর এবং মৃদুভাষী, এবং কিছু ভাবপ্রবণও, কিন্তু তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে যে স্নিগ্ধ কৌতুক হাস্যের স্রোত বয়ে যায়, তা তাঁর মধ্যে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ বর্ণচোরা। করালীকান্ত বিশ্বাস সাহিত্য সমালোচনায় খ্যাত, দীর্ঘদেহ, এবং এমন, যে আকাশে চোখ তুলে আলাপ করতে হয়। দৈর্ঘ্যে মনীশ ঘটকের সগোত্র।

এখানকার বৈঠক স্থায়ীভাবেই জমে ওঠবার কথা, কিন্তু কাপড়ের মতোই বাজারে কাগজের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং এক আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করলাম এই যে, যুদ্ধের দরুন অন্নবস্ত্রের যত দুর্ভিক্ষ ঘটতে লাগল, সাধারণ লোকের বই পড়ার ঝোঁক তত গেল বেড়ে। শেষে হাতে তৈরি অতি নিকৃষ্ট কাগজে বই ছাপা ভিন্ন গতি রইল না। অবশ্য যাঁরা ব্ল্যাক মার্কেটে ঢোকায় রাজি ছিলেন না তাঁদের দুর্দশা হ'ল বেশি। এমন কি আমার 'ব্ল্যাক মার্কেট' নামক গল্পের বইখানাও হাতে তৈরি কাগজে ছাপতে হ'ল। এই হাতে তৈরি কাগজের একটি আকর্ষণ আছে, পাঠকের চেয়েও পোকার। কিছু দিনের মধ্যেই সব বইয়ের কাটতি হয়ে গেল এই ভাবে। সরোজকুমারের 'ক্ষুধা' দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হাজার হাজার পোকার গ্রেট হাংগার পরিতৃপ্ত করল, এবং আরও অনেকের অনেক বই।

এইখানে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা দশজনের বারোটি গল্পের একটি সঙ্কলন ছাপা হয়েছিল। বইখানি সম্পাদনা করেছিলাম আমি। লেখকদের নাম—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নবেন্দু ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শচীন সেনগুপ্ত (নাটিকা), সরোজ রায়চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী।

বইয়ের নাম দিয়েছিলাম "মহামন্বন্তর", ভূমিকা লিখেছিলেন গোপাল হালদার। খুবই কাটতি হয়েছিল বইখানার।

যুদ্ধের অফিসের কাজ, এখানকার কাজ, উপরন্তু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর এক ঘাটে নিয়ে পৌঁছে দিলেন আমাকে। একই সঙ্গে সাত ঘাটের জল খেলাম। অহীন্দ্র চৌধুরী তখন রঙমহলের নিয়মিত অভিনেতা। তাঁর ইচ্ছা,

মঞ্চ সংক্রান্ত একখানা কাগজ বা'র করা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মতে আমিই এবিষয়ে নির্ভরযোগ্য মুক্ত পুরুষ। ছিলাম রসায়ন মতে ট্রায়াড, এবারে হলাম টেট্রাড। একেবারে কার্বন-ধর্মী। জ্বলছি শুধু, তবে আলো দিচ্ছি কিনা সন্দেহ।

'রঙমহল সংবাদ' নামক পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হল। (প্রথম সংখ্যা ১লা অগস্ট, ১৯৪৩)। তখন ঘোর যুদ্ধের কাল. দুর্ভিক্ষের কাল, (ভাত কাপড় এবং কাগজের), নতুন কাগজ প্রকাশে অনেক হাঙ্গামা, তাই ওটি হ'ল শুধু থিয়েটারের দর্শকদের কাছে টিকিটের সঙ্গে একখানা ক'রে বিনামূল্যে বিতরণ উদ্দেশ্যে। এ কাগজে অবশ্য রঙমহলের নাটকগুলিরই প্রচার ছিল মুখ্য, তার সঙ্গে দেশ বিদেশের মঞ্চ সংবাদ থাকত, মাঝে মাঝে ছোট গল্পও। প্রাচীনকালের নাটক বিষয়ে অহীন্দ্রবাবু লিখতেন। আমি সন্ধ্যায় যেতাম সেখানে, অহীন্দ্রবাবুর সাজঘরে জমত আড্ডা। অনেকেই আসতেন। পুরনো অভিনেতা কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্র মিত্র প্রভৃতিকে দেখেছি এখানে। প্রমথনাথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকখানি 'সানিভিলা' নামে এখানে খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এই উপলক্ষে তিনি প্রতিদিন আসতেন এখানে। অন্যতম উদ্দেশ্য প্রতিদিনের প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করা। থিয়েটার সম্ভবত সে প্রতিশ্রুতি বেশিদিন পালন করেনি।

মন্মথমোহন বসু, হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত প্রায় আসতেন। একদিন একটি পরিচিত কণ্ঠস্বরে কিছু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। বাল্যকাল থেকে রেকর্ডের মধ্যে দিয়ে কুসুমকুমারীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচয়। পরে নৃপেন বোসের অংশীদাররূপে মঞ্চে নাচ গান দেখা ছিল; বহুকাল পরে সেই কণ্ঠ কানের পাশে! চেয়ে দেখি এক বৃদ্ধা পাশে দাঁড়িয়ে, বিধবা, থানপরা, লোলচর্মা। পরে শুনলাম তিনিই সেই কুসুমকুমারী। কণ্ঠস্বরের পাখীটি এখনও ঠিক আছে, শুধু খাঁচাটি একেবারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। আরও শুনলাম এঁর এখন চ্যারিটির উপর নির্ভর। রঙমহলে নবরূপে প্রযোজিত রিজিয়া নাটক সম্পর্কে রঙমহল সংবাদে কুসুমকুমারীর একখানা চিঠি ছাপা হয়েছিল।

অহীন্দ্রবাবুর পরিবেশটি ভালই লেগেছিল, তাঁর থিয়েটার বিষয়ে আইডীয়া ছিল, পড়াশোনাও করতেন। থিয়েটারে ভূমিকা তৈরি করিয়ে দেওয়ার কাজে সন্তোষ সিংহ ছিলনে পাকা ওস্তাদ। তিনি আন্তরিকভাবে

খাটতেন। সন্তোষবাবু সবরকম ভূমিকাতেই সন্তোষজনক অভিনয় করতে পারতেন।

রঙমহল সংবাদ ন' মাস পরে বন্ধ ক'রে দিতে হ'ল। যাঁর টাকা তিনি অহীন্দ্রবাবুর এই কাজটি ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁর চরিত্র গল্পের উপাদান হতে পারে। অহীন্দ্রবাবুর একবার অসুখ করে। কিন্তু মালিক নিজে ডাক্তার নিয়ে গেলেন, নিজে ফী দিলেন, এমন কি ওষুধও অহীন্দ্রবাবুকে কিনতে দিলেন না, জোর ক'রে নিজে কিনে দিলেন। এ সবই আমি জানি। কিন্তু বিস্মিত হলাম যখন তিনি আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন "হাড়কেপ্পন মশাই, ওষুধের দাম পর্যন্ত আমার ঘাড় ভেঙে চালাচ্ছেন।" ইত্যাদি।

এ চরিত্র তুলনাহীন। খুবই কৌতুক বোধ করেছিলাম। তারপর দীর্ঘ ন' মাস পরে হঠাৎ একদিন এ দৃশ্যের উপরে যবনিকা টেনে দিলাম নিজ হাতে।

এর কয়েক মাস আগে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র সুধীরচন্দ্র এসে প্রস্তাব করল তারা কয়েক বন্ধু মিলে একখানা মাসিক পত্র বা'র করবে, তাতে আমার নাম সম্পাদকরূপে তাদের ধার দিতে আমি রাজি আছি কি না। আমি বললাম নাম দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু সে ক্ষেত্রে লেখা মনোনয়নের ভারও আমাকে নিতে হবে, নইলে অস্বস্তি বোধ করব।

তাই স্থির হ'ল। মাসিকের নাম হ'ল 'নূতন পত্র'। আমার নামের সঙ্গে সুধীরেরও নাম ছাপা হ'ল সম্পাদকরূপে। যথারীতি ডিক্লারেশন নিয়ে এবং প্রায় ৩৬ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন অঙ্গে ধারণ ক'রে ১৯৪৩ সালে প্রথম যে সংখ্যাখানি প্রকাশিত হ'ল সেখানি হ'ল শারদীয় সংখ্যা। সে সংখ্যায় যাঁরা লিখলেন তাঁদের নাম—বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, উমা দেবী, (বর্তমানে ডক্টর) সন্ধ্যা ভাদুড়ী (বর্তমানে ডক্টর), চিত্রিতা গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেশ ত্রিপাঠী, জ্যোতিরিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়, (বর্তমানে এম-আর-সি-পি), পঙ্কজকুমার রায় (বর্তমানে রীডার, দিল্লী সেঃ ইঃ

অফ এডুকেশন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পত্র)। সম্পাদকীয় লিখলাম আমি নিজ স্বাক্ষরে।

কিছুদিনের মধ্যেই এক ঘটনা ঘটল। যুদ্ধের অন্ধকার পথঘাট। তার মধ্যে অনেক পরিশ্রম ক'রে বাড়ি খুঁজে এক রাত্রে আমার কাছে এলেন কয়েকজন যুবক। তাঁদের বক্তব্য, ক্যালকাটা কমার্শাল ব্যাঙ্কের হেমেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে অবশ্য দেখা করতে। 'নূতন পত্র' মাসিকে আমার লেখা সম্পাদকীয় প'ড়ে তাঁর ভাল লেগেছে, তিনি আমার সঙ্গে কিছু আলাপ করতে চান।

ব্যবস্থা হ'ল এঁরা পরদিন এসে আমাকে ওয়াটারলু স্ট্রীটের বুদ্ধপ্রচার অফিস থেকে ডেকে নিয়ে যাবেন। যথাসময়ে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন দৈনিক 'কৃষক' কাগজের সম্পাদনা ভার তিনি আমাকে দিতে চান। তিনি নূতন পত্রের সম্পাদকীয় পড়েছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে দৈনিক কাগজের সম্পাদনা কাজ আমাকে দিয়ে ভাল হবে।

আমি তো এ প্রস্তাবে স্তম্ভিত। দৈনিক কাগজের সম্পাদনা করতে যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা দরকার তা আমার নেই. আমি সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে অভ্যস্ত, দৈনিকে কদাপি নয়। আমি সে কথা বললাম। অর্থাৎ ভাল একটি চাকরি তিনি আমাকে দিতে কৃতসংকল্প, আর আমি তা অগ্রাহ্য ক'রে প্রাণপণে আমারই বিরুদ্ধে ব'লে চলেছি। নিজের অযোগ্যতা বিষয়ে এমন জোরের সঙ্গে বলা চাকরির ইতিহাসে এই হয়তো প্রথম। হেমেন্দ্রবাবু আর কি বলবেন, আমাকে ভেবে দেখতে বললেন। বেতনটি তখনকার পক্ষে আমার কাছে লোভনীয় ছিল অবশ্যই, কিন্তু ভাববার আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না, আমি দৈনিক কাগজের সম্পাদনারূপ অভিশপ্ত একটি কাজের ভার যে নেব না, এ বিষয়ে তখনই মনস্থির ক'রে ফেলেছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই যাঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা হতাশভাবে বললেন, "আপঁনি এ কি করলেন, নিয়ে নিন কাজটা।"

'নূতন পত্র' প্রকাশিত হ'তে লাগল। অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যাও যথা সময়ে আবির্ভূত হ'ল, তারপর মাঘের জন্য আয়োজন করার পূর্ব মুহূর্তে

খবর এলো অবিলম্বে কাগজ বন্ধ করতে হবে। প্রকাশ করা বে-আইনি হয়েছে। কাগজের পরিচালকেরা ভেবেছিল এখানে যথারীতি ডিক্লারেশন পাওয়াই যথেষ্ট, কিন্তু পরে জানা গেল তা নয়, দিল্লী থেকে অনুমতি আনতে হবে। কিন্তু তার আগে এ কাগজ বন্ধ ক'রে, তবে।

কিন্তু বন্ধ করাই হ'ল, নতুন ক'রে দিল্লী গিয়ে দরবার করতে কেউ রাজি হ'ল না।

কাগজখানার চেহারা ভালই হয়েছিল। প্রথম সংখ্যার পরিচয় দিয়েছি, বাকী দুখানারও দিই, সাময়িক পত্রের ইতিহাসে শিশু মৃত্যুর খতিয়ানে কাজে লাগতে পারে। পরবর্তী সংখ্যাদ্বয়ের লেখক লেখিকা ঃ দ্বিতীয় সংখ্যার—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ আচার্য, বিনয় চৌধুরী, প্রভা সেন, বাণী রায়, গোপাল ভট্টাচার্য, কেশব গুপ্ত, ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (বিজ্ঞান লেখক), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সঙ্কলন), সার সৈয়দ সুলতান আহমদ, পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়, লুইজি পিরান্দেল্লো, অভিজিৎ বাগচী, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী। তৃতীয় সংখ্যার—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর, পরিমল গোস্বামী, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, করালীকান্ত বিশ্বাস, ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, সন্ধ্যা ভাদুড়ী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (বিজ্ঞান লেখক)।

১৯৩৬ সালে নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদনা করেছিলেন 'নূতন পত্রিকা'—তার আয়ু শেষ হয় পাঁচখানায় ; ১৯৪৩ সালে 'নূতন পত্র' মাত্র তিনখানাতেই শেষ হ'ল।

ভোলা চট্টোপাধ্যায় বা ভি-সির কথা আগে উল্লেখ করেছি। এঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহী শিল্পী ভি-সি। নিজের আদর্শের সঙ্গে জীবনকে এমন ভাবে মিলিয়ে দেওয়া এ যুগে বিরল। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে এঁর নেতৃত্বে আর্ট রেবেল সেণ্টারের প্রদর্শনী হয়। ভি-সির অনুগামী ছিলেন কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার, অবনী সেন, গোবর্ধন আশ, রবি বসু ইত্যাদি। ওয়েলিংটন স্কয়ারের ইয়র্ক ম্যানশনে সম্মিলিতভাবে এই প্রথম আধুনিক শিল্পের প্রদর্শনী। এর আগে কিউবিস্টিক রীতির শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের একক প্রদর্শনী মাত্র হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের ইতিহাসে এ সব কাহিনী লেখা পড়েছে কি না জানি না। এই সময়েই বর্তমান আর্ট অ্যাকাডেমির সূত্রপাত হয়। এবং এঁদের মধ্যে যাঁরা শুধু শিল্পে নয় জীবন দর্শনে বিদ্রোহী, তাঁরা পরে এ দল থেকেও বেরিয়ে আসেন। এই শেষোক্ত দলে ভি-সি, কালীকিঙ্কর ও রবি বসু। প্রথম দুজনের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। ভি-সির মতো দৃঢ় মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যা কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না, টাকার লোভ থেকে যা সম্পূর্ণ মুক্ত, এমন ব্যক্তিত্বের কথা আমার মনে বিস্ময় জাগায়। জনমত এবং জনগুণগ্রাহিতাকে এবং টাকার মূল্যে শিল্পমূল্য বোধকে ষোল আনা অগ্রাহ্য ক'রে নিজের সৃষ্টির আনন্দে ডুবে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আর এক শিল্পী—কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার—ভি-সির অনুজ হবার দাবী রাখে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সহৃদয় বন্ধুর কথা আমি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। ইনি শিব এবং রামের সমন্বয় করেছেন নামে এবং ব্যবহারে। শিবরাম চক্রবর্তীর মতো গুণী কথাশিল্পী বাংলায় দ্বিতীয় নেই। ইনিও নিজ সৃষ্টির মধ্যে নিজের পুরস্কার খুঁজে পেয়েছেন। উদাসীন উদার হৃদয়, অন্যের ভাল খুঁজে বেড়ান, এবং ভাল দেখেন। এবং সব চেয়ে বড় কথা, সকল ভালর গুণগান ক'রে বেড়ান। শিবরাম বড় ভাষাশিল্পী। প্রমথ চৌধুরীর মুখে এঁর প্রশংসা শুনেছি। সহৃদয় কৌতুকরসে মনটি সব সময় ভরা। এঁর লেখা আসলে বড়দের জন্যই, কিন্তু বড়রা যাঁরা হাসি পেলে নিজেকে ছোট বোধ করেন, তাঁরা শিবরামের হাস্যরস থেকে বঞ্চিত। কৌতুক, কৌতুকরূপেই একটা বড় সার্থকতা বহন করে, গোলাপ ফুল গোলাপ ফুল রূপে। গোলাপ ফুলের পেটে যারা কাঁঠালের কোয়ার সন্ধান করে, তারা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দেয়।

শেষ পর্ব

সময় ছুটছে দ্রুত।

বাল্যকালে স্কুলে পড়তে খবরের কাগজে "স্থানীয় সংবাদ" লিখে লেখক জীবন শুরু করেছিলাম। এর মাঝখানে, প্রাণী বিশেষের গায়ে যেমন বিশেষ চিহ্ন এঁকে ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়, আমার পিঠে সেই ভাবে সাহিত্যিকের চিহ্ন আঁকলেন সজনীকান্ত। তারপর বহু পথ ঘুরে আবার সেই খবরের কাগজেই প্রবেশ করলাম। ১৯৪৫ সালে নিতান্তই দৈবযোগে একদিন শুনলাম যুগান্তরের সাময়িকী সম্পাদক বিনয় ঘোষ যুগান্তর ছেড়ে দিয়েছেন। নিতান্তই দৈবযোগে প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে পরদিনই দেখা। প্রমথনাথ তখন যুগান্তরের সহকারী সম্পাদক। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কোনো একটা দিন প্রমথনাথ বিশী আমাকে যুগান্তরের দুজন নিয়োগকর্তার সম্মুখে নিয়ে পৌঁছে দিলেন— তাঁরা (শ্রীশচীবিলাস রায়চৌধুরী ও শ্রীরতননাথ দত্ত) আমাকে তদ্দণ্ডেই সহকারী সম্পাদকরূপে কাজে যোগ দেবার জন্য অনুমতি দিলেন। কাজ আরম্ভ হ'ল ১লা মার্চ থেকে, যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে। তারপর থেকে চতুর্দশ বর্ষ প্রায় পার হয়।

এ লেখা যে আমার জীবনী নয় সে কথা আগে বলেছি। আত্মজীবনী লেখার অনেক দায়িত্ব। জীবনে অনেক বড় কাজ করতে হবে আগে, এবং সেই সঙ্গে অতি জঘন্য কাজও অনেক করা দরকার। এই দুই মিলিয়ে হয় উৎকৃষ্ট জীবনী। অন্তত শুনে আসছি তাই। আবার বড় কাজ অনেক করা হ'লে, তা বাদ দিয়ে, জঘন্য কৃতকর্ম সমূহ একত্র ক'রেও জীবনী লেখা যায়। এবং তার নাম দেওয়া যায় কনফেশন। মনে রাখতে হবে কনফেশন লিখতে হ'লে অনেক মহৎ কাজের কৃতিত্ব থাকা চাই, নইলে কনফেশন দাঁড়াবে কিসের জোরে?

ডি কুইনসির কনফেশনস অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ঈটার অবশ্য

ব্যতিক্রম। কেননা তিনি এই কনফেশন লিখে তবে সাহিত্য-খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সেণ্ট অগাস্টিন, রুসো, টলস্টয় এঁরা প্রকৃত কনফেশন লেখক। গান্ধীজিরও সত্য নিয়ে পরীক্ষা, কনফেশন।

কনফেশনস্ অফ এ সোডা ফীন্ড লিখেছিলেন স্টিফেন লীকক। সেটি আগাগোড়াই কনফেশন তবে কিসের তা অনুক্ত আছে, শুধু সমধর্মীরা সেটি ধরতে পারবে।

কনফেশনকে দাঁড় করাবার মতো মহৎ কাজ কিছু করিনি। তাই কনফেশন লেখা আমার পক্ষে অচিন্তনীয়।

অতএব এ দুটিই আমার পরিত্যাজ্য। অনেকের মতে জীবনী লিখতে গেলে নিরপেক্ষ জীবনী লেখা উচিত। মনে মনে বোধ হয় তাঁরা চান যে কিছু স্ক্যাণ্ডাল প্রকাশ করা হোক। স্ক্যাণ্ডাল বা কলঙ্ক কথা শুনতে কার না ভাল লাগে? কিন্তু শুধু ভাল লাগে বলেই তা শোনাতে হবে কেন বুঝি না। মানুষ যে পশুও সে কথা নতুন ক'রে বলবার দরকার আছে কি? সবাই যেখানে এক, সেখানে নীরব থাকাই উচিত। আর পশুত্বের প্রতি এতটা প্রকাশ্য টান থাকা কি ভাল? তা ভিন্ন নিরপেক্ষতা কথাটির অর্থও স্পষ্ট নয়। আমরা যদি বহির্দৃষ্টিতে অথবা অন্তর্দৃষ্টিতে সমগ্র বাস্তব বা সত্যকে এক সঙ্গে দেখতে পেতাম, তা হলে সমগ্রের নিরপেক্ষ বর্ণনাও সম্ভব হ'ত। কিন্তু আমরা যত চেঁচিয়েই বলি না কেন, একসঙ্গে সমগ্র দেখার যান্ত্রিক বা আত্মিক চোখ আমাদের নেই। পূর্ণ সত্য দেখি না, সেটি কি তা জানি না। অতএব নিরপেক্ষ সত্য নামক কোনো সত্য আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আর যদি সত্যিই তা ধরা যেত, তা হ'লে জীবনের আর কোনো অর্থ থাকত না। মহাবস্তু প্রত্যেকটি পৃথক বস্তু সত্তায় প্রকাশিত, মহাসত্যও প্রত্যেকটি ব্যক্তির আংশিক দেখা মিলিয়ে তবে সার্থক। এর বাইরে সত্য থাকতেও পারে, নাও পারে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ সত্যটি আমার খুব পছন্দ। আমাদের প্রত্যেকের আংশিক দেখার ভিতর দিয়েই সর্বসত্য দেখার চোখ তৃপ্ত হচ্ছে।

অতএব কিছু স্ক্যাণ্ডাল প্রকাশ করলেই পূর্ণ সত্য প্রকট হ'ল, এ আমার ধারণার বাইরে। আমি তাই ও পথে যাইনি।—অর্থাৎ জীবনী লেখার পথে।

আমি এঁকেছি স্মৃতি ছবি। অনেক বিচ্ছিন্ন টুকরোর ছবি এবং এরই মধ্যে যতটা সম্ভব স্যাণ্ডাল প্রচার করেছি। যথেষ্ট ছায়া না থাকলে কি আর ছবি হয়?

পুরাতনকে মনে আনা বা reminiscence সম্পর্কে আরিস্টটল একটি উৎকৃষ্ট কথা বলেছেন। তাঁর মতে আমাদের এ জন্মের জ্ঞান সবই পূর্বজন্মের উপলব্ধ সত্যের স্মৃতি মাত্র।

খুবই বড কথা। আমি এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তবে পূর্ব জন্মটি দৈহিক নয়, মানসিক, বা চেতনাসঞ্জাত। জ্ঞান হবার পর থেকেই তো বুঝতে বুঝতে চলেছি এই জন্মান্তরের রহস্য। কত নতুন নতুন জন্ম পার হয়ে এলাম এই অল্প ক বছরের জীবনেই। এটি এই জন্মেরই ব্যাপার। "এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জনমান্তর"—কত সত্য কথা। এর পর যখন আমার চেতনা আর থাকবে না, তখন আমার কাল ও আমি ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে ছড়িয়ে থাকব। স্মৃতি-চিত্রণের মধ্যে আংশিক আমি ও আমার কালকে রেখে গেলাম। এর কি দাম, আমার কাছে তা উদঘাটিত নয়। লিখতে ভাল লাগল এইখানেই এর আপাত সার্থকতা। পরে হয় তো এ সমস্তকে ছাপিয়ে এ থেকে কোনো একটা ছবি আরও স্পষ্ট ফুটে উঠবে কারো কাছে।

সবই দেখা জিনিষের ছবি। আমার কালে কি উপলব্ধি করেছি তা এতে নেই। আপাতত সেই কথাটাই বলতে চেষ্টা করব, যদিও বলবার ইচ্ছে ছিল না।

যে কালটা পার হয়ে এলাম—সেটি একটি বিরাট কাল। এই কালের মধ্যে একটি হ্যালির ধূমকেতু, একটি মাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে কথার অস্ত্রে, গায়ে হাত তোলার পালা আসবে অল্পদিনের মধ্যেই। অতএব দ্বিতীয়বার হ্যালির ধূমকেতু ও দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ দর্শন যদিও আমার পক্ষে অসম্ভব, তৃতীয় বারের বিশ্বযুদ্ধ দেখার সম্ভাবনাটা রয়ে গেল।

মানুষ যে আজও বেঁচে আছে সে কেবল প্রকৃতি দত্ত বেঁচে থাকার তাগিদে। কি বিরাট সম্পদ-অপব্যয়, কি ব্যাপক নরহত্যা এক একটা যুদ্ধে, তবু তো যুদ্ধ থামে না। মানুষ জীবন-যুদ্ধে ভেঙে পড়তে পড়তেও বাঁচার

তাগিদে যেমন উঠে দাঁড়াতে চায়, তেমনি এক একটা যুদ্ধে ব্যাপক বিভীষিকা থেকে উঠে দাঁড়িয়েই আবার যুদ্ধ করতে চায়।

এই হ'ল মানুষের চরিত্রের একটা স্যাণ্ডালের দিক। এরই মধ্যে আবার শান্তিপ্রিয় মানুষ নামক ছোট একটা দল আছে, (মতান্তরে, এই দলটাই বড়), কিন্তু যুদ্ধ থামাবার ক্ষমতা তার নেই। এই দলের লোকেরা অবশ্য ভাল ভাল কথা বলতে পারেন, এবং যুদ্ধ বিশ্বাসীরা তাঁদের কথার খুব প্রশংসা করেন, অনেক সময় পুরস্কারও দেওয়া হয়, কিন্তু শান্তি সত্যিই যদি কেউ আনতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক পুরস্কারদাতাদের পাল্লায় প'ড়ে ভারতবর্ষ এ কথা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে।

যুদ্ধ বন্ধ বা বিষাক্ত অস্ত্র বন্ধের পক্ষে বারট্রাণ্ড রাসেল কতকাল ধ'রে ভাল ভাল কথা বলছেন, বারনার্ড শ যুদ্ধবাজদের নিয়ে এত বিদ্রূপ করেছেন, এবং তার জন্য দুজনে কি প্রশংসাই না পেয়েছেন কিন্তু প্রশংসাকারীরা সেই সঙ্গে যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে আরও বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। যীশু খ্রীষ্ট নামক এক নিরীহ ভদ্রলোক ছিলেন অহিংসধর্মী। বহু বাধা বিপত্তি সহ্য করেও কোটি কোটি লোক তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হলেন, কিন্তু তাঁরাই এখন সংঘবদ্ধ ভাবে হিংসার অস্ত্রে শাণ দিচ্ছেন।

অল্পবিস্তর সব দেশের অবস্থাই প্রায় এক, কারণ মানুষ সর্বত্রই এক। এই মানুষ কোনো দিন একসঙ্গে শান্তি চাইবে না, কারণ শান্তি একটি মরীচিকা, যা শুধু চরম বিপদে পড়লেই মানুষ চায়।

কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, প্রচার করেন বটে মানুষ এই পৃথিবীতে অবশ্য এক দিন স্বর্গ রচনা করবে, কিন্তু তা হওয়া অসম্ভব। যারা নিরীহ মানুষের মাথায় বোমা ফেলছে তারাও বিশ্বাস করে তারা পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়ে আনছে।

আমি এই মোহ থেকে মুক্ত আছি ব'লে মনে করি। মানুষ পৃথিবীতে কোনো দিন স্বর্গ রচনা করবে এ কথার মতো বিভ্রান্তিকর কথা আমার কাছে আর কিছু নেই। অবশ্য স্বর্গ মানে যদি আনন্দময় শান্তিময় একটি মধুর পরিবেশ হয়, তবে তা রচনা চলছে প্রতি মুহূর্তে। মানুষ গভীর দুঃখের মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে সে স্বর্গের আভাস পায়। মানুষ কোনো অপ্রত্যাশিত

মুহূর্তে হঠাৎ আনন্দে যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে তখন সেই হঠাৎ আনন্দের মুহূর্তে তার চেতনায় স্বর্গ নেমে আসে। এর বাইরে কোথায়ও স্বর্গ নেই।

একটানা অতি বিস্তীর্ণ স্বর্গসুখ নামক কোনো সুখ বা একটানা আলো বা অন্ধকার, এর কোনোটাই বাস্তব নয়। সমস্ত মানুষের ইতিহাস পড়লেই জানা যাবে মানুষের সমাজ কোনো ব্যাপক কাল জুড়ে সুখে থাকে নি। কারণ এমন সুখই শাস্তি, তাই এমন সুখের অবস্থা এলে, তা থেকে মুক্ত হবার জন্যই সে সুখ-বিরোধী হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও মানুষের সদ্‌বুদ্ধির উন্মেষে তাঁর অদম্য বিশ্বাস থেকে একটা বড় প্রশ্ন তুলেছিলেন—

"মানুষ,চূর্নিল যবে নিজমর্ত্য সীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?" (১৯১৫)

দেবতার মহিমা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু খুব বেশি দিনের জন্য নয়। কারণ কোনো ভালই বেশি দিন টিকতে পারে না। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আভাসে তিনি অনেকটা মোহমুক্ত। তিনি মানুষ-পশুকে বিদ্রূপ ক'রেও শেষ পর্যন্ত বলেছেন—

"দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।" (১৯৩৮)

কিন্তু শাশ্বত ইতিহাস গড়াতে মানুষের গরজ নেই, তাই এ অভিশাপ বর্ষণ বৃথা হ'ল। মানুষ মর্ত্যসীমা বার বার চূর্ণ করেছে, কিন্তু তা স্বর্গ রচনার জন্য অবশ্যই নয়। আধুনিক কালে সেটি হয়েছে ভিন্ন মহাদেশে অস্ত্র নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে।

স্বর্গ গড়বে ব'লে মানুষ কি আজ থেকে চেষ্টা করছে? সকল পৃথিবীর সকল কালের সকল চিন্তানায়ক ও মনীষী সমবেত ভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠ যুক্তি এবং আত্মিক প্রভাব দিয়ে এ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হাজার হাজার বছরের চেষ্টাতেও অদ্যাবধি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ন্যূনতম খাওয়া পরা এবং

বাসস্থান পায় নি। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, কিন্তু মানুষের দুর্দশা কমেনি। তবে আর স্বর্গরাজ্য গড়ার মিথ্যা কল্পনা কেন? কল্পনা মিথ্যা নয়, কারণ একটা আদর্শ না থাকলে মানুষের চক্ষুলজ্জা হয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলার জোর পাওয়া যায় না।

স্বর্গ গড়া কোনো দিনই হবে না। মানুষ চিরদিন মানুষই থাকবে। ন্যূনতম খাওয়া পরা এবং বাসস্থান যদি স্বর্গ হয় তবে তার জন্য চেষ্টা চলতে থাকবে এবং চলাই উচিত। চেষ্টা করতে করতে এক একটা জাতি হয়তো এ স্বর্গ পেয়ে যেতেও পারে, কিন্তু সকল পৃথিবীর লোক এক সঙ্গে কখনো পাবে না। পাবে না এইজন্য যে সকল পৃথিবীর লোককে একসঙ্গে একমন্ত্রে দীক্ষিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এক দলের মতে খাওয়া যত সত্য আর এক দলের মতে খাওয়া তত মিথ্যা। অবশ্য মতের পক্ষান্তর ঘটতে দেরি হয় না।

তবু সবাইকে এক মতে দীক্ষিত করার চেষ্টা চলবে। পরমাণু বোমা সহায়। যার পরমাণুর স্টকপাইল এবং অস্ত্রক্ষেপণ ক্ষমতা যত বেশি, তার গুরুগিরি করার সম্ভাবনাও তত বেশি। অবশ্য অল্পদিনের জন্য, তারপর দীক্ষিতেরা বিদ্রোহ করবে, গুরুমারা বিদ্যা শিখবে, এবং মারতে আরম্ভও করবে।

চক্রবৎ চলছে এবং চলবে। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে কোনো ভালই বেশি দিন টিকলে তা আর ভাল থাকে না। যদি স্থায়ী ভাল কিছু করা হয়ে থাকে তবে তা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে আইন মানাবার চেষ্টা এবং জেলখানার বাইরে অধিকাংশ লোককে ছেড়ে রেখেও সাধারণ জীবন চালিয়ে যাওয়া! অবশ্য পথের মোড়ে মোড়ে একটি ক'রে পুলিস এবং মাইল খানেক পর পর একটি ক'রে থানাও আছে।

আমি শহরের কথাই বলছি। এখানে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার যাত্রীর ভুলে-ফেলে-যাওয়া ব্যাগ বা বাক্স যাত্রীকে ফিরিয়ে দিলে আমরা উৎসব করি, একজন পুলিস তার কর্তব্য পালন করলে তাকে নিয়ে নাচি। মাঝে মাঝে এ রকম সততার দৃষ্টান্ত দু-একটা মেলে। কিন্তু তা কারো নীতি-শিক্ষার ফলে নয়, কারো ভয়েও নয়। দু' চারটি মানুষ সংসারে আপনা থেকেই সৎ আছে। দশ বারো হাজার বছরের বা আরো বেশি কালব্যাপী

সভ্যতার ইতিহাসে এটি খুব প্রশংসার বিষয় কি? স্বর্গরাজ্যের প্রতিশ্রুতি এতে কি খুব জোরালো শোনায়?

এমনি যখন অবস্থা, তখন কোন্ মতবাদ ভাল, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল। আমি স্থায়ী স্বর্গ গড়ার ধাপ্পা থেকে দূরে সরে আছি, তাই মতবাদ নিয়ে আমার ঝগড়া নেই। ঝগড়া নেই, কারণ ওতে লাভ নেই। তর্ক করা স্পোর্ট মাত্র, কাউকে বোঝাবার জন্য নয়, বোঝাতে হ'লে অস্ত্র চাই। যুক্তিশাস্ত্র শুধু পরীক্ষা পাসের কাজে লাগে। মানুষ সর্বত্র পরস্পর-বিরোধী অভ্যাসের দাস। ঘরে ব'সে কথার সাহায্যে সে যুক্তিশাস্ত্রের উপকারিতা দেখাতে পারে, কিন্তু কাজে নামলে নিজের যুক্তি নিজেরই কাছে অচল হয়। অনেক বিষয়ে মত না মিললেও শোপেনহাউয়েরের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত। তিনি বলেছেন, কাউকে সমস্ত শক্তি দিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা কর, শেষ পর্যন্ত দেখবে সে বোঝে নি। লজিকের সাহায্যে কেউ কাউকে কখনো কিছু বোঝাতে পারে নি, এমন কি লজিশিয়ানরাও লজিক ব্যবহার করেন কিছু উপার্জনের জন্য।

সবই অবশ্য খানিকটা দূর পর্যন্ত চলে। মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত বর্বরতা পুলিসের ভয়ে বা মৃত্যুভয়ে কিছু চেপে রাখা সম্ভব, যদিও সব ক্ষেত্রে পারা যায় না। এই দুটি ভয় না থাকলে লজিক বিক্রি হত না।

মানুষের চরিত্রের এ স্ক্যাণ্ডাল মেনে নিতেই হবে। একে সর্বদা বাড়িয়ে দেখার দরকার নেই। এর বাইরে আমরা কি সেই আমাদের বড় পরিচয়। মাঝে মাঝে আমরা শিক্ষা সংস্কৃতির মুখোশ পরি, সেইটি আমাদের দুর্লভ পরিচয়। এই পরিচয়েই বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব। পশু পরিচয়ে বৈচিত্র্য নেই, সব এক। সবারই চরিত্রের তাই ঐ দুর্লভ দিকটিই ভাল লাগে এবং তারই স্মৃতি আমি লিখেছি। সত্য নিয়ে আমার কোনো পরীক্ষা নেই, কারণ সত্য কথাটি আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

আজ আমার এ স্মৃতি ছবি আঁকতে আঁকতে যতবার পিছনে ফিরে জীবন পথটি দেখতে চেষ্টা করেছি, ততবার সব ভাল লেগেছে। যত মানুষের সঙ্গ লাভ করেছি, জীবনে যা কিছু করেছি, এবং করিনি, সব সুন্দর মনে হয়। তবু সেই সব দিন থেকে সরে এসেছি, এই চিন্তা মনকে বেদনাতুর করে। নৌকাখানা যখন বর্ষার স্রোতে বন্দর ছেড়ে দ্রুত ভেসে

চলেছে তখন আর ফেরা চলে না সেখানে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের পোস্ট-মাস্টারের নৌকো। স্রোতের টান, পালের হাওয়ার টান, ইচ্ছার টানের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল।

পরবর্তী দৃশ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। পিছনের দৃশ্য ক্রমে বর্তমানে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে, অতএব কলম থামাবার সময় এলো।

বেশি কাছে থেকে দেখা জিনিসের ছবি "স্মৃতি" ছবি নয়। এবং তা দূরে স'রে গেলেই মধুর লাগে। সময়ের ব্যবধান ঘটাতে হয় এজন্য। মদিরার মতোই দীর্ঘ দিন মাটির নীচে রাখতে হয়—"a long age in the deep-delved earth."

আমার স্মৃতিতে সব জিনিস একই সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, অনেক জিনিস সাময়িকভাবে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। অনেক পরে হয়তো আবার তা মনে পড়বে, হয়তো নিবে যাওয়া অনেক ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, কিন্তু আজ তারা নেই, এটাই সত্য। বর্তমানকালও দূরে স'রে গেলে তখন একে এর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব হবে, তাই একটা বিশেষ সময়ে এসে আমি থামলাম।

যিনি আমার এ স্মৃতিচিত্রণ অনুসরণ করেছেন তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, এর মধ্যে আমাব নিজস্ব ছবিটি এককভাবে আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়, স্থান কাল ও মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে তার দাম। সবার প্রতিফলিত আলোয় আমাকে যেটুকু দেখা যায়, তার বেশি কিছু নয়। (কৌশলে চাঁদের সমগোত্র হবার চেষ্টা করছি না তাই ব'লে।)

এই যুগ তুচ্ছকেও কিছু মূল্য দিয়ে থাকে, সেই বিশ্বাসে এই আত্মপ্রকাশ। অবশ্য এর মূল প্রেরণা প্রাণতোষ ঘটক। তার সঙ্গে এক অবর্ণনীয় প্রীতির সম্পর্কে আমি বাঁধা। তার ইচ্ছায় আমার এ রচনা।

প্রতিফলিত আলোর কথাটা সত্য কথা। একটা আধুনিক ইংরেজী কবিতাও মনে পড়ছে। তার মধ্যে আমার এক সহধর্মীকে আবিষ্কার করেছি। বৃষ্টির ফলে পথের ধারে ধারে যে একটু একটু জল জ'মে থাকে, সেইটি হচ্ছে কবিতার বিষয়বস্তু, নাম Puddles, লেখক জে. রেডউড

অ্যানডারসন। যাবতীয় আবর্জনা জমে জলের বুকে, গাছের ঝরা পাতা, খড়কুটো, দেশলাইয়ের কাঠি, এরাই নোংরা জলের একমাত্র সঙ্গী। কিন্তু—

"....when the sun
shines from their eyes. Then's their poor attire
forgotten, and their lowly circumstance,
and I remember only
youth's irrepressible joy, the loveliness
inseparable from waters great and small,
whose power and gift from God is to reflect
the lights of heaven ;"....

নাম-সূচী